আমি কেনো মুসলমান

আবদুল মুকিত মুখতার

আমি কেনো মুসলমান

আবদুল মুকিত মুখতার

প্রকাশনায়

নোমানীয়া লাইব্রেরী, সিলেট

আমি কেনো মুসলমান

আবদুল মুকিত মুখতার

সর্বস্বত্ত্ব

গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

নোমানীয়া লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ্ মার্কেট
সিলেট

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০০৬

প্রচ্ছদ ডিজাইন

গ্রন্থকার

মুদ্রণে

ক্লাসিক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
বরকতিয়া সুপার মার্কেট
আম্বরখানা, সিলেট

মূল্য

বাংলাদেশ - ২২৫ টাকা, UK - £5.00

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী মা-বাবাকে

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

নূরুল ইসলাম সাগর
আবুল হোসেন নজমুল
বেলাল উদ্দিন আহমদ
কারী সাজ্জাদ মিয়া
আবদুল আহাদ
ক্বারী সাজ্জাদুর রহমান
আজিজুল বারী

পূর্বলেখ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাদীসের বাণী হচ্ছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেনো তা প্রতিহত করে, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেনো প্রতিবাদ জানায়, এটাও যদি করতে না পারে তবে যেনো অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে এবং এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।"

সমাজের চারিধারে এতো অন্যায়, এতো অনাচার প্রত্যক্ষ করে আমি নিজেও যেনো অন্যায়ের গহ্বরে পতিত হয়ে জীবন-যাপন করছি। কিন্তু না আছে আমার বাহুবল, না আছে কথা বলার মতো বাক-স্বাধীনতা, আর না আছে ঘৃণা করার মতো মানসিকতা। কারণ, ঘৃণা করতে হলে প্রথমে নিজেকেই ঘৃণা করতে হয়। অর্থাৎ আমার চারিধারে বিচরণরত আমার পরিবারবর্গই নামকা-ওয়াস্তে ঈমান নিয়ে জীবন-যাপন করছে। কুরআন-হাদীসের নির্দেশ ও ব্যাখ্যায় ঈমানের যে দাবী, তা এক ভাগও পালিত হচ্ছে না সঠিক অর্থে। অতএব আমি কি করতে পারি?

তাই লিখতে বসলাম। জানি না কতটুকু সফলতা- অর্থাৎ যা বলতে চেয়েছি, তা বলতে পেরেছি কি-না! এটাই অন্তরের দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

উক্ত গ্রন্থখানা লিখতে গিয়ে একটি মানুষের সাথে আমি দারুণ ভাবে জুলুম করেছি। অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু এই কারণে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই না। বরং আমরা দুজনেই আল্লাহ তাআলার বেহেশ্ত কামনা করি। অতএব আল্লাহ তাআলা যেনো জান্নাতেও এই মানুষটিকে আমার সহধর্মিনী করেন।

বেশি সহযোগিতা পেয়েছি বড় মেয়ের কাছে। সে এখন গ্রীনউইস্ ভার্সিটিতে মডার্ণ পলিটিক্স নিয়ে ডিগ্রী করছে। ফলে- মডার্ণ পলিটিক্স এন্ড ওয়ার্ল্ড গ্লোবেলাইজেশন সম্পর্কে সে আমার মায়ের ভূমিকা পালন করেছে।

বইখানি লিখতে গিয়ে বই-পুস্তক, মাসআলা মাসায়েল, প্রুফ রিডিং ইত্যাদি বিষয়ে ছায়ার মতো আন্তরিক সহায়তা যুগিয়েছেন মাওলানা জালাল উদ্দীন, মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল, মাওলানা মুফতী ইহসান আহমদ, নজরুল ইসলাম সাগর, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী ও আজিজুল বারী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

ইসলামী দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা এবং প্রচলিত ফিলোসফি সম্পর্কে আলোচনা ভিত্তিক সহযোগিতা করেছেন, মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান ও মশাহিদ আলী।

গ্রন্থখানি লেখার পর একটি প্রশ্ন বার বার মনের মাঝে আকুপাকু করছিলো যে- আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল হয়ে গেলো কি-না। ভাগ্যক্রমে বৃটেনে ভ্রমণরত শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবিবুর রহমান (মুহাদ্দিসে ইছামতি) সাহেবকে পেয়ে গেলাম। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে

আছেন জেনেও তাঁর হাতে পান্ডুলিপি দিয়ে পাঠ করার অনুরোধ করলাম। তিনি পান্ডুলিপি হাতে নিয়ে বইয়ের নাম দেখে বললেন, আমি অবশ্যই পড়বো। প্রায় মাস দেড়েক পর তিনি বললেন, 'বইখানা আমার খুব ভালো লেগেছে, আবার পড়তে চাই।' বললাম, আমার জন্যে এটা সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। আরো প্রায় মাস দু'এক পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগের দিন রাতে আমার হতে পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে বললেন, "দু'এক স্থানে একটু পরিবর্তন করতে হবে, আমি অবশ্য চিহ্নিত করেছি। বাদবাকী ঠিকই আছে। আপনার শ্রম স্বার্থক হোক এই দোয়া রইল।" তাঁর দোয়া মহান আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হবে। আমীন।।

-গ্রন্থকার

বিষয়সূচী

ভূমিকা ------------------------------------- ৭
প্রথম পর্ব ------------------------------------- ১১
সুন্নাহ্ বহির্ভূত সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি ------------------------- ১৮
গুপ্তচর বৃত্তির গোড়ার কথা ------------------------- ২৩
নাজদাত ধারার আহলে হাদীস ------------------------- ৩৩
নব্য লা-মাযহাবীদের ভ্রান্ত আক্রমণ ------------------------- ৪১
ওয়াহ্হাবী আন্দোলন থেকে সালাফী মুভমেন্ট ------------------------- ৪২
বর্তমান শিয়া মতবাদ ------------------------- ৪৬
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ ------------------------- ৪৮
সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা ------------------------- ৪৯
মওদুদী মতবাদ ------------------------- ৫০
মওদুদী মতবাদের দার্শনিক দিক ------------------------- ৫২
মওদুদী মতবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ------------------------- ৫৩
যেসব কারণে মওদুদীবাদ একটি স্বতন্ত্র মতবাদ ------------------------- ৫৪
দ্বিতীয় পর্ব ------------------------- ৫৮
মওদুদী মতবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা ------------------------- ৫৯
ছাত্রসমাজে জামায়াতে ইসলামী'র গ্রহণযোগ্যতার কারণ ------------------------- ৬১
মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রসঙ্গ ------------------------- ৬৫
তাফসীরে সাঈদী প্রসঙ্গ ------------------------- ৮৩
মওদুদী মতবাদের অর্থনীতি ------------------------- ৮৪
মডারেট ইসলামের জন্ম এবং... ------------------------- ৮৭
মাযহাবকে কেনো আক্রমণ করা হলো ------------------------- ৮৮
'ইজতিহাদ' ও 'রায়'-এর গোড়ার কথা ------------------------- ৮৯
মাযহাব ও হাদীসের ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ------------------------- ৯৫
বর্তমান লা-মাযহাবীদের স্বরূপ ------------------------- ১০৭
মওদুদীবাদী লা-মাযহাবীদের কৌশলী তৎপরতা ------------------------- ১১৩
তৃতীয় পর্ব ------------------------- ১৫৯
আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং পরকাল ------------------------- ১৫৯
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ------------------------- ১৬৩
সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির অপচেষ্টা ------------------------- ১৬৬
উত্তরাধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির কারণ ------------------------- ১৬৮
ইবলিস ও শয়তান ------------------------- ১৭২
বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও মুসলিম জাতির সমস্যা ------------------------- ১৭৪
জিহাদ প্রসঙ্গ ------------------------- ১৭৯
খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লব ও তালিবান মুভমেন্ট ------------------------- ১৯৪
মোল্লা উমরের বিপ্লব ------------------------- ১৯৮
মুনাফিক প্রসঙ্গ ------------------------- ২১০
নতুন প্রজন্ম কিভাবে মুনাফিকী আচরণের শিকার ------------------------- ২১৩
তাক্বওয়াহীন জিহাদ ও আজকের মুসলিম বিশ্ব ------------------------- ২২৩
শিশু শিক্ষার গুরুত্ব ও বর্তমান মুসলিম সমাজের অক্ষমতা ------------------------- ২৪৯
নব্য বাতিল ফির্কাগুলো জন্ম নেয়ার কারণ ------------------------- ২৫৪
ইসলামে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ------------------------- ২৫৭
তাছাউফ তত্ত্বকে বিভ্রান্ত বলার অর্থ পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ------------------------- ২৬৫
আমি কেনো মুসলমান? ------------------------- ২৬৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র বিশ্বপ্রভূ মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি এ জগত সৃষ্টি করেছেন ও এর মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর হিফাজত ও পরিচালনা করছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর সমতূল্য কেউ নেই। এরপর আমি দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্‌র মনোনিত সর্বশেষ পয়গাম্বর ও আম্বিয়াকুল শিরোমণি, মদীনা মুনুওয়ারায় চিরনিদ্রায় শায়িত রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাব এবং আহলে-আওলাদদের প্রতি।

ভূমিকার শুরুতেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আজকের বহুতরের ফিতনার এ যুগে একটি যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ কিতাব জনাব আব্দুল মুকিত মুখতার সাহেবের সুযোগ্য লেখনী দ্বারা সমাজে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কেউ একটি অক্ষরও লিখার ক্ষমতা রাখে না- আর এমন উচ্চপর্যায়ের বিষয়ের উপর লিখা তো সত্যিই অনেকের সাধ্যাতীত। আমি এই ভূমিকাটি লেখার তাওফিক কামনা করি তাঁর পবিত্র দরবারে।

আজকের যুগ একটি জটিল-কঠিন যুগ। এযুগের মানুষ এক দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ হেতু দৈনন্দিন জীবন-যাপনে প্রযুক্তি-নির্ভর একটি ক্লোজ-নিট বিশ্ব-সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে মানুষের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ধার্মিকতার প্রতি অবহেলা, উপেক্ষা ও সরাসরি অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বহুতরের ফিতনা-ফ্যাসাদের মধ্যে বিভ্রান্তির বেড়াজাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই চরম দুর্দিনে পুরো বিশ্বব্যাপী আওয়াজ উঠছে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠির হাহাকার। সাধারণ মানুষ কিছু কিছু ধর্মবেত্তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারণা ও 'ইসলামকে' ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ও বাতিল উপাদান হেতু পথহারা হয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক একমাত্র সত্যধর্ম ইসলাম প্রচার ও তাঁর ইন্তিকালের পরবর্তী দুই শতকের মহাত্মন ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদদের কঠোর সাধনার ফল আমাদের ধর্মবিধান বা শরীয়ত দীর্ঘ চৌদ্দশ' শতাব্দি অক্ষুণ্ন থেকে গণনাতীত মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে আসছে। কিন্তু ইদানিং কিছু তথাকথিত, 'আধুনিকপন্থী' একাধিক গোষ্ঠী এই সুপ্রতিষ্ঠিত শরীয়তকে রদবদল করার প্রয়াস পাচ্ছে। আর মজার ব্যাপার হলো, তারা দাবী করছে, তাদের গবেষণা ও দেখানো রাস্তাই নাকি 'একমাত্র' সঠিক ও হক্ক। বাকী সবই বাতিল!

আজকের বিশ্বে ইসলাম নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে তিনটি বিশেষ গোষ্ঠী ভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে মনে হলেও বাস্তবে এদের সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এই তিনটি মুভমেন্ট হলো: ১. ওয়াহ্হাবী, ২. আহলে হাদীস ও ৩. সালাফী। এসব ভিন্ন নামে এরা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে কোনটিরই অস্তিত্ব দু' শতক পূর্বেও ছিলো না। এদের সবার উদ্দেশ্য কিন্তু এক- তাহলো, মাজহাবকে ধ্বংস করা। এরা সবাই শরীয়তের পরিভাষায় 'গ্বাইর-মুকাল্লিক' বা তাক্বলিদ মানে না।

অত্র কিতাবে লেখক উপরোক্ত বাতিল মুভমেন্টগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে খুব বেশী কিছু এখানে বলার প্রয়োজন নেই। তবে পৃথিবীব্যাপী যে হক্বের উপর প্রতষ্ঠিত দলটি এদের দৌরাত্ম্যের শীকার হয়েছে সে দলটির উপর আমি কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সর্বযুগব্যাপী যে দলটি হক্বপথে প্রতিষ্ঠিত আছে তার নাম হলো, "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। সুতরাং মূল আলোচনার পূর্বে এদের সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করছি। সবাই দাবী করে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ এ দল বা ফিরকা হচ্ছে 'ফিরক্বাতুন নাযিয়্যাহ" - অর্থাৎ নাজাতপ্রাপ্ত দল। কিন্তু এ দলের অন্তর্ভূক্তির শর্তাবলী কি সবাই মেনে থাকে? এছাড়া বাস্তবে এ দলটির সঠিক পরিচিতি কি? আমরা ক'জন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর সঠিক ধারণা রাখি?

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ' বাক্যের অর্থ হলো: সুন্নাত ও জামাআতের দল। অন্যকথায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত ও সাহাবায়ে কেরামের একান্ত অনুসারী। যারা নজীবীর সুন্নাতকে বিনাবাক্যে অনুসরণ করে ও তাঁর আসহাবকে সত্যের মাফকাঠি হিসেবে আক্বীদাগতভাবে বিশ্বাস রাখে এরাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত দলভুক্ত।

হযরত আব্দুল ক্বাদীর জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রখ্যাত কিতাব 'গুনিয়াতুত তালিবীন'-এ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সম্পর্কে লিখেছেন: ঈমানদার ব্যক্তিকে অবশ্যই সুন্নাহ ও জামা'আতের অনুসরণ করতে হবে। সুন্নাহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেখানো, দেখানে রাস্তা আর জামা'আহ হলো যাকিছু সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা [দ্বীনের ব্যাপার] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা খুলাফায়ে রাশিদীনের এবং পরবর্তী যুগে জীবিত ছিলেন। [গুনিয়াতুত তালিবীন, প্রথম খণ্ড, ৮০নং চিঠি দ্রঃ]

ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন শরীফ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। সুতরাং ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ’ এর প্রথম অংশের উপর অধিক ব্যাখ্যার দরকার নেই। তবে দ্বিতীয় অংশ- অর্থাৎ ‘সাহাবায়ে কেরামের জামাআত’ বলতে কী বুঝায় তা সবার কাছে স্পষ্ট হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল গনি নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃঃ ১৭৩৩ সাল] বলেন: “জামাত হলো রাহমাত। কারণ মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাহমাত আসার ক্ষেত্র সৃষ্টি। .... এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী যে, যারা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা। .... হাক্ব রাস্তা হলো, সাহাবায়ে কেরামের রাস্তা। যারা এটা অনুসরণ করে তাদেরকেই বলে, ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ’।” [আল-হাক্বিক্বাত আন-নাদিয়্যাহ, ২:১০৩]

‘সালাফী’, ‘আহলে হাদীস’ ইত্যাদি গোষ্ঠী ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -কে তাদের ‘ইমাম’ বলে প্রচার করে থাকে। যেমন বৃটেনের ইপসুইচ শহর থেকে প্রচারিত একটি লিফলেটে তারা বলে: ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়্যুম, ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী, বিন বায, উছাইমিন, আলবানী এবং তাঁদের অনুসরণকারীরাই সঠিক পথে ছিলেন বা আছেন। [ইপসুইচ, ইউ.কে. : জামি’আত ইহিয়্যাত মিনহাজ-আস সুন্নাহ, ১৯৯৩, পৃঃ ২]

কিন্তু উপর্যুক্ত তালিকার প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়্যাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আত সম্পর্কে কি বলেছেন লক্ষ্য করুন। তাঁর ‘আক্বীদাতিল ওয়াছিতিলিয়্যাহ’ গ্রন্থে বলেন: “তাদের আক্বীদা হলো ইসলাম ধর্ম যা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরণ করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকটি যাহান্নামে যাবে একটি ছাড়া যা হলো জামা’আত”। অন্য আরেক হাদীসে আছে, “তারা [ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত দল] হলো ঐ দল যারা আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করে।” সুতরাং এই দলটিই হচ্ছে সঠিক এবং এরাই হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ। এই দলে আছেন সত্যবাদী, শহীদ এবং গুণিজন; এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত, এরাই অন্ধকারে উজ্জ্বল বাতি। ... এই দলেই আছেন সূফী ও ইমামগণ [অর্থাৎ মাজহাব প্রতিষ্ঠাতারা] যাদের দিকনির্দেশনার উপর সকল মুসলমান একমত। এই সফল দলের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছেন: “আমার উম্মার মধ্যে একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রভাবশীল থাকবে; কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীরা কখনো তাদের ক্ষতি করতে পারবে না” [আক্বীদাতিল ওয়াসিতিলিয়্যাহ, পৃঃ ১৫৪]”।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস ও আগের দিনের মহাত্মন ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, তাফসীরকারক প্রমুখ গুণিজনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এই দলটিই যে একমাত্র হক্বপন্থী দল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আধুনিক

যুগে এসে আমরা কি দেখছি? এই হক্বপথে প্রতিষ্ঠিত দলকে একাধিক গোষ্ঠী পদানত করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। এই দলগুলোর সঠিক পরিচয় ও তাঁদের ভ্রান্তি অত্র কিতাবে লেখক উদ্ধৃতি, উপমা ও যুক্তির মানদণ্ডে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া 'আধুনিকবাদী' মুসলিম চিন্তাবিদদের ভ্রান্তি তুলে ধরে গ্রন্থের শিরোনাম, 'আমি কেনো মুসলমান' প্রশ্নের সঠিক সমাধান খুঁজেছেন। বইটি পাঠ করে সকলেই উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষকরে 'সালাফী', 'আহলে হাদীস', 'ওয়াহ্হাবী' ও 'মওদুদীবাদ' সম্পর্কে পাঠকের মনে সঠিক ধারণা জন্ম নেবে ও এদের বতিল আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচন হবে- যা আজকের মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত, অনৈক্য ও অমুসলিম দুশমনদের টার্গেটে পরিণত করেছে। এছাড়া লেখক তাক্বলিদ, মাজহাব ও হানাফী ফিক্হের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। তাক্বলিদের গুরুত্ব ও সেসাথে মাজহাব সাধারণ্যের জন্য ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বইটিতে স্পষ্ট হয়েছে। এতে অনেকেরই মনে মাজহাব সম্পর্কিত সকল দ্বিধার অবসান ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিতাবে ইসলামী বিশাল জ্ঞানের উপর বহুবিদ আলোচনা করেছেন। বিষয়ের ব্যাপকতা হেতু হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে, তথাপি ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটি 'ইনট্রোডাকশ' হিসেবে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে মনে করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় ইদানিং প্রচুর ইসলামী লেখালেখি শুরু হয়েছে যা সবার জন্য সুখবর বটে। সুতরাং এদিক থেকে বিবেচনা করলে লেখক এই কিতাবটি উপহার দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী অনুসন্ধিৎসুদের আকাঙ্ক্ষা কিছুটা হলেও পুরণ করেছেন। আমরা লেখকের সুচিন্তিত লেখালেখি আরোও কামনা করি এবং অত্র কিতাব লেখার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহর পবিত্র দরবারে তার সুস্বাস্থ্য ও দুনিয়া আখিরাতের মুক্তি কামনা করি। আ-মিন।

(ইঞ্জিনিয়ার) আজিজুল বারী
লন্ডন, ৮-১১-০৬ ঈসায়ী।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা- রাসূলিহিল কারীম

প্রথম পর্ব

হাদীস শরীফের বাণী

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে (উদ্দেশ্যে) তার হিজরত (পরিগণিত) হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ করা অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় তারই নিয়তে, যে নিয়তে সে হিজরত করেছে।" (মিশকাত, বুখারী ও মুসলিম শরীফ) গ্রন্থের শুরুতে হাদীসটি উল্লেখের কারণ ও ব্যাখ্যা যথাস্থানে রয়েছে।

ফিতনার যুগে পদার্পন করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ। কিয়ামত খুব কাছে এসেছে। অতি তাড়াতাড়ি মহাবিপ্লব শুরু হবে। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- শীঘ্রই এমন ফিত্না দেখা দেবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে, চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। যে ফিতনায় লিপ্ত হবে তাকে সে ফিতনা ধ্বংস করে দেবে। যে ব্যক্তি তা হতে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসটির ভবিষ্যদ্বাণী ও ব্যাখ্যার সাথে বর্তমান যুগের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অতি সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষাভাষি মুসলিম সমাজে হাজারো ফিত্নার মধ্যে একটি বড় ফিত্না জন্ম নিয়েছে যে, "সূফীতত্ত্ব বা তাছাউফতত্ত্ব মূলত বিভ্রান্ত মতবাদ। কুরআন-হাদীস দ্বারা এর কোনো ভিত্তি প্রমাণিত নয়। অতএব বহুমুত্র রোগীকে যেভাবে চিনি থেকে দূরে থাকতে হয়, তেমনি আজকের মুসলমানকে তাছাউফতত্ত্ব বা সূফীতত্ত্ব থেকে দূরে থাকতে হবে। একবিংশ শতাব্দির এই ঊষালগ্নে সুফীতত্ত্ব বা তাছাউফতত্ত্ব ইসলামকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে। ইসলাম আগমনের বহু শতাব্দী পরে এই তাছাউফতত্ত্ব বা সুফীতত্ত্বের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষ তথা ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যের আমলে। অতএব বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচে বড় অন্তরায় এই সূফীতত্ত্ব বা তাছাউফতত্ত্ব।"

তাছাউফতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাবার আগে একটি উদাহরণ প্রয়োজন। যেহেতু আমরা বিলেতে বসবাস করছি, অতএব এই দেশের প্রেক্ষাপটেই উদাহরণটা নেয়া উচিত।

সাধারণ একজন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোক। দীর্ঘকাল থেকে অভিবাসী মুসলিমদের সাথে একই এলাকায় বসবাস করছেন। মুসলিমদের সাদাসিদে জীবন-যাপন, নিরব ইবাদত-বন্দেগী দেখে হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগলো 'আমি কেনো মুসলমান হবো?'

স্থানীয় একজন সাধারণ মুসলিমকে তিনি উক্ত প্রশ্ন করলেন।

উত্তরদাতা বললেন, দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্নকারী বললেন, দুনিয়াতে আমার শান্তির তো অভাব নেই! দেখুন না! আপনি সপ্তাহে সাতদিন কাজ করেন, অথচ আপনার চারিধারে শুধু অভাব আর দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা বিরাজমান। আমি তো দেখছি আপনাদের সমস্ত মুসলিম সমাজটাই অশান্তির দাবানলে প্রতিদিন দাউ দাউ জ্বলছে। এমন একটা মুসলিম পরিবার দেখাতে পারবেন না, যেখানে অশান্তি আর দুঃখ-যন্ত্রণা নেই। বর্তমান মুসলিম পরিবারে বাপের মন-মানসিকতা একদিকে, ছেলের চিন্তাধারা অন্যরমক। স্ত্রী'র জীবন-যাপনের চাহিদা বাস্তবমুখী, স্বামীর জীবনবোধ পিছিয়ে পড়া। পুরো দুনিয়ার জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথচ মুসিলম পরিবারে বিরাজ করছে মতানৈক্য আর মতদ্বৈধতার হানাহানি। আর এই তৎপরতা সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র ভেতর। মুসলিম ব্যক্তি নির্বিচারে মুসলিম হত্যায় লিপ্ত হয়ে যায়, একবার চিন্তাও করে না যে, তারা একে অন্যে দ্বীনি ভাই।

এই তো দেখুন না! পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান, শাদ, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশের আজ কি করুণ চিত্র! ভালো করে দেখুন! দৃষ্টির ভেতর হৃদয়ের ভাব মিশ্রিত করে তাকান! সেসব দেশের সাধারণ মানুষ আজ স্বদেশে উদ্বাস্তু। বহুমুখী যন্ত্রণার জ্বালায় ঘরবাড়ি ছেড়ে মরুভূমির ধু ধু প্রান্তরে ঠাঁই নিয়েছে। মাথার উপরে নেই ছাদ। মাটির উপরে নেই বিছানা। শিশুদের ভূখা কান্নায় প্রকম্পিত হচ্ছে মরুময় হাওয়া। এক ফোটা বিশুদ্ধ পানি ও এক বেলার খাবারের অপেক্ষায় দিন কাটে নিরীহ মানুষগুলোর। অথচ উন্নত নাগরিক নামক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মতদ্বৈধতা ও মতানৈক্যের কারণে চলছে গৃহযুদ্ধ। দলীয় প্রতিহিংসার জ্বালায় কেউ যুদ্ধ করে মরছে আর কেউ শহর ছেড়ে পালিয়েছে উদ্বাস্তুর পথে।

আবার দেখুন, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ ধন-দৌলত আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। বাস্তববাদী দুনিয়ার মানুষ ভূখাপেটে মৃত্যুবরণ করে না। ভালো করে দেখুন! ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে আজ উন্নয়নের জোয়ার বইছে। শুধুমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ছাড়া বাদবাকী সবদেশেই শান্তি আর নিরাপত্তার গ্যারান্টি বিদ্যমান। এসব দেশের মানুষ অন্তত অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে না। ভিক্ষার উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তিকে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে না। কোনো একজন নাগরিকও কষ্ট পাচ্ছে না বেআইনী কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতার আগ্রাসনে।

আরেকবার তাকান, বর্তমান দুনিয়ার ইসলামপন্থীদের ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্য-

উদ্দেশ্যের দিকে। ভালো করে, স্থির দৃষ্টি দিয়ে তাকান! কি দেখতে পাচ্ছেন? উন্নত দুনিয়ার মহিলারা যেখানে জীবনের স্বাদ উপভোগ করছে, সেখানে মুসলিম মহিলারা পাঁচ কাপড়ের প্যাকেটে বন্দী। উন্নত বিশ্বের কিশোর-কিশোরীরা যেখানে স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে, সেখানে মুসলিম ছেলেমেয়েরা পিতামাতা ও সমাজপতিদের শাসনের ডান্ডা দেখে কম্পমান। উন্নত দুনিয়ার তরুণ-তরুণীরা যেখানে উন্মুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে ফুর্তি-আমোদ করতে পারছে, সেখানে মুসলিম তরুণ-তরুণীরা নিজের ঘরে বা শিক্ষালয়ে মুরুব্বীদের পায়ে তেলমালিশ করছে। উন্নত বিশ্বের যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে জীবনের স্বাদ উপভোগ করার মধ্যদিয়ে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। তবে মুসলিম বিশ্বের যুবক-যুবতীরা নেতা বা গুরুজীর নির্দেশে বুকে বোমা বেঁধে নিরীহ লোকদের হত্যায় লিপ্ত রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের এইসব চিত্র দেখে আমি কোন্ যুক্তিতে ইসলাম গ্রহণ করবো? এই জীবন-ব্যবস্থায় তো আমি দুনিয়াতে শান্তি দেখতে পাই না।

আজকের উন্নত দেশগুলোর সরকার চলে তার নিজস্ব পথে। কিন্তু সরকার কখনো আইনের ঊর্ধে নয়। আদালতে নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারের গ্যারান্টি রয়েছে বলে আপনিও আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করছেন। আপনার দেশে তথা পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশেই স্বায়ত্ত্বশাসিত ন্যায় বিচারের পরিবেশ নেই।

এবার চোখতুলে তাকিয়ে দেখুন মুসলিম দেশগুলোর দিকে! ভালোকরে দেখুন! সেখানে নেতৃত্ব নিয়ে চলছে দ্বন্দ্ব। বাপে বেটায় মন-কষাকষি। স্বামী স্ত্রী-তে মতানৈক্য। ঘরে ঘরে শক্রতা আর লাঠালাঠি। এক দল ভেঙ্গে ডজন ডজন দলের উৎপত্তি। একই দেশ ও জাতির ভিতরে যুগ যুগ ধরে গৃহযুদ্ধ বিরাজমান। অথচ সকলেরই চিন্তাধারা ও আন্দোলন একমাত্র দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা অর্জনের লক্ষ্যে।

বলুন! মুসলিম বিশ্বের কোথাও কি শান্তি আছে? এমন কথা বলতে পারবেন? একটি দেশ অথবা একটি এলাকা দেখিয়ে প্রমাণ দিতে পারবেন যে, ওখানে শান্তি-শৃংখলা বিরাজমান? না! একটা দেশও নেই। বিশ্বের কোথাও আজ কুরআন-হাদীসের শাসন বলবৎ নেই। আপনারা তা প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না।

একদিকে আপনারা কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চিৎকার দেন। অন্যদিকে আপনাদেরই জ্ঞাতি ভাই বিরোধিতা করে। আপনাদের কেউ কেউ হাদীসের আগা-গোড়া বাদ দিয়ে শুধু মধ্যমাংশ নিয়ে পৃথিবীতে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। কেউ হাদীসের প্রথমাংশ, আর কেউ দ্বিতীয়াংশ বাদদিয়েও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। আজকের পৃথিবীতে এমনও লোক আছে যে, কুরআনের কিছু অংশ বাদদিয়েও যদি ইসলামী হুকুমত করায়ত্ব করা যায় তবু ভালো।

আপনাদের কেউ কেউ কট্টর কুরআনপন্থী। কেউ কেউ কট্টর হাদীসপন্থী। আবার কেউ কেউ কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে হঠাৎ ঘোষণা দেন মডারেট ইসলামপন্থী বলে। এই যে, দল আর দলীয় তৎপরতা তা কি কখনো মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে বা পারবে?

আপনাদের উলামায়ে কেরামের মাঝে আজ দলাদলি, মতানৈক্য, হিংসা, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, এমনকি মারামারি পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। একে অন্যকে আপনারা কাফির ফতোয়া দেন, আবার

কিছুদিন পর একই থালায় বসে খাবারও হজম করেন। মাসআলা-মাসাঈল নিয়ে আপনারা যেমন দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ করেন, তেমনি মসজিদ-মাদরাসা নিয়েও হাতাহাতি করেন। তারপরও আপনারা পৃথিবীতে কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর এবং চিৎকার দিয়ে বলেন, ইসলাম হচ্ছে শান্তির জীবন-ব্যবস্থা। এসব কথায় আর কাজে কি মিল হলো?

এবার একটু লক্ষ্য করুন! ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে যেকোনো দলই করুন না কেনো, সবাইকে চরিত্রবান এবং মিথ্যাহীনতায় বদ্ধপরিকর হতে হবে। অর্থাৎ সত্যবাদিতা ইসলামের মূলমন্ত্র। কিন্তু ক'জন মুসলিম আজ দেখাতে পারবেন পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? সাধারণ মুসল্লী থেকে শুরু করে উলামায়ে কেরামের একজন ব্যক্তিও কি আজ আবিষ্কার করতে পারবেন, যিনি জীবনে একটি শব্দও মিথ্যা বলেন নি? এরকম সত্যবাদী আপনি হাজির করতে পারবেন না! তাছাড়া, ইহুদী-খৃষ্টান সমাজে যেসব কর্মকান্ডকে আপনারা অপকর্ম বলেন, সেগুলো ইদানিং মুসলিম সমাজেও স্বীকৃত। আপনি-আমি সবাই জানি, মুসলিম ব্যক্তি মরে গেলেও শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। শূকরের মাংস যেমন হারাম, তেমনি সুদ, ঘুষ, মদ্যপানও হারাম। অথচ আজকের মুসলিম সমাজে সুদ, ঘুষ আর মদ্যপানের কোনো বালাই নেই। তুলনামূলকভাবে মদ্যপের সংখ্যা কম হলেও প্রত্যেকটি বিজ্ঞ মুসলিম ব্যক্তিই কোনো না কোনোভাবে সুদ-ঘুষের হারাম কাজে লিপ্ত রয়েছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। অন্তত ইসলামের পরিভাষায় তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনের নিরীক্ষণে একজন মুসলিম ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না যে, সুদ-ঘুষের চক্করে পড়েন নি! তবুও আপনি বলছেন, ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়ায় শান্তি পাবো?

এই তো দেখুন না! মুসলিম জাতি আজ শিয়া ও সুন্নী নামক বিশাল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

এরপর দেখুন! শিয়া'দের মাঝে যেমন রয়েছে শত শত দল ও দলাদলি, তেমনি সুন্নীদের মাঝেও রয়েছে হাজার হাজার দল ও মতের বিভক্তি।

ইদানিং আবার 'মডারেট ইসলাম' নিয়ে আরেকটি দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের ধারণা হচ্ছে যে, "মাজহাবপন্থীদের ফিকাহ্ শাস্ত্র একপ্রকার অপবিত্র জীবন-ব্যবস্থা। তাদের মতে, একজন অমুসলমানকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, একজন হানাফী মাজহাব অনুসারীকে সঠিক পথে আনয়ন করা। জনগণের মধ্য হতে হানাফী মাজহাবের বিষাক্ত এবং অপবিত্র জীবাণু খতম করে দেওয়া এবং মুসলমানদেরকে আবু হানীফার ফিকহার অনুসরণের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ এবং তাঁর হাদীসের উপর আমল করার প্রশিক্ষণ দেওয়া।" তারা আরো মনে করেন যে, "ফিকাহ এমন একটি মাকরূহ্, অনাকাংখিত ও অপবিত্র বিষয় যার উপর প্রস্রাব করলে প্রস্রাবও আরো বেশি অপবিত্র হয়ে পড়ে। এসবের চেয়ে আরো খারাপ হলো, তাবলীগ জামাতের প্রসার। দাড়ি-টুপী, লম্বা জামা ও পাগড়ীকে আসল সুন্নত মনে করে এই পথভ্রষ্ট জামাত পুরো জাতিকে অকর্মন্য, অলস এবং প্রতিক্রিয়াশীল করায় বদ্ধপরিকর। এদের দৃষ্টিতে তাবলিগী নেছাব কোরআন শরীফ হতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাবলিগী নেছাব হলো, কতকগুলো মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনীর

সমাহার। এই তাবলিগী মিশনও হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্তের একটা অংশবিশেষ।” (মাসিক ইসলামী সমাচারে প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ, পরবর্তী অধ্যায়ে লেখাটির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)

এবার বলুন! আপনাদের নিজেদের মাঝে একে অন্যে যদি এরকম ধ্যান-ধারণা থাকে, তাহলে আমরা কোন্ দল বা গোষ্ঠির হাতে বাইয়াত নিয়ে ইসলামে দাখিল হবো?

একইভাবে, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে আজকে যারা মডারেট ইসলামের দাবী নিয়ে মাঠে নেমেছেন, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর ফরেন অফিসসমূহ। যারা অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার সাথে এদেরকে অর্থবল, বাহুবল এমনকি ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যার লেবেল লাগিয়ে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দান করছেন। তারপরও আপনি আমাকে বলছেন, আমি যেনো ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়ায় শান্তিতে জীবন-যাপনের পথ বেছে নেই?

পরবর্তী কথা হচ্ছে, আখিরাতের মুক্তি। আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে প্রথমে আমাকে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে আমি তো আখিরাতে বিশ্বাস করি না! কারণ, দুনিয়াতে যদি যিল্লতীর জীবন-যাপন করতেই থাকি, তাহলে এই আখিরাত দিয়েই আমার হবেটা কি? বর্তমানের ইসলাম যদি দুনিয়াতে শান্তি দিতে পারে না, তাহলে আখিরাতে মুক্তি দিতে পারবে বলে কি গ্যারান্টি আছে? তাছাড়া, এটা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বা উত্তরাধুনিক যুগ। এ যুগের মানুষ যা দেখে, তাই বিশ্বাস করে। অতএব আল্লাহ্‌কে আমি খালি চোখে দেখি না, সুতরাং বিশ্বাস করতে পারি না! ফেরেশ্‌তা দেখা যায় না! তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে! কারণ, কুরআন বলেছে, প্রত্যেকটি মানুষের দুই কাঁধে দু’জন ফেরেশ্‌তা রয়েছেন। যারা হিসাব রক্ষার কাজে নিযুক্ত। অথচ কম্পিউটারের মাধ্যমে আজকের বিজ্ঞান সে দায়িত্ব পালনেও প্রস্তুত। অন্যদিকে, জন্ম-মৃত্যু কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে যদি সত্য হয়, তাহলে মানবক্লোনিং ও ডিএনএ-এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ইদানিং সে হিসেব রাখতেও সক্ষম।

এরপর আপনি হয়তো বলবেন, উন্নয়নশীল দেশের ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন-যাপনের মাঝেও কিন্তু আত্মিক শান্তি নেই। আত্মার কিছু তৃপ্তিমূলক শান্তির প্রয়োজন। আর এগুলো পেতে হলে আপনাকে কোনো বিজ্ঞ আলিমের দ্বারস্থ হতে হবে।

আমি মানলাম আপনার উপদেশ! এবার দেখান! কোথায় আছেন সেই বিজ্ঞ আলিম, যার কাছে গেলে আমি আত্মার খাদ্য পাবো? এরকম একজন ব্যক্তিও আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন না! কারণ, বিরাট বিরাট টাইটেল আর ডিগ্রীধারী যে সকল মনে মনে মুজাদ্দিদ এই সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের কথা ও কাজ এক এবং অভিন্ন নয়।

এই তো দেখুন না! মডারেট ইসলামের দাবীদার একশ্রেণীর উলামায়ে কেরাম ইদানিং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে সৎ লোক হতে হবে। এটা স্বাভাবিক শর্ত। অথচ তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র আইন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পূর্ণ সমর্থনকারী নন। একদিকে, তারা আল্লাহ্‌র কুরআনকে বিশ্বাস করলেও কুরআন প্রদত্ত জ্ঞানের একটি অংশ

অস্বীকার করেন। যেমন, দুই প্রকারের জ্ঞান নিয়ে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একটা বাহ্যিক জ্ঞান বা ইল্‌মে যাহির। অন্যটা আত্মিক জ্ঞান বা ইল্‌মে বাতিন। উক্ত মডারেট ইসলামের দাবীদারগণ ইদানিং ইল্‌মে বাতিনকে মোটেও গ্রহণ করতে পারছেন না। অন্যদিকে, এই দলের লোকেরা হাদীসগুলো নিয়েও যথেষ্ট যাচাই বাছাই শুরু করেছেন। যে সকল হাদীস দুনিয়াবী স্বার্থ আদায়ে ফায়দাকর এবং ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে সমতা রক্ষা করা যায়, সেগুলো তাদের কাছে সহীহ্ বা বিশুদ্ধ। বাদবাকী সবগুলো হাদীসই দুর্বল কিংবা জাল বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

তাহলে বলুন! আমি এখন কার কাছে যাই? আপনাদেরই দ্বীনি ভাই একদল লোক যখন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কটুক্তি ও সমালোচনা করেন, তখন আপনি কি নির্বাক গ্রহণ করবেন? সাহাবায়ে কেরাম কি প্রকারের বিশুদ্ধ মানুষ হবেন, সে ভবিষ্যৎবাণী তো অগণিত ভেজালে ভর্তি আমাদের এই তাওরাত এবং বাইবেলেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখনো বাইবেলের সেই বাক্যগুলো হুবহু পাওয়া যায়।

এখন বলুন! আপনাদের কিছুসংখ্যক আলিম তো কোমরে গামছা বেধে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় লিপ্ত। সাহাবায়ে কেরামের রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী করা ইসলামের এই ইমারতকে তারা ভেঙ্গে দিচ্ছেন!

আজ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে বিশুদ্ধতা নেই। এটা আপনি যেমন বলেন, তেমনি আমিও স্বীকার করি। এটাও স্বীকার করি যে, কুরআনুল কারীম এখনো বিশুদ্ধ আসমানী কিতাব হিসেবেই মুসলিম মানসের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কুরআনের পর পর হাদীসগ্রন্থ ও সাহাবায়ে কেরামকে যখন ভেজালপূর্ণ মনে করা হয়! তখন কি কুরআন শরীফ আর পবিত্র থাকে?

আপনি বিষয়টা সহজে বুঝতে পারছেন না হয়তো! একটা উদাহরণ দেই! একটি বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হাড়িতে যদি এক কেজি চাউলের ভাত রান্না করেন এবং কেউ যদি ঐ ভাতে অখাদ্য বস্তু ঢেলে দেয়। আপনি তখন কি করবেন? ভাত তো খাবেনই না বরং হাড়িটিকে ধুয়ে মুছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আবার রান্না বসাবেন। এই তো নিয়ম? এবার ধরে নিন পবিত্র কুরআন শরীফ একটি ভাতের হাড়ি এবং হাদীস শরীফ ঐ হাড়িতে রান্না করা অন্ন। হাড়িটি যতোই পবিত্র ও পরিষ্কার থাকুক, আবার ধোয়ার বা রান্না করার তো কোনো উপায় নেই! তা ছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেষট্টি বছরের জীবনে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর যে হাদীস শরীফ হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাতে ভেজাল রয়েছে বলে মন্তব্য করার অর্থই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন এবং সমস্ত কুরআন শরীফকে প্রত্যাখ্যান করার সামীল!

কি বলেন? আমার উদাহরণে আপনার বুঝ হবে? হয়তো হচ্ছে না! আরেকবার দেখুন! ধরে নিন, কোনো কারণে ঐ পবিত্র হাড়ির ভিতরে কিছু অপবিত্র বস্তু পড়ে গেছে। তখন আপনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই অপবিত্র জিনিসগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ বস্তুগুলোকে একস্থানে এবং অপবিত্র মিশানো জিনিসগুলোকে অন্যস্থানে রাখতে গেলেন। এবার বুকে হাত দিয়ে বলুন! যখন আপনি বাছাই করতে যাবেন, তখন যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপবিত্র জিনিস ঐ হাড়ির গায়ে লেগে যায়! এরকম লাগার তো সম্ভাবনা অধিক। তাহলে আপনি কি করবেন? পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করবেন, নাকি প্রত্যাখান করবেন? অথবা একথা বলবেন যে, এই

আয়াতকে বাদ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, যেহেতু এতে অপবিত্র জিনিস লেগে গেছে! এরকম সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে আপনি সমর্থন দেবেন?

আপনি এদেরকে সমর্থন দিতে পারবেন না! কারণ, 'যারা কুরআনের একটি বাক্য কিংবা শব্দকে অস্বীকার করবে, তারা যেনো তাদের স্থান জাহান্নামে করে নেয়। জাহান্নাম তো কাফিরদের জন্য।' একইভাবে হাদীস শরীফেও এসেছে, যে ব্যক্তি হাদীসের একটি বাক্য কিংবা শব্দকে অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তি সাথে সাথে মুরতাদ হয়ে যাবে।

এবার আরেকটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করুন। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে চ্যালেঞ্জ করে মাঠে নেমেছে। আল্লাহ্ তাআলাও শয়তানের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে তার চাহিদানুযায়ী কিছু বাড়তি শক্তি দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। এখন সে স্বাধীন বিচরণ করছে মানুষের রক্তে ও মাংসে।

মানুষকেও আল্লাহ্ তাআলা কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে, মানুষেরা পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলায় দিনাতিপাত করছে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতা ও শান্তি-শৃংখলা পেয়ে এবং শয়তানের প্ররোচনায় যারা অতিলোভী হয়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে অবিশ্বাসী হচ্ছে, তারাই কাফির। যারা কাফির হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার অগণিত শান্তি ও ঐশ্বর্য্য। দুনিয়ার সম্পদ, মান-মর্যাদা, ধন-দৌলত, প্রতিপত্তি সবই তাদেরকে দান করা হচ্ছে। কিন্তু আখিরাতের দরোজা তাদের জন্য বন্ধ।

অন্যদিকে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত চায়, তাদের প্রতি পরীক্ষা দানের নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঈমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই দুনিয়া ও আখিরাত দান করবেন। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে বনী-ইসরাঈল বংশধারার কিছুসংখ্যক লোক কৌশলের পথ অবলম্বন করে। তারা বিনা পরীক্ষায় দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি চায়। দ্বিতীয় খলিফার যুগ পর্যন্ত তারা তেমন একটা সুবিধা করতে পারে নি। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর খিলাফতকালে তাদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ইতিহাসে যাদেরকে খারিজী ও রাফেজী বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর আমলে খারিজী তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ হলেও রাফেজী মুনাফিকী সমূলে ধ্বংস হয় নি। ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে তাদের নিরব-সরব ভূমিকা আজো অব্যাহত রয়েছে।

সুন্নাহ্ বহির্ভূত সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি

অতীতের খারিজী (বা ইসলাম বহির্ভূত) সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটি প্রবাদবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, "একটি মিথ্যাকে ঢাকা দিতে হাজারো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় এবং মিথ্যা একবার প্রচারিত হলে, সাত-তাড়াতাড়ি সত্যরূপে পরিগণিত হয়।"

উপরোক্ত প্রবাদের সাথে 'শিয়া' উৎপত্তির অবিচ্ছেদ্য গুরুত্ব রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে আম্মার, বিদ্রোহীদল তোমাকে হত্যা করবে।" উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ একটি হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। মূল হাদীসের প্রথম একটি

শব্দ ও শেষের পাঁচটি শব্দ নিয়ে গঠিত এই ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করেই একশ্রেণীর মুসলিম আজো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

আল্লাহ্‌র একত্ববাদে অবিশ্বাসী ইহুদীচক্রই উপরোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে অপপ্রচারের আশ্রয় নেয়। মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর ইহুদী মুনাফিকরা হাদীস নিয়ে গবেষণা, লেখালেখি ও অপপ্রচার শুরু করে। যেহেতু তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জীবৎকালে পবিত্র কুরআন ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা রোধ করতে পারে নি। অতএব-পরবর্তীতেও যদি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে মুমিন-মুসলমানদের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা যায়, তবেই তাদের সার্থকতা।

তৎকালীন ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা দেখলো, পবিত্র কুরআন শরীফকে কোনোক্রমেই কলুষিত করা যাবে না। যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাই তারা হাদীস শরীফের উপর আক্রমণ চালায়। সহীহ্‌ হাদীসের কিছু অংশ বাদ দিয়ে নতুন নতুন প্রোপাগান্ডা ছড়াতে শুরু করে।

উপরোল্লিখিত হাদীসটির প্রকৃত বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে ছুমাইয়ার পুত্র আম্মার! আমার সাহাবাগণের কেহ তোমাকে হত্যা করবে না, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।” (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত গ্রন্থ, ভুল সংশোধন)

অথচ চক্রান্তকারীরা প্রোপাগান্ডা ছড়ায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীতেই উল্লেখ করা হয়েছে, “হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর হত্যাকারী হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর পক্ষাবলম্বনকারী দল। অতএব এরা বিদ্রোহী।” (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত গ্রন্থ, ভুল সংশোধন)

তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ ও গবেষণা ইত্যাদি বহুল প্রচারিত হতে থাকে। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনাটিকে যুক্তিদক্ষতায় সত্যের প্রলেপ দিয়ে ইতিহাসের পাতায় চালিয়ে দেয়। যদিও তৎকালীন গবেষকদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু চক্রান্তকারীদের অব্যাহত প্রচারণার দরুণ আসল সত্যটি এখনো ধূঁয়াটে রয়ে গেছে। এখনো ‘মডারেট’ গবেষক শ্রেণীর তথ্যানুসন্ধানীরা অতীত ইতিহাস থেকে কুঁড়ানো অমূল্য সম্পদ মনে করে, পূর্ণ মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করেন।

উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কিত মূল ঘটনা

হযরত মুছা আলাইহিস্‌সালাম-এঁর সময় থেকেই ইহুদী জাতির দুষ্টুমী, চতুরতা, দুরভিসন্ধি ও মুনাফিকীর ফিরিস্তি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআনেও তাদের সম্পর্কে বিশাল ভাষ্য রয়েছে। শয়তান যেভাবে জান্নাত থেকে লানত্‌-প্রাপ্ত ও বহিঃষ্কৃত হয়েছিল, ইহুদী জাতিও একইভাবে দুনিয়ার জমিনে বহিঃষ্কৃত। এখনো পৃথিবীতে তাদের স্থায়ী নিবাস নেই। [বর্তমানের ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটি মূলত অস্থায়ী। পৃথিবীর কোনো মুসলিম রাষ্ট্র এখনো ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারবে না।]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের আমলেই ইহুদী জাতির আজীবন চক্রান্তকারী মনোভাবের ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তারা বিভিন্নভাবে জ্বালাতন, নির্যাতন ও মনোকষ্ট দিয়েছে। তবে তাদের মূল ষড়যন্ত্র কখনো ফলপ্রসু হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতের মুমিনদের উপর ইহুদী চক্রান্ত যে- অত্যন্ত মারাত্মক ও জঘন্য হবে সে বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য ও ভবিষ্যৎবাণী ব্যক্ত করেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, "হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা এক ইহুদী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে গমনকালে (সালামের ভান করে) 'আসসামু আলাইকা' বললো, 'আসসালামু' শব্দের পরিবর্তে 'আসসামু' বললো- শব্দটির অর্থ 'মৃত্যু' অর্থাৎ আপনার উপর মৃত্যু পতিত হোক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তরে বললেন, 'আলাইকা'- তোমার উপরও। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা বুঝতে পেরেছো সে কি বলেছে? সে বলেছে, 'আসসামু আলাইকা'। সাহাবীগণ বললেন, তাকে হত্যা করবো নাকি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। অবশ্য ইয়াহুদ-নাসারাগণ তোমাদিগকে সালাম করলে (যেহেতু তারা সালামের ভান করে, অনেক সময় 'আসসামু' শব্দ ব্যবহার করে, তাই) তোমরা উত্তরে বলে দিও 'আলাইকুম'- তোমাদের উপরও। (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক মাসআলা'র উল্লেখ করেছেন। এ সাথে বিশাল আকারের একটি ইতিহাস সংযুক্ত হয়েছে। সে ইতিহাসের অনুবাদ করেছেন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব, তাঁর বুখারী বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে সে ইতিহাসটা এখানে তুলে ধরা হলো। এই ইতিহাসের সাথে বিগত চৌদ্দ'শ বছরের একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতার যোগসূত্র রয়েছে।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় যেসকল মাসআলা বা আইনানুগ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে, তা হলো-

(এক) আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বললে সে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে। খাঁটি তওবা করার পরও দুনিয়ার আইনী শাস্তিস্বরূপ তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। আর কোনো জিম্মী অর্থাৎ অমুসলিম নাগরিক ঐরূপ কাজ করলে তাকে বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে এবং মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। তবে অস্পষ্ট ভাষায় যদি তা করে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব দেখা দেয় তাহলে তার মৃত্যুদন্ড মওকুফ থাকবে। যা উপরে বর্ণিত হাদীসে ঘটেছে।

মুরতাদের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে, কোনো একটি ফরয, ওয়াজিব এমনকি অনেকগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোনো সুন্নাত যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে মুরতাদ-কাফির বলে গণ্য হবে। যেমন, 'মিসওয়াক' বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত। কেউ যদি তা সুন্নাত নয় বলে উক্তি করে, তবে মুরতাদ হয়ে যাবে।

যিন্দীক্- অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের সব কিছুই স্বীকার করে কিন্তু ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান বা হুকুম আহকামের কোনো একটির এরূপ ব্যাখ্যা করে, যে ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়তে বিদ্যমান সাহাবীদের, তাবেয়ীদের এবং পরবর্তী মুসলিম জনসমাজে প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে গরমিলপূর্ণ। যেমন- কোনো ব্যক্তি ইসলামের রুকন 'সালাত' বা নামায স্বীকার করে, কিন্তু নামাযের এরূপ

আজগুবি ব্যাখ্যা করে থাকে যাতে রুকু-সেজদা নাই, কুরআন তিলাওয়াত নাই, মুসলিম সমাজে প্রচলিত নামাযের কোনো কিছু নাই। তদ্রূপ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেও ব্যাখ্যা দেয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আরো নবী এলেও 'খাতামুন নাবীয়্যিন'-এর অর্থ ক্ষুন্ন হয় না। অথবা জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করে, তবে জান্নাতকে কেবল আত্মার আনন্দ এবং জাহান্নামকে শুধু আত্মার যন্ত্রণাই জ্ঞান করে। ইসলামের পরিভাষায় 'যিন্দীক' মুরতাদের সমপর্যায়ের অপরাধী।

মুলহিদ- যে ব্যক্তি ইসলামের দাবী ও কলিমা ইত্যাদির স্বীকারোক্তি করলেও কুরআন-হাদীস বা ইসলামী নীতি-আদর্শের কোনো বিষয় ভুল ব্যাখ্যার আড়ালে গোঁজামিল, হেরফের ও বিতর্কের আশ্রয় নিয়ে ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট আক্বীদার পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করে। ইসলামের পরিভাষায় তাকে 'মুলহিদ' বলা হয়।

ব্যাখ্যা স্বরূপ যেমন- কোনো ব্যক্তি ইসলামের কলিমা স্বীকার করে, নামায-রোযা নিয়মিত পালন করে, কুরআন শরীফ নিয়মিত তিলাওয়াত করে, কিন্তু সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে বা স্বীকার করে- এইরূপ ব্যক্তি "মুলহিদ" নামী মুরতাদ ও কাফির সাব্যস্ত হবে। কারণ, ইসলামের একটি সুস্পষ্ট আক্বীদা এই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো প্রকারের নবী ও রাসূল আসবেন না। তদ্রূপ যদি কেহ যাকাত ফরয না হবার মত পোষণ করে ইত্যাদি।

বুখারী শরীফের পরিশিষ্ট খন্ডে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, মুলহিদ শ্রেণীর মুরতাদদের মধ্যে একটি বিশেষ দল হচ্ছে- "খারিজী ফির্‌কা"। মুসলিম সমাজে আবির্ভূত সর্বপ্রথম বিভ্রান্ত ভ্রষ্ট গোমরাহ্ এই দলটিই খারিজী ফির্‌কা। খারিজীদের ভ্রষ্টতার কাহিনী সুদীর্ঘ এবং মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে ও দ্বীন ইসলামের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে কুঠারাঘাত হানতে তাদের ভূমিকা জঘন্য, হৃদয়বিদারক এবং ইতিহাস রঞ্জিত। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ করেছেন।

মুসলমানদের মাঝে আবির্ভূত একটি বিশেষ দল সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী উল্লেখ করে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসগুলোতে- সেই দলটি ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধনকারী, ইসলাম বহির্ভূত এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিশয় ক্রোধের প্রকাশ রয়েছে। এখানে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি হলো- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামান দেশ থেকে (উসুলকৃত বায়তুল মালের প্রাপ্য) কিছু পরিমাণ অপরিশোধিত স্বর্ণ চামড়ার থলিতে ভরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সম্পদের সবগুলোই চার জন লোকের মাঝে ভাগ করে দিলেন। একজন সাহাবী এই সম্পর্কে উক্তি করলেন, আমরা এই সম্পদ পাওয়ার অধিক যোগ্য ছিলাম। এই উক্তির সংবাদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো এবং তিনি (লোকদিগকে একত্রিত করে) বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন, সকাল-বিকাল আমার নিকট (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) ওহী এসে

থাকে। তোমরা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করো কি না?

এই সময় এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হলো- লোকটির চক্ষুদ্বয় গভীর, গন্ডদ্বয় স্ফীত, ললাট উঁচু, দাড়ি ঘন ও মাথা মুড়ানো ছিলো এবং পরিধেয় বস্ত্র গোছার মধ্যবর্তী ছিলো। সে (ভীষণ বেআদবী করে) বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! খোদাকে ভয় করুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, পোড়া কপাল তোর! দুনিয়ার বুকে আমি কি খোদাকে সর্বাধিক ভয় করে থাকি না!

অতপর ঐ লোকটি স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে লাগলো। খালিদ ইবনে ওলীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঐ লোকটার মুন্ডচ্ছেদ করে দেই! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তো বোধ হয় নামায পড়ে। খালিদ ইবনে ওলীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কতো নামাযী শুধু মুখে ইসলামের দাবী করে, যা অন্তরে নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্তর ছেদ করে ভেতর বের করে দেখার জন্য আমাকে আদেশ করা হয় নাই। অর্থাৎ বাহ্যিক ইসলামের দাবীর দ্বারা জাগতিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ হয়ে যায়। মুনাফিক দলের অবস্থা তা-ই। এই ব্যক্তিও মুনাফিক ছিলো।

লোকটি একটু দূরে সরে গেলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর হতে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তার সম্প্রদায়ে এমন দলের আবির্ভাব হবে, যারা মধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের অন্তরে কুরআনের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। তারা দ্বীন-ইসলাম হতে এইরূপ বহির্ভূত হবে, যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর শিকার ভেদ করে পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়।

মনে পড়ে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, আমি যদি ঐ দলের সময়কাল পেতাম তবে এদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করতাম। যেরূপ আল্লাহ্ তাআলা ব্যাপক আযাব নাযিল করে সামুদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।" (শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রচিত বাংলা অনুবাদ, সহীহ্ বুখারী শরীফ ৭ম খন্ড পরিশিষ্ট অধ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, অনূদিত বুখারী শরীফের ৭ম খন্ডে 'মওদুদী মতবাদ' সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায় অনুবাদক নিজ থেকে সংযুক্ত করেছেন। যেহেতু মূল বুখারীতে এ বিষয়টা নেই, তবে মওদুদী মতবাদ ও খারিজী মতবাদের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয়। বুখারীর হাদীস দ্বারা অনুবাদক এটাই প্রমাণ করেছেন।)

ইসলামের তৃতীয় মহান ব্যক্তিত্ব ও তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর শাসনকাল। অর্থাৎ হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামক এক ইহুদী সন্তান মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। সমাজের নতুন পুরাতন মুনাফিকদের একত্রিত করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে একটি ষড়যন্ত্রকারী, সন্ত্রাসী দল গঠন করে। এই দলটিই সর্ব প্রথম ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে কুৎসা, অপবাদ ও অপপ্রচার শুরু করে। অন্যদিকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর বিশেষতঃ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর প্রতি গভীর মহব্বত ও পক্ষাবলম্বনের ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। মিষ্টি মিষ্টি কথা আর ধোঁকা দিয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানকেও তাদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। ধীরে ধীরে খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর বিরুদ্ধে গোপন আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। একই সাথে তারা পূর্বসূরী খলিফা হযরত

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর বিরুদ্ধেও কুৎসা ও অপবাদ রটাতে শুরু করে। এই কারণে তৎকালীন সমাজে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় এবং 'রাফেজী ফির্কা' নামে ডাকা হতো। রাফেজী অর্থ বিশৃংখলাবাদী- আনুগত্যত্যাগী। সামাজিকভাবে এদেরকে 'রাফেজী' এবং কেউ কেউ 'খারিজী' হিসেবেও চিহ্নিত করতেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই দু'টো দলকেই 'খারিজী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু খারিজী শব্দের পারিভাষিক অর্থ আত্মপক্ষত্যাগকারী বা দলত্যাগী। তাই নামের অর্থগত দিক এবং কর্মকান্ডের দিক থেকে দু'টোই সমার্থক।

হিজরী ৩৫ সন। পবিত্র হজ্জের মৌসুম। বিশিষ্ট সাহাবীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই তখন পবিত্র মক্কা শরীফে অবস্থান করছেন। এই সুযোগে ইসলামের চিরশত্রু ও জাত ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও গাফেকী ইবনে হর্বদের অনুসারী মুনাফিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর নিজ গৃহে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের সময় কিছুসংখ্যক মুমিন তরুণও তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। খারিজীদের মিষ্টি মিষ্টি কথায় অনুপ্রাণিত হয়েই তারা খলিফার গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা মোটেও জানতেন না যে, আজন্ম সন্ত্রাসীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এখানে হত্যার ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। দেশের চিহ্নিত খারিজীদের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী মুনাফিকরা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করতে কৃতকার্য হয়।

তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মূল কারণ, অঙ্কুরে বিনষ্টকরণ নীতি। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের খিলাফতে মতানৈক্য ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করা। ধীরে ধীরে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বলাভ। পরবর্তীতে খলিফার মসনদ দখলের দূরভিসন্ধি। যেহেতু দেশের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তখন মক্কা শরীফে অবস্থান করছেন। অতএব এই সুযোগে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, সরকার পরিবর্তনের পরিবেশ তৈরী হলে, তারাও অভ্যন্তরে ঢুকতে পারবে। যে নীতিটি বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সবচে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

একটি উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ অতিসাম্প্রতিক কালের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য করা যায়। ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে পুঁজিতান্ত্রিক সামন্তবাদকে ট্যাক্কা দিয়ে রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা দেখতে লাগলেন মহাবিপদের সরষে ফুল। কারণ, কমিউনিজম ও পুঁজিতন্ত্র এক পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না। দু'টো মতাবাদের ভিতর জাত শত্রুতা বিদ্যমান। ঠিক কয়েক বৎসরের মাথায় লেগে যায় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লাভ ক্ষতি এবং কমিউনিজম ও পুঁজিতন্ত্রের ঠেলাঠেলিতে পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইতোমধ্যে একটু ভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে চীনা কমিউনিজম জন্ম নেয়। কয়েক দশকের মাথায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রমাণিত হয় কমিউনিজমের শক্তি সামর্থ্য। আরম্ভ হয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ডওয়ার। দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে

থাকে কোল্ডওয়ার বা দুই ষাড়ের হুঙ্কার তৎপরতা।

নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়ে মাঠে নামে আধুনিক গুপ্তচর বাহিনী। এখানে বর্তমান পৃথিবীর গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে একটি ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজন। গুপ্তচর বৃত্তির একটি মূলমন্ত্র বা প্রবাদস্বরূপ বাক্য আছে যে, "যার যতটুকু জানা প্রয়োজন তার শুধু ঐটুকুই জানা দরকার।" এই মূলমন্ত্রকে কেন্দ্রকরেই পৃথিবীতে গুপ্তচর সংস্থাগুলো জন্ম নিয়েছে। সরকারীভাবে তাদেরকে বিরাট অংকের সাহায্য-সহযোগিতা দান করা হয়। যেহেতু এই সকল সংস্থার কর্মীদের প্রাণের হুমকী থাকে প্রতি মিনিটে। তাই তারা মুখোশধারী বেশে কাজ করে। দেখা গেছে, রেজিষ্ট্রি অফিসের একজন সাধারণ কেরানীর চাকুরীরত ব্যক্তি দেশের গুপ্তচর বাহিনীর যুগ্ম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আবার বিমান বন্দরের একজন দারোয়ানও গুপ্তচর বাহিনীর পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রয়োজনে ধান ও ইক্ষু ক্ষেতে হাল-চাষের কাজও করতে পারে একজন গুপ্তচর বাহিনীর লোক। আবার এদের কিছু লোককে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রহরীর ভূমিকায়ও থাকতে দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব বণ্টন হয় এভাবেঃ- (পরবর্তী পৃষ্ঠায় নকশা দেখুন)

গুপ্তচরদের কাজই সরকারপক্ষীয় তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া বাদবাকি সবই গোপন রাখা। অর্থাৎ যেখানেই সরকারের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়, সেখানেই তাদের বল ও কৌশল সর্বোতভাবে প্রযোজ্য। এক কথায়, বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে ঐ একটি মাত্র সংস্থাই নিরলস প্রহরায় থাকে।

গুপ্তচর বৃত্তির গোড়ার কথা

গুপ্তচরবৃত্তি মূলতঃ শুরু হয়েছে টিকে থাকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই। প্রাচীন প্রস্তর, লৌহ ও তাম্র যুগের মানুষেরা হিংস্রপ্রাণীদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরী শিখে। বিশেষ বিশেষ কৌশলে হিংস্রপ্রাণীদের আক্রমণের ধ্যান-ধারণা, সময় ও ক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে প্রহরার ব্যবস্থা করতো। সে যুগে একদল লোক গাছের ডালে, অথবা পর্বত শৃঙ্গে অত্যন্ত গোপনে বসে থাকতো শত্রুদের গতিপথ লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে। যখনই শত্রুরা আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে মানুষের ঘর-বাড়ির দিকে অগ্রসর হতো, তখনই ঐসব লোকেরা একপ্রকার আওয়াজ দিতো, যা শোনামাত্রই সকলে সতর্ক স্থানে অবস্থান নিতো, কিংবা অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হতো। সেই যুগে এই পদ্ধতিকে বলা হতো, 'প্রিন্সিপল অব ওয়ার' বা যুদ্ধনীতি। ইতিহাসবিদ রিচার্ড ডিকন তার 'চীনা সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাস গ্রন্থ'-এ লিখেছেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম 'সিক্রেট সার্ভিস' নামক যে সংস্থাটি গঠিত হয়, তার নাম 'সান জু' বা 'পিং ফা'। উক্ত নামে একটি পুস্তকও রচিত হয়েছে। এই সংস্থাটি খৃষ্টপূর্ব ৫১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সংস্থার কর্মপদ্ধতিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিলো। ১) স্থানীয় গুপ্তচর। যারা শত্রুদেশে ভালো আচরণ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকতো। ২) আভ্যন্তরীণ গুপ্তচর। তারা শত্রুদেশের বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদেরকে 'তথ্যের সূত্র' হিসাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজ দেশের গুপ্তচর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতো। ৩) রূপান্তরিত

গুপ্তচর। এদের কাজ হচ্ছে- শত্রুদেশীয় গুপ্তচরদের ঘুষের মাধ্যমে তার নিজ সংস্থায় ভুল তথ্য পাচারে প্ররোচিত করা এবং তাদের নিজস্ব জনগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা। ৪) অনুপযুক্ত বা বাতিল গুপ্তচর। তাদের কর্মতৎপরতা হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে বন্দী হয়ে শত্রু দেশকে

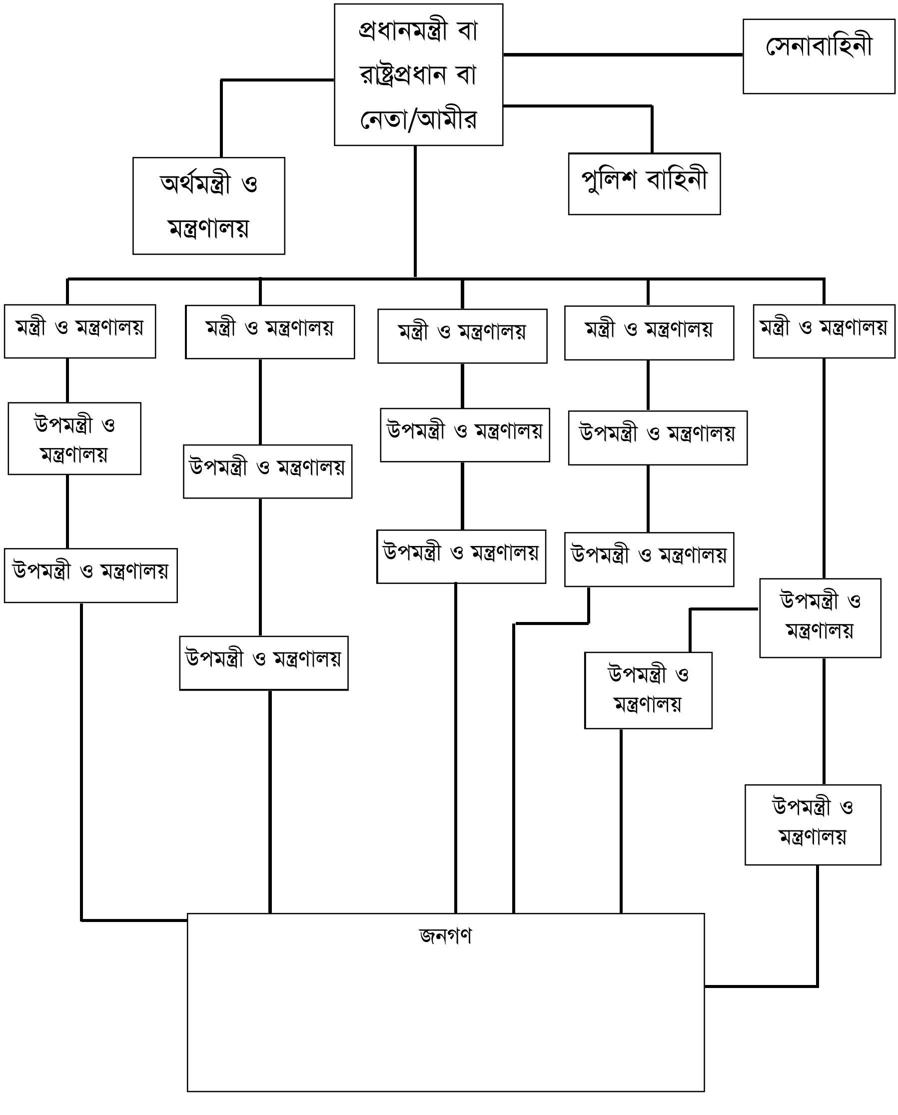

ভুল তথ্য প্রদান করা। ৫) সাধারণ গুপ্তচর। এদের কাজ হচ্ছে- সাধারণ নিয়মিত ক্যাডারভুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুপ্তচর সৃষ্টি করা।

গুপ্তচরবৃত্তির উপরোক্ত মূলমন্ত্রগুলো আধুনিক যুগেও প্রচলিত। তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির পার্থক্য ঘটেছে মাত্র। আগের যুগে শুধুমাত্র সরকার

কর্তৃক গুপ্তচর সংস্থা পরিচালিত হতো। আজকের যুগে যে কোনো বেসামরিক সংস্থাও তার নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী তৈরী করতে ও কাজে লাগাতে পারে। যেমন- প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের থাকে নিজস্ব গুপ্তচর ও ক্যাডার বাহিনী। নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলকে নিয়োগ দেন। যারা নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে শত্রুপক্ষের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুতি থেকে রক্ষা করে। একইভাবে, বিরোধী দলের গুপ্তচররাও ফাঁকফোকর খুঁজতে থাকে সরকার পতনের হাতিয়ার হিসেবে।

ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকারী শক্তি ও সরকারীভাবে পৃথক বাজেট নিয়ে তৈরী হয় সিআইএ, কেজিবি, মোশাদ, রো ইত্যাদি বড় বড় গুপ্তচর সংস্থাগুলো। সমস্ত বিশ্বে শুরু হয় বুদ্ধিভিত্তিক গুপ্তচর যুদ্ধ। যে যুদ্ধের সূত্রধরে পৃথিবীর সবগুলো দেশে দেখা দেয় অশান্তি আর থমথমে জ্বালা।

বিশ্বময় এই অস্থিতিকর পরিস্থিতিকে পুঁজিকরে হঠাৎ প্রচারিত হয় ‘বেলফোর’ ঘোষণা। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী জে, এ, বেলফোর বৃটেনের ইহুদী সংঘের সভাপতি লর্ড রথচাইল্ডের কাছে লেখা এক চিঠিতে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের নিজস্ব বাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এটি ‘বেলফোর ঘোষণা’ নামেই পরিচিত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় প্যারিস সম্মেলন। এতে প্যালেষ্টাইন শাসনের কলা-কৌশলের খসড়া তৈরী করা হয়। একই সাথে বিশ্বের সমস্ত ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে গিয়ে জড়ো হতে শুরু করে। এতে সমস্ত আরব জাহানে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। কারণ- দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর সময় থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সহস্রাধিক বছর প্যালেষ্টাইনের শাসন ক্ষমতা শুধুমাত্র মুসলমানদের হাতেই ছিলো। অবশ্য মুসলমানদের উপর খৃষ্টান ক্রুসেডের কয়েক দশক প্যালেষ্টাইনীরা পরাধীনতা ভোগ করে।

বেলফোর ঘোষণার সূত্রধরে ১৯২১, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের সাথে প্যালেষ্টাইনীদের দাঙ্গা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার বুলদান শহরে অনুষ্ঠিত আরব জাতীয় সম্মেলনে আরবরা প্যালেষ্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ‘হোয়াইট পেপার’ নীতিতে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করে। এতে ইহুদীরা বিক্ষুব্ধ হয়। তারা ‘হোয়াইট পেপার’ নীতিকে বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বলে গণ্য করে এবং সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শ্বরণাপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্র এর আগে থেকেই আরব জাহানে তার প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ খুঁজছিলো। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ মে তেলআবিব-কে রাজধানী করে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেনসহ অনেকগুলো দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। প্যালেষ্টাইনী মুসলমানদের উপর ইহুদীদের গণহত্যা চলতে থাকে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ মে-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো দিন ও রাত অতিবাহিত হয়নি যে, প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদের উপর ইহুদী গণহত্যা চলেনি। প্যালেষ্টাইন ও আরব মুসলিম হত্যায় ইহুদীদেরকে অস্ত্রবল, সৈন্যবল ও অর্থবল যোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

অন্যদিকে, রুশ ও চীনা কমিউনিজম ধ্বংস করার জন্য চলছে বিশ্বময় কোল্ডওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ। ফলে, রুশ-মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতিমূলক পরিস্থিতিতে ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে কিউবার উপর আক্রমণ চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু কিউবায় রুশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পূঁজিতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সেটা হুকমী স্বরূপ। ১৯৬১ সালে কিউবার উপর মার্কিন আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বহন করতে সক্ষম হয় নি। মারমুখি ব্যর্থতার প্রতিহিংসায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি সিআইএ গুপ্তচর কর্তৃক কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল কাস্ট্রোকে গোপনে হত্যা করার ইঙ্গিত দেন। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কমিটির রিপোর্টে সিআইএ কর্তৃক কিউবা সম্পর্কে এইসব গোপন ও প্রকাশ্য অন্তর্ঘাতমূলক তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। এমনকি ফিডেল কাস্ট্রোকে হত্যা করার অন্তত ডজনখানেক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেও রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।

একই সাথে চীনা কমিউনিষ্ট ধ্বংস করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভিয়েতনাম আক্রমণ করা হয়। তিন দিনের মাথায় কিউবার যুদ্ধ শেষ হলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ দীর্ঘ ত্রিশ বছর চলতে থাকে। অন্তত দশ লক্ষাধিক মার্কিন সৈন্যের লাশ ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আমেরিকা ঘরে ফিরে। ওদিকে, ভিয়েতনামে ফেলে আসে পৌনে কোটির মতো সাধারণ মানুষের লাশ। প্রায় তিন শতাব্দির বর্বর মার্কিন সৈন্যের আক্রমণে ভিয়েতনামে জন্ম নেয় লক্ষাধিক জারজ সন্তান। মার্কিনী বর্বরতার ইতিহাস রচিত হয় নিরীহ ভিয়েতনামী মহিলাদের রক্ত ও ইজ্জত দিয়ে।

অথচ গুপ্তচরবৃত্তির অপকৌশলে বর্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিজিত হিসেবেই মূল্যায়ণ করা হয়। এই যুদ্ধের পর্যুদস্ত পরিণতিকে দেশবাসীর কাছে ঢাকা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মিডিয়া অপপ্রচার ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতার অন্তরালে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় মিডিয়াকে।

আধুনিক মিডিয়ার অভিনব কারিগরী প্রত্যক্ষ করে রাশিয়ার শ্বেতভল্লুকরা আক্রমণ চালায় আফগানিস্তানের উপর। দেশের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে পূঁজি করে তারা সেখানে সমাজতন্ত্র নামক নাপাকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর ভোর রাতে রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ। ভিয়েতনামের চেয়ে অধিক জঘন্য বর্বরতা সৃষ্টি করে ঐসব রুশ শ্বেতভল্লুকেরা। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর চলতে থাকে রুশ-আফগান যুদ্ধ। ওদিকে মার্কিনীরা রাশিয়া ও চীনকে দেখাতে চেয়েছিলো যে, 'তোরা যেখানে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে যাবি, আমরা সেখানে ক্লাষ্টার বোমা দিয়ে বিরাণভূমি (ভিয়েতনাম) সৃষ্টি করবো।' কমিউনিস্ট নামক নাপাকতন্ত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, 'আমরা নিজের দেশে যেভাবে জোর করে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছি। ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত দুনিয়াকে সমাজতন্ত্রী বানিয়ে ছাড়বো।' উদাহরণস্বরূপ, কাবুল শহরের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাহিদ। তার পিতা রাশিয়ার দালাল। একজন সুস্পষ্ট মুরতাদ। মুনাফিকরা কি-ই-না করতে পারে এই ঘটনাই তার প্রমাণ। নাহিদের পিতার নাম ফরিদ খান। কাবুল কমিউনিস্ট পার্টির একজন ঊঁচু ধরের পান্ডা। তার বাসায় একদিন রুশ বাহিনীর সৈন্যরা দাওয়াত খেতে এসে কিশোরী নাহিদকে

দেখতে পায়। নাহিদের প্রতি ঘৃণ্য দৃষ্টি পড়তেই একজন অফিসার নাহিদকে ক্লাবে পাঠাতে নির্দেশ দেয়। ফলে- নাহিদের পিতা ফরিদ খান আপন মেয়েকে শ্বেত ভল্লুকদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা চালায়। কিশোরী নাহিদের মরণপণ অসম্মতির পরও মুরতাদ পিতা আপন মেয়েটিকে জোরপূর্বক ভল্লুকদের নাইটক্লাবে ভর্তি করে। (নাহিদের সাথে রুশ হায়েনারা কি ব্যবহার করেছিলো এবং কিভাবে নাহিদ শহীদ হলো- বাকি ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করতে নিজ হাতে অবশতা অনুভব করছি। পাঠকমহল মাফ করবেন। 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' পৃষ্ঠা ৩৩-৪০)

দীর্ঘ এক দশকেরও অধিককাল ধরে রুশ শ্বেত ভল্লুকরা আফগানিস্তানে গণহত্যা চালায়। তাদের হায়েনারূপী আচরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকগণ বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বহুল প্রচারিত পশ্চিমা মিডিয়ায় এসব সত্য সংবাদ প্রচারিত হয় না। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রিল আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

অথচ মিডিয়ায় দেখানো হয় ভিন্ন চিত্র। রুশ কেজিবি'র গুপ্তচররাও আর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। পূঁজিতান্ত্রিক ইউরো-মার্কিন জোট বিশ্ব-মিডিয়াকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ৭০ বছরের কমিউনিজম ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করতে সক্ষম হয়।

একই সময় পূঁজিবাদের শত্রু হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ইসলাম। আফগানিস্তানের তালিবান খিলাফত। বিশ্ব পূঁজিপতিদের চোখ পড়ে আফগানিস্তানের প্রতি। ইসলাম যদিও গণতন্ত্রের মুখ্য শত্রু নয়, তবে ইহুদীদের জাত শত্রুতাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তালিবানী হুকুমত ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ইহুদীরা পূঁজিবাদী দেশগুলোকে একথা বলে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, "কমিউনিজম ধ্বংস হয়েছে কিন্তু ইসলাম একবার স্থায়িত্ব পেলে সবাইকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" এই মন্ত্রকে কানে নিয়ে সর্বপ্রথম বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ঘোষণা দিয়েছিলেন, "অনেক কষ্টের বিনিময়ে ইউরোপ থেকে লাল পতাকা নামানো হয়েছে, কিন্তু সবুজ পতাকা কখনো উড়তে দেয়া হবে না।"

এদিকে ইসলামের পতাকাবাহী ঘ্রাণ যেহেতু আফগানিস্তানে উড়তে শুরু করেছে। সুতরাং ইউরোপ আমেরিকায় যে এর হাওয়া লাগবে না তা বলা যায় না। তাই ইসরাইল থেকেই প্রথম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। একটি শাসন ব্যবস্থাকে চিরতরে ধ্বংস করতে হলে পরিকল্পনামূলক পরিস্থিতি ও যুদ্ধাবস্থা প্রয়োজন। পূঁজিতান্ত্রিক দেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ মিলে একটি প্ল্যান তৈরী করেন। যে পরিকল্পনার প্রথম আঘাতে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল এবং আমেরিকার পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ (বা গাল্‌ফ যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। কিন্তু আফগানিস্তানকে জড়ানোর পরিবেশ সৃষ্টি হলো না। ফলে, পারস্য সাগরে অবস্থানকারী মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে রকেট আক্রমণ। ওক্লোহামা নগরীতে দালান বিধ্বংসী বোমা হামলা। সাউথ আফ্রিকার ক্যাপটাউন সিটিতে অনুষ্ঠিত আনন্দ মেলায় বোমা হামলা ইত্যাদি ঘটানো হয়। কিন্তু এসব সুপরিকল্পিত ঘটনাগুলো ঘটিয়েও আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করার প্লট বা উপলক্ষ তৈরী হলো না। শেষ পর্যন্ত ২০০১ খৃষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করা হয় এবং উসামা বিন লাদিনকে দোষী সাব্যস্ত করে আফগানিস্তানে বর্ষিত হয় লক্ষ লক্ষ ক্লাষ্টার বোমা।

অন্যদিকে- মিডিয়ার আধুনিক কৌশল অবলম্বন করে সমস্ত বিশ্বকে দেখানো হয় ভিন্ন চিত্র। এখনো বিশ্বের অধিকাংশ লোক মনে করে যে, উসামা বিন লাদিন ও তালিবান তরুণরা মূলত দোষী! কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামের খিলাফত ধ্বংস করণ- সেকথা এখনো অনেকে বুঝতে চেষ্টা করেন না। দীর্ঘমেয়াদী এই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফসল যে ইসলামকে সন্ত্রাসী জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করণ- সে কথা অনেক ইসলামপন্থীরাই মানতে রাজী নন।

পরবর্তীতে ইরাকী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করার পিছনেও সেই একই কারণ। ইরাক সম্পর্কে বিশ্বজনমত প্রতিষ্ঠা করতেও মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছে হাতিয়ার হিসেবে।

নিরপেক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি পৃথিবীর এই ইহুদীবাদী (জায়োনিষ্ট) তৎপরতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করতে ইহুদীদের আজন্ম পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। যা হোক, মূল ঘটনায় ফিরে যাই।

মূল ঘটনা

খলিফা হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত আরব ভূখন্ডে। ইতোমধ্যে নতুন খলিফা নির্বাচন নিয়ে খারিজীরা নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। খলিফা হত্যার বিচার আগে হবে, না নতুন খলিফা নির্বাচন আগে সম্পন্ন হবে, এনিয়ে জনগণের মাঝে ভাগাভাগি সৃষ্টি করে দেয়। কারণ- তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো মুসলিমদের দুটি দলে বিভক্ত করা। মুসলিমরা বিভক্ত না হলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

পরবর্তীতে খারিজীরা যখন অনুধাবন করতে পারে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নতুন খলিফা হচ্ছেন, তখন তাদের একটি অংশ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর আশে-পাশে ঘুরতে থাকে। অত্যন্ত আপনজনের মতো তোষামোদী তৎপরতা চালায়।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এদেরকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি পুরোটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, খারিজীরাই খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছে। তাদের ছদ্মবেশী ঘন ঘন আনাগোনা, ধূর্ততাপূর্ণ কথাবার্তা ও সমস্ত দেশজুড়ে একটা অরাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি। এবং পবিত্র মদীনা নগরীতে বিশৃংখলাময় পরিস্থিতি লক্ষ্যকরে এটা পরিষ্কার হচ্ছিল যে, এদের শক্তি মোটেও কম নয়। তারা মুসলিমদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। চাইলে তারা খিলাফতের ইমারতকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই তিনি ইসলাম ও খিলাফতের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে প্রথমে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচন এবং পরে খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর হত্যাকারীদের সমোচিত শাস্তিদানের পরিকল্পনা নিয়ে ছিলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর উক্ত পরিকল্পনার সাথে যে সকল সাহাবী ও মুমিনগণ ছিলেন, তাদেরও একই অভিমত ছিলো। আগে নতুন খলিফা নির্বাচন, তাঁর সমর্থনে পূর্ণ শক্তি এবং সহযোগিতা দান করা হোক, যাতে তিনি সন্ত্রাসীদের সমোচিত বিচার করতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত

তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁদের দলের অভিমত ছিলো- খলিফা নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসীদের বিচার হোক। তাঁদের দৃষ্টিতে- হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তো সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত হবেনই। এতে খারিজী সন্ত্রাসীরা যেভাবে ভাবী খলিফা ও মুসলিমদের আশেপাশে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা যদি সরকারী বড় বড় পদ লাভ করে, তবে তৃতীয় খলিফা হত্যার বিচারকার্য কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া- অসৎ এই লোকগুলোর কারণে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজ গৃহে শহীদ হয়েছেন। বিশেষ বিশেষ সাহাবী তখনও মক্কা শরীফে অবস্থান করছেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে খলিফার দায়িত্বভার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে দান করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। অতএব তিনি যদি আগে ষড়যন্ত্রকারী, সন্ত্রাসী, কুচক্রী ও খলিফা হত্যাকারীদের বিচার না করেন এবং তারা সরকারী দায়িত্ব পেয়ে বসে- তাহলে হয়তো তারা স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেই হত্যা করবে। সুতরাং আগে খলিফা হত্যাকারীদের বিচার হোক।

এই মতদ্বৈধতা ও খারিজীদের দলভূক্ত চিরষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের ছদ্মবেশী কুমন্ত্রণার ফলে সিফ্ফীনের যুদ্ধ, পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পক্ষ এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে ছিলেন। এমন সময় হযরত আমর ইবনুল আ'ছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতায় দু'দলের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত দুঃকৃতিকারী খারিজীরা দু'টো দলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো এবং তলে তলে আপোষ মীমাংসা না হবার জন্য ইন্ধন যোগিয়ে যাচ্ছিল।

ষড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রচার ও অব্যাহত কুমন্ত্রণার ফলে সিফ্ফিন যুদ্ধ বা জামাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধরত মুমিনগণ অস্ত্র ধরে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সাহাবীগণের হত্যাকান্ড কেবল ছদ্মবেশী কাফিররাই চালিয়ে ছিলো। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রায় দশ হাজার সাহাবী শহীদ হন।

সাহাবায়ে কেরামের রক্তে রঞ্জিত মুনাফিকদের হাত তবু নিষ্ক্রীয় নয়। তাদের ষড়যন্ত্রকারী তৃষ্ঞা তবু মিটে নি। কুমন্ত্রণা, চক্রান্ত, প্ররোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে শক্রুদের চিনতে পেরেছিলেন, তেমনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও তাদেরকে চিনতে পেরেছিলেন। শক্রুরাও বিষয়টি টের পেয়ে যায়। তাই খারিজীদের একটি অংশ অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে 'নবী' হিসেবে মর্যাদা দিতে শুরু করে।

আর তখনই তিনি তাদের ৭০ জনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন এবং মৃত্যুদন্ড দিয়ে লাশগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত আক্রোশী তৎপরতা চালায়। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তারা একসঙ্গে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। খারিজীদের এই অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বেঁচে গেলেও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তারা শহীদ করতে সক্ষম হয়।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত হাসান

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফতের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। তিনি খলিফার মসনদে বসেই নিজের দায়িত্বভার হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অর্পন করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের একটাই কারণ ছিলো, সাহাবায়ে কেরামের মতদ্বৈধতার অবসান এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র ভেতর থেকে খারিজী শত্রুতাকে চিরতরে নিশ্চিহ্নকরণ। (মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রচিত 'ভুল সংশোধন')

এই পরিস্থিতিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় সর্বস্তরের সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হৃদ্যতা ও সহিষ্ণুতা ও ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মস্পৃহা ফিরে আসে। একসাথে সবাই শত্রু নিশ্চিহ্ন করণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাত্র ৫-৬ বছরের মধ্যে সমস্ত খিলাফত-ভূখন্ডে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসে।

দেশের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ধরে ধরে শাস্তি ও মৃত্যুদন্ড দিলেও মুনাফিকী তৎপরতা সমূলে নিঃশেষ হয় নি। বাহ্যিক নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত আদায়কারী কুচক্রীদের অন্তরে ষড়যন্ত্রের আগুন জ্বলতেই থাকে। (মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রচিত 'ভুল সংশোধন')

অল্পদিনের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তনয় ইয়াযিদ কে তারা তাদের দলভূক্ত করে নেয়। ইয়াযিদও প্রকৃত মুমিন সেজে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর মন জয় করতে সক্ষমতা লাভ করে। সমস্ত খিলাফতী-ভূখন্ডে ইয়াযিদের মতো একজন আমলদার, বিচক্ষণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর চোখে পড়ে নি। ইয়াযিদ কে খিলাফতের দায়িত্বভার দান করার জন্য যাচাই-বাছাই ও ঘনিষ্ট সাহাবীদের সাথে যুক্তি পরামর্শ করেন। পর পর তিনটি জুমু'আর খুতবায় বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দেন। তারপর তিনি মনোনয়ন দেন অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় সমর্থন। যেহেতু খলিফা মনোনয়নের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণসহ সুস্পষ্ট মাসআলা নির্ধারিত রয়েছে। অতএব ইতিহাস গবেষকদের মতে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর মনোনয়ন সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সঠিক ছিলো। উক্ত বিষয়টি নিয়ে আজকে যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের গবেষণায় খারিজী তথ্যের দুর্গন্ধ থাকা স্বাভাবিক। (ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মূলঃ মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী, বাংলা অনুবাদঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ্)

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখনই দেখা দেয় নতুন খলিফা নির্বাচনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত পর্ব। একমাত্র দামেষ্কবাসী ছাড়া সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গই ইয়াযিদকে খলিফার দায়িত্ব দিতে রাজী নন। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অনেকেই ইয়াযিদকে খলিফার অযোগ্য মনে করতেন। তা ছাড়া ইয়াযিদের সাথে খারিজীদের একটা গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলেও অনেকে সন্দেহপোষণ করতেন।

এদিকে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথম থেকেই ইয়াযিদকে খেলাফতের অযোগ্য মনে করতেন এবং এটা ছিলো দ্বীন ও ঈমানের আলোকে তাঁর স্বার্থমুক্ত ও আন্তরিক সিদ্ধান্ত। এ সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরসহ হিজাযের (বর্তমান রিয়াদ) প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইয়াযিদের খিলাফত স্বীকার করছেন না।

অন্যদিকে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর কাছে ইরাক থেকে আসা আমন্ত্রণ লিপির

স্তূপ এ কথাই প্রমাণ করছিলো যে, ইরাকও ইয়াযিদের খিলাফত মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অতএব সময় ও সুযোগ থাকতে দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের স্বার্থে একটা কিছু করা ফরয। ইয়াযিদের নিছক শক্তি ও অস্ত্রবলে গোটা ইসলামী জাহানে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তারকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই তিনি কুফার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, কুফাবাসীর অধিকাংশই ইয়াযিদের দলভূক্ত এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফন্দি করছে। ফোরাত নদীর তীরে অবস্থানকালে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরিস্থিতির আলোকে তিন দফা দাবী করেছিলেন।

একঃ "আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে ফিরে যেতে দাও।" দুইঃ "আমি স্বয়ং ইয়াযিদের হাতে হাত রেখে বাইআত করতে চাই।" তিনঃ "কোন মুসলিম বসতির সীমানায় আমাকে পাঠিয়ে দাও। তাদের যে পরিণতি হবে আমারও তাই হবে।" (সূত্রঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ)- মুফতী তকী উসামনী) কিন্তু ইয়াযিদ বাহিনীর খারিজী চিন্তাধারার পাষন্ড শিমারের কুমন্ত্রণায় ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের হুকুম দেয়। কিন্তু ইসলামের শরীয়তকে নিঃশর্ত বিক্রি করা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অস্ত্র হাতে নেন।

জোরপূর্বক ইয়াযিদের খিলাফত দখল এবং হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর শাহাদত ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, সমস্ত হিজাজে খারিজীদের অপপ্রচার দারুণভাবে ফলপ্রসু হয়েছিলো। প্রমাণস্বরূপ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, "হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৈধ খলিফা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার লক্ষ্যে কুফাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।" যদিও এ দাবীগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট।

কারবালার করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সমস্ত বিশ্বমানবতায় একপ্রকার হাহাকার ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। হিজাজের ঘরে ঘরে কান্না আর মনোকষ্টের গ্লানি নিয়ে মানুষ নিজের বিবেকের প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছিলো। এই সুযোগে খারিজী অপপ্রচারকারীরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তারা দেখেছে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেবল ইসলামের সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্যই শহীদ হয়েছেন এবং তৎকালীন জনসমর্থনও সেই দিকে। তাই তারা বক্তব্য পরিবর্তন করে হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর মায়াকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ইয়াযিদের পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে খারিজীদের একটি দল এই নতুন ষড়যন্ত্র চালায়। হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর শহীদ হওয়াকে প্রকৃত ইসলামের মূল্যায়ন দিয়ে ভিতরে ভিতরে খারিজী মতবাদের প্রচার শুরু করে। ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতা, লেখালেখি, গবেষণা ইত্যাদিতে কেবল হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অতিভক্তি দেখাতে লাগে। বাদবাকী অন্যান্য সকল স্তরের সাহাবায়ে কেরামকে তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত নন বলে দোষী সাব্যস্ত করতে থাকে।

ওদিকে ইয়াযিদের চারিধারে অবস্থানরত খারিজীরা খেলাফতের বৈধতা নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। ইয়াযিদের বৈধ খেলাফতির উপর চ্যালেঞ্জ করে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী আখ্যা দানের মাধ্যমে অপপ্রচার চালায়। ফলে সমস্ত হিজায তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একপ্রকার এলোমেলো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কোন্‌টা সহীহ্ আর কোন্‌টা ভুল এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে

সকলেই বিব্রত। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না কেউই। সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রতিদিন বিভিন্ন দিক থেকে ব্যতিক্রমধর্মী খবর আসতো। কেউ খবর আনতো এক রকম, তো অন্যজন দিতো ভিন্ন সংবাদ। কোন্ সংবাদদাতা খারিজীদের দলভূক্ত হয়েছে, সেটা ঠাহর করতে বড়ই কষ্টকর পরিস্থিতি দেখা দেয়।

ঠিক ঐ সময় ইহুদীপন্থী খারিজীরা একটি প্রবাদবাক্যের জন্ম দেয় যে, "ইসলামের গোড়ায় গলদ।" এই প্রবাদের উপর ভিত্তি করে তারা ইসলামের ভিন্ন ইতিহাস প্রচার করতে শুরু করে। যে ইতিহাসের সূত্রধরে খারিজীদের মাঝেও শেষ পর্যন্ত দল ও মতের বিভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্ তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এই তিহাত্তর দলের মাঝে মাত্র একটি হবে প্রকৃত সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ জান্নাতী। বাদবাকী বাহাত্তরটি দলই জাহান্নামী হবে।

তৎকালিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে মুসলমানদের মাঝে প্রধান ১০টি দল হচ্ছে- ১) আহলুস্ সুন্নাহ্, বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ২) খারিজী বা দলত্যাগী, ৩) মু'তাযিলাহ্, ৪) মুরজিয়াহ্, ৫) শী'আ, ৬) জাহমিয়া, ৭) নাজ্জারিয়াহ্, ৮) যারারিয়াহ্, ৯) কালবিয়াহ্, ১০) মুশতাবাহ্।

পরবর্তীতে হাদীস বিষয়ক ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় একমাত্র 'আহলুস্ সুন্নাহ্' দল ছাড়া বাদবাকী সবগুলো দলই মূলত 'খারিজী' অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামক ব্যক্তিটির আদর্শ থেকে উৎপত্তি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা, সাবায়ী বা খারিজীরাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলো। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার মধ্যদিয়েই তারা নতুন দল বা ফির্কার জন্ম দেয়। এই দলটিই স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। কালের বিবর্তনে ঐ খারিজীদের একটি অংশই শিআ নামে উদ্ভাষিত হয়। পরবর্তীতে এই খারিজীদের একটি দলের নাম হচ্ছে 'নাজদাত'। এদের বিশ্বাস বা আক্বিদাহ্ হচ্ছে, "ইমাম ও মাযহাবের কোনো প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ্র কুরআনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।"

নাজদাত ধারার আহলে হাদীস

'আহলে হাদীস' দলটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষার আহলে হাদীস। দ্বিতীয়টি বর্তমান যুগের মডারেট আহলে হাদীস। ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরিভাষায় যারা 'আহলে হাদীস' ছিলেন, তারা- হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীসের শিক্ষক এবং হাদীস নিয়ে এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতেন। এদেঁর অধিকাংশই ছিলেন- তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈ। উদাহরণস্বরূপ আরবী ভাষায় পান্ডিত্যের অধিকারীদের বলা হতো- আহলে আরব। শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল এবং শরীয়ত বিশ্লেষকদের বলা হতো- আহলে ফিক্বাহ্। কুরআনের তাফসীর বিশারদগণকে বলা হতো- আহলে তাফসীর। ঠিক একই ভাবে হাদীস বিশারদদের বলা হতো- আহলে হাদীস। যেমন ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস গবেষণার একস্থানে

আবু ইবরাহীম আনসারী মাদানী সম্পর্কে লিখেন, "আহ্‌লে হাদীসের মতে সে সবল বর্ণনাকারী নয়।" (তিরমিযী, ২/৪২পৃষ্ঠা) একই ভাবে অপর এক বর্ণনাকারী সম্পর্কেও লিখেছেন, "তাঁর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে কোন কোন 'আহলে হাদীস' সন্দেহ পোষণ করেন।" (তিরমিযী, ২/৪২পৃষ্ঠা)

একইভাবে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নবভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও বুখারী শরীফের ভাষ্যকারগণও 'আহলে হাদীস' এবং 'আসহাবুল হাদীস' মূলতঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মোদ্দাকথা 'আহলে হাদীস' বলতে প্রথম যুগে হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীস বিশারদদের বুঝানো হতো। সে যুগে 'আহলে হাদীস' নামে কোনো পৃথক দল বা গোষ্ঠি ছিলো না। তবে 'সাবাঈ' খারিজীদের পরবর্তী যুগের একটি দলের নাম হচ্ছে 'নাজদাত'। এদের বিশ্বাস বা আক্বিদাহ্ হচ্ছে, "ইমাম ও মাযহাবের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কুরআনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।" এই দলটি প্রকৃতপক্ষে ফিক্বাহ্'র যুগ বা ইমামদের যুগে জন্ম নিয়েছে। তাদের চিন্তা-গবেষণা ও কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে 'নাজদাত' ফিরকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। (গুনিয়াতুত ত্বালিবীন)

দ্বিতীয় ধারা বা বর্তমান 'আহলে হাদীস' দলটি সুদূর অতীতের 'সাবাঈ' ফিরকার উপদল 'নাজদাত' কি না, ইতিহাসে তা সুস্পষ্ট নয়। তবে অতীতের 'নাজদাত' ও বর্তমান 'আহলে হাদীস' ফিরকা অনেকাংশে অভিন্ন। এমনকি মওদুদী মতবাদের সাথেও তাদের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানের 'আহলে হাদীস' দলটির জন্ম ভারত উপমহাদেশে। মোঘল সাম্রাজ্য পতনের মধ্যদিয়ে উপমহাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পতিত হয় পরাধীনতার অকল্পনীয় জ্বালা। ঘরে ঘরে দেখা দেয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন এক বিশৃংখলাময় ভয়াবহ পরিস্থিতি। নেতা ও নেতৃত্বহীন মানুষের মাঝে আশা-নিরাশার এক ছত্রভঙ্গ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি দেশটিকে 'দারুল হর্‌ব' ফতোয়া দিয়ে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। দেশ ও জাতি ঝাপিয়ে পড়ে ধর্মযুদ্ধ বা আজাদী জিহাদে। খন্ড খন্ড যুদ্ধ চলতে থাকে প্রায় শত বছর ব্যাপী। এই যুদ্ধের প্রথম ধাপের সমাপ্তি ঘটে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, বালাকুটের সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এঁর শাহাদতের মধ্যদিয়ে। (ইসলামী আক্বীদা ও ফিরাক্বে বাতিলা)

উপমহাদেশীয় জনগণ আবার নেতা ও নেতৃত্বহীন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। ঐ সময় ইংরেজদের ডিভাইড এন্ড রোল পলিসির মাধ্যমে মুসলমান সমাজে নতুন নতুন ফিতনা জন্ম নেয়। যেমন কাদিয়ানী ফিতনা, পারভেযী ফিতনা, রেজাখানী বা রেজভী ফিতনা ও আহলে হাদীস ফিতনা ইত্যাদি। মৌলভী আব্দুল হক ব্যানার্জী বা বানারসী নামক একজন আলিম এই 'আহলে হাদীস' ফিতনার জনক। তিনি সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জিহাদী দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে মুজাহিদদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতেন। এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "মুসলমানদের জন্য মাযহাবের অনুসারী হওয়া জরুরী নয়।" এই বক্তব্য শোনামাত্রই

আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে উপদেশ দেন। কিন্ত এতে ফল হয়নি। পরে তিনি তাকে দল থেকে বহিঃষ্কার করেন। (ইনসাফের নিক্তিতে মিলাদ কিয়াম ও মুনাজাত)

জিহাদী দল থেকে বহিঃষ্কৃত মৌলভী ব্যানার্জী কখনো- মুহাম্মদী, তাওহীদবাদী, আবার কখনো একত্ববাদী বলে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করেন। এ সাথে মাযহাবপন্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন। নতুন দল গঠনেরও চেষ্টা চালাতে থাকেন।

বালাকুট জিহাদের পরের বছর সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অনুসারীগণ তার অপপ্রচারে অতিষ্ট হয়ে হারামাইনে ফতোয়া তলব করেন। হারামাইন শরীফাইনে অবস্থিত চার মাযহাবের মুফতিগণ একবাক্যে মৌলভী ব্যানার্জীর কর্মকান্ডকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টকারী আখ্যা দেন। ফলে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মৌলভী আব্দুল হক ব্যানার্জী ইরানী বংশধারার লোক। ভারতে অবস্থান নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যানার্জী বা বানারসী হিসেবে পরিচিত করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মৌলভী ব্যানার্জীর শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বেটালভী (কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তার নাম শায়খ সাইয়্যেদ নাজির হুসাইন) বৃটিশ সরকারের আজ্ঞাবহ নিযুক্ত হন। এই সুযোগে তিনি 'আহলে হাদীস' দলটিকে রাজনীতিমুক্ত ইসলামী সংগঠন হিসেবে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেন। তখন থেকেই তাদের কর্মতৎপরতা বাহ্যিকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে শুরু করে। এদের সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ শাহ শাহজাহানপুরী লেখেন, "আগে এ ধরণের ধ্যান-ধারণার অধিকারী স্বল্প সংখ্যকের উপস্থিতি কোথাও কোথাও দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানের ন্যায় এতো ব্যাপক ছিলো না। ইদানিং কিছু দিনের মধ্যে তাদের নাম বেশ শোনা যাচ্ছে। তারা যদিও নিজেদেরকে আহলে হাদীস, মুহাম্মদী বা মুওয়াহহিদীন বলে প্রচার করে থাকে, কিন্তু আসলে হক্বের অনুসারীগণ তাদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, ওয়াহ্হাবী বলেই অভিহিত করে থাকেন। (আল ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ **১৩**-পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত 'আহলে হাদীস' ফিরকার অনুসারীদের আকিদা সম্পর্কে যথেষ্ট লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম এদের আক্বিদা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। অধিকাংশ হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আহলে হাদীসপন্থীরা যখন কোনো বিষয়ের সমাধান খুঁজে পান না, তখন ফিকাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ করেন। অথচ তারা নিজেকে লা-মাযহাবী বলেন।

যেমন মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী রচিত মাসআলার গ্রন্থ 'আসান ফেকাহ'। গ্রন্থকার নিজে কোন্ মাযহাবের অনুসারী, সেটা উল্লেখ নয়। গ্রন্থখানি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন আব্বাস আলী খান। পুস্তকখানির মুখবন্ধে প্রকাশক লিখেছেন, "উপমহাদেশে সব মতের অনুসারীই রয়েছে। কিন্তু হানাফী মতের অনুসারীদের সংখ্যাই অধিক বিধায় মতপার্থক্য এড়িয়ে শুধুমাত্র হানাফী মতের উপর ভিত্তি করেই এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।" অথচ গ্রন্থখানির অনেক স্থানে হানাফী মাসআলা পেশ করার পর, আহলে হাদীসপন্থীদের নিজস্ব মাসাআলা টীকা অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে সকল মাসআলা সহজ এবং সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাধে, সে সব বিষয়ে

টীকা দিয়ে তাদের নিজস্ব মত উল্লেখ করেছেন। অনেকাংশে দেখা গেছে, কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিছু কিছু মাসআলাকে তারা ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছেন। যেমন সফরে বা মুসাফির অবস্থায় কসর নামায সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট মাসআলা রয়েছে। এ মাসআলায় তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্যও চোখে পড়ে না। অথচ মাসআলার নিচে টীকা অধ্যায়ে মাওলানা মওদুদী সাহেবের একটি দীর্ঘ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি বলেন, "খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, শরীয়তের ব্যাপারে সে ব্যক্তির মনের ফতোয়াই নির্ভরযোগ্য যে শরীয়ত মেনে চলার ইচ্ছা করে, বাহানা খুঁজে বেড়ায় না- (রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড পৃঃ ১৬৭ এবং আসান ফিকাহ্ ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ এই বক্তব্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, কেউ যদি তার অপর্যাপ্ত বিদ্যা-বুদ্ধি এবং মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে কুরআন-হাদীস থেকে নতুন শরীয়তের জন্ম দেয় তাহলে সেটাই শরীয়ত (?)।

উপরের ঐ বন্ধনীযুক্ত প্রশ্নবোধককে কেন্দ্রকরে আরেকটি মাসাআলার দিকে লক্ষ্য করা যায়। 'আসান ফিকাহ্' গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি মাসআলা হচ্ছে, "যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য- 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এ হচ্ছে ওসব লোক যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে তাদেরকে হাত করা, তাদের বিরোধিতা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। এসব লোক কাফেরও হতে পারে এবং ওসব মুসলমানও হতে পারে, যাদের ইসলাম তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট নয়। এসব লোক সাহেবে নেসাব হলেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

হানাফীদের অভিমত এই যে, ইসলামের সূচনায় এ ধরনের লোকের মন জয় করার জন্যে যাকাত থেকে খরচ করা হতো। কিন্তু হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর যমানায় এ ধরনের লোককে যাকাত দিতে অস্বীকার করেন এবং এ ব্যবস্থা চিরদিনের জন্যে রহিত হয়ে যায়। এ অভিমত ইমাম মালেকও পোষণ করেন। অবশ্যি কোন কোন ফকীহর মতে এ খাত এখনো বাকী রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুসারে মন জয় করার জন্যে যাকাতের মাল ব্যয় করা যেতে পারে।"

উপরোক্ত মাসআলার টীকা অংশে মাওলানা মওদুদী সাহেবের একটি উক্তি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর মাসআলায় "অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে মাওলানা মওদুদী বলেন, আমাদের নিকটে সঠিক এটাই যে, 'মুয়াল্লেফাতু কুলুব'-এর অংশ কেয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। নিঃসন্দেহে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু যা কিছু বলেছিলেন তা ঠিক ছিল। যদি ইসলামী রাষ্ট্র মন জয় করার জন্যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ না করে, তাহলে কেউ তার ওপরে এটা ফরয করে দেয়নি যে, এ খাতে অবশ্যই কিছু না কিছু খরচ করতে হবে। কিন্তু কোন সময়ে যদি তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্যে অবকাশ রেখেছেন, তা বাকী থাকা উচিত। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ের ওপর ইজমা হয়েছিল তা এই যে, সে সময়ে যে অবস্থা ছিল তখন মন জয় করার জন্যে কাউকে কিছু দেয়া তারা জরুরী মনে করেননি। তার থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন কারণ নেই যে,

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ঐ খাতকে কেয়ামত পর্যন্ত রহিত করে দিয়েছে, যা কুরআনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাঞ্ছনীয়তার জন্যে রাখা হয়েছিল (তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড-পৃষ্ঠা-২০৭)

ফতোয়ার জবাব

উপরোল্লিখিত 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর মাসআলা সম্পর্কে জনাব মওদুদী সাহেবের অভিমতে তিনটি জিনিস পরিলক্ষিত হয়। এক) হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুএঁর অটল সিদ্ধান্তের সামনে পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াতকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করানো, নতুন যুক্তিতর্কের অবতারণা। দুই) সাহাবায়ে কেরাম ও মাযহাবের ইমামগণের যুগকে বর্তমান যুগের সাথে অসঙ্গতি দেখানোর সুস্পষ্ট এবং প্রাণবন্ত যুক্তি। তিন) অত্যন্ত সুকৌশলে বর্তমান দলীয় তৎপরতায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা খাতে অনুদান সংগ্রহের একটি পন্থা আবিষ্কার।

প্রথমতঃ তাফসীর ইবনে কাসীরের একটি বর্ণনা হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো- "সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে বলেন, 'মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গীগণকে হত্যা করে থাকেন এ চর্চা হওয়াটা আমি আদৌ পছন্দ করি না।' ভাবার্থ এই যে, কপটদেরকে তাদের অন্তরের কুফরীর জন্যে যে হত্যা করা হয়েছে, আশে পাশের মরুচারী বেদুঈনদের এটা জানা থাকবে না। তাদের দৃষ্টি তো শুধু বাহ্যিকের উপরই থাকবে। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে এ সংবাদ প্রচারিত হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গীগণকে হত্যা করেছেন, তখন তারা হয়তো ভয়ে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।"

কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাদের আলিমদেরও এটাই মত।' ঠিক এরূপভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'কে (অর্থাৎ যাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হতো) মাল-ধন দান করতেন, যদিও তিনি তাদের খারাপ আকীদা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুনাফিকদের হত্যা না করার কারণ এটাই বর্ণনা করেছেন।"

উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে মুনাফিক ও মুনাফিকদের হত্যার বিধান সম্পর্কে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা থেকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর যে বিধানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে- সে যুগে একশ্রেণীর লোক সর্বদাই বুদ্ধি-বিবেচনায় ছিলো স্থুল। তাছাড়া তারা ছিলো সাধারণ মরুচারী লোক। তাদের মাঝে আত্মিক দর্শন বা জ্ঞান-প্রজ্ঞা তো ছিলোই না বরং কপটদের ধোঁকায় পড়ে মিথ্যাকেও সত্য বলে মনে করতো। অন্যদিকে- তারা ছিলো দিনমজুর গরীব জনসম্প্রদায়। সুতরাং এই লোকগুলোকে কিছু মাল-ধন (মুআল্লাফাতুল কুলূব) দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন, তা সে সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য ছিলো। একইভাবে- ইসলাম ছিলো তখন সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হতো।

তাছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসকল লোকগুলোর খারাপ আকীদা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। একইভাবে মুনাফিকের চরিত্র সম্পর্কে তিনি ওহীর মাধ্যমে অবহিত হতেন।

সাহাবায়ে কেরামের রাদ্বিআল্লাহু আনহু যুগে মুনাফিক চিহ্নিত করার সহজ পথ একপ্রকার রুদ্ধ হয়ে গেলো। একমাত্র কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অন্তরঙ্গভাবে কিছুদিন একত্রে না থেকে মুনাফিক চেনা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো।

ফলে সাহাবায়ে কেরামগণ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছু কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরবর্তী যুগে ইসলামে অন্তর্ভূক্তির দাওয়াতের পরিবর্তে মুসলমানদের মাঝে ইসলাম চর্চার দাওয়াত হয়ে যাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বংশ পরম্পরায় যারা মুসলমান হয়ে জন্ম নিবে তাদেরকে ইসলামী বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দেবে।

একইভাবে নও-মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে যদি 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' চালু রাখা হয়, তাহলে ঘুষ প্রথার একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। কারণ, মানুষের মাঝে যতোগুলো কু স্বভাব রয়েছে, তার মধ্যে সবচে মারাত্মক ও ক্ষতিকর হচ্ছে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ লাভের আকাংখা। অথচ ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে, যার যতটুকু সম্পদের প্রয়োজন, তার জন্যে ততটুকুই আহরণ করা উচিত। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে, মানুষ তার চাহিদানুরূপ সম্পদ পাওয়ার পরও পৃথিবীর সকল সম্পদ আয়ত্ত করার ইচ্ছা পোষণ করে। সম্পদশালী হওয়াকে জীবনের মোক্ষম জ্ঞান করে। ফলে মুমিনী ও তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনে কঠিন বাধা সৃষ্টি হয়। এমনিতেই আজকের মুসলিম সমাজে সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তি পাওয়া কষ্টকর।

উপমাস্বরূপ বলা যায়, গত শতাব্দির গোড়াতে মধ্যপ্রাচ্য যখন তেলসম্পদ লাভ করে, তখন দেশ-জাতির ধ্যান-ধারণা পুরোটাই বদলে যায়। একইসাথে নব্য আহলে হাদীসপন্থীদের মাযহাব অস্বীকারের কারণে নতুন মাসআলা তৈরী হয়। যাতে তারা আয়েশী জীবন-যাপন করতে সুবিধা সৃষ্টি করতে পারেন। প্রথমে তারা বিশ্বের দুঃখী-দরিদ্র মুসলিমদের অর্থসহায়তা দান করতে শুরু করেন। অন্যদিকে, 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর আওতায় বিভিন্ন অমুসলিম দেশেও নানা ইসলামী প্রজেক্ট চালু করেন।

এতে ইসলামপন্থী গরীবেরা যেমন লাভবান হন, তেমনি অমুসলিম দেশেও ইসলামের প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। কিন্তু কয়েক বছরের মাথায় এই 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' সুফলের পরিবর্তে কুফলে পরিণত হয়। যেমন- মধ্যপ্রাচ্যের আমীরগণ অমুসলিম দেশ থেকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' প্রাপ্ত গরীব-দুঃখী মহিলাদের নিজের দেশে এনে আয়েশী কাজে ব্যবহার করেন। যেহেতু বর্তমান আহ্‌লে হাদীস ও মওদুদীপন্থী মাসাইল আবিষ্কারকগণ এটা জায়িয করেছেন। আর অমুসলিম দেশের পূঁজিপতিরাও এ অনুদানকে অত্যন্ত আগ্রহভরে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। কারণ, তাদের যেসকল মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের নাম করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হচ্ছে, তারা আসলে গুপ্তচরবৃত্তির ট্রেনিং প্রাপ্ত। ফলে, পরাশক্তি দেশগুলো এই অর্থ সাহায্যকে কেন্দ্রকরে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত তেল সম্পদসহ আভ্যন্তরীণ শক্তি-সামর্থ্য দখল করে বসে আছে।

তাছাড়াও 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর স্থায়িত্ব থাকলে ঘুষের দরোজা খোলা থাকে। যেমন- ব্যক্তিগত কাজ হাসিলের উদ্দেশ্যে কেউ কোনো অফিসারের কাছে গেলো। কিন্তু অফিসার ব্যক্তিটি তুলনামূলক দরিদ্র তবে, মুমিন। তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকনও গ্রহণ করতে রাজী নন। অতএব তার পরিবারবর্গকে আরো বেশি মুমিনী জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যদি কিছু সম্পদ দান

করেন, তাহলে তারা এটা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। অথচ দানকারীর অন্তরে লোভ, যা অন্তত বছরদিন পরে স্বার্থ হাসীল করার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যুগের পরিস্থিতিতে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুষপ্রথা চালু করতে অনুপ্রাণিত করবে, এই ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা বাতিল করেন।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর সিদ্ধান্ত শরীয়ত হবার দলিল হচ্ছে, "হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসে ছিলাম। সেখানে আবূ বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হতে উঠে গেলেন এবং ফিরতে বিলম্ব করলেন। এতে আমরা ভীত হয়ে গেলাম যে, তাঁর নিকট আমরা পৌঁছার পূর্বে যদি তিনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন! আমরা অস্থির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলাম। সর্বাগ্রে আমিই অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হলাম। শেষ পর্যন্ত বনি নাজ্জারের এক আনসারীর বাগানের নিকট পৌঁছলাম। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতে পারেন মনে করে প্রবেশপথ খোঁজার জন্য এর (বাগান) চতুর্দিকে চক্কর দিলাম। দেখি, একটি ছোট নালা বাগানের বাইরের একিট কূপ হতে এসে ভিতরে প্রবেশ করেছে। আমি অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আবূ হুরাইরা নাকি?' আমি হ্যাঁ-বাচক জবাব দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি? তুমি এখানে কি রূপে এলে?' আমি বললাম, আপনি আমাদের মধ্য থেকে চলে এলেন, ফিরতে বিলম্ব হলো বলে আপনার বিপদ আশংকা করে সকলেই অস্থির হলো। আমিই প্রথম অস্থির হয়ে ছুটে বাগানের নিকট এলাম এবং অতি কষ্টে বাগানে প্রবেশ করলাম। অন্যান্য লোকেরাও আপনার সন্ধানে আমার পিছনে আসছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পাদুকাদ্বয় আমাকে দিয়ে বললেন, 'আবূ হুরাইরা! আমার পাদুকাদ্বয় নিয়ে যাও, বাগানের বাইরে যারই সাথে সাক্ষাৎ হবে- 'যে ব্যক্তি অন্তরের বিশ্বাসে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই' তাঁকে বেহেশতের সংবাদ দিয়ো।' বাইরে এসে সর্বপ্রথম উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাদুকাদ্বয় কিরূপে বা কেনো?' আমি বললাম, পাদুকাদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তিরি আমাকে পাদুকাদ্বয় দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, এ বাগানের বাইরে যাকেই পাবে, 'যে ব্যক্তি অন্তরের বিশ্বাসে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই' তাঁকে বেহেশতের সংবাদ দিয়ো।' তাকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দেবে। এটা শুনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমার বুকের মাঝখানে তাঁর হাত মেরে দিলেন। আঘাতের চোটে আমি পিছনের দিকে পড়ে গেলাম বা বসে গেলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরাইরা! ফিরে যাও। অতঃপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরে এলাম এবং ক্রন্দরত ছিলাম। এদিকে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমার পিছনে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরাইরা তোমার কি

হয়েছে? আমি উমরের রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর আচরণ সম্পর্কে বললাম। তিনিই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর, তোমাকে এমন করতে কিসে উৎসাহিত করলো? উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি কি আবূ হুরাইরাকে পাদুকাদ্বয় দিয়ে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, পথিমধ্যে যার সাথেই সাক্ষাৎ হবে, 'সে যদি অন্তরের বিশ্বাসে এ কথা ঘোষণা করে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই' তাঁকে যেনো বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ! আমি এরূপ বলেছি।' উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি এরূপ করবেন না, কারণ আমার ভয় হচ্ছে যে, পাছে মানুষ এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরের রাদ্বিআল্লাহু আনহু কথার সমর্থন জানিয়ে বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। তারা আমল করতে থাকুক।" (মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসদ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বদল করার অনুরোধ জানিয়েছেন ভবিষ্যতের মুনাফিকী চিন্তাধারার লোকদের কথা ভেবেই, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সমর্থন দিয়েছেন।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর সিদ্ধান্তের উপর মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই নতুন ফতোয়া দানের উদ্দেশ্য কিন্তু ঘুষপ্রথা চালু করা নয়! বরং দলীয় স্বার্থে জনসাধারণকে দলের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে একপ্রকার কুটকৌশল মাত্র। যেমন, বিশ্বের যে সকল দেশে ইদানিং মওদুদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে, সে সকল দেশে বিরাট বিরাট জনসেবামূলক সংস্থা চালু করা হয়েছে। 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'-এর কথা বলে বিরাট অংকের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক আহলে হাদীস ও সালাফীপন্থী শেখ, আমীর ও যুবরাজদের কাছ থেকে। অথচ মুসলিম সমাজেই এই অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে, যাতে মানুষ মওদুদী দলের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। এমনকি যে সকল জনগণকে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, তারা যেমন যাকাত, সদকা ও ফিৎরার হক্বদার নয়, তেমনি এরকম সাহায্যের প্রয়োজনও তারা রাখেন না। এমনকি তারা সবাই মুসলিম, কেউ অমুসলিমও নয়।

'মুআল্লাফাতুল কুলূব' সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী সাহবের এই নতুন যুক্তি আবিষ্কারের সূত্র হচ্ছে একটি আরবী পত্রিকা। 'ইসলাম শরীআহ্ ও সুন্নাহ্' নামক গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। ডঃ মুস্তাফা হুস্নী আস্-সুবায়ী রচিত গ্রন্থখানি ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' অনূদিত প্রথম সংস্ককরণ প্রকাশ করে। উক্ত গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বক্তব্য হচ্ছে, "মরহুম সৈয়দ রশীদ রিযা কর্তৃক সম্পাদিত 'আল-মানার' পত্রিকার নবম বর্ষের ৭ম ও ১২শ সংখ্যায় ডাঃ তাওফীক সিদ্দিকীর দু'টো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাতে প্রকাশ্যে এ শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, 'শুধুমাত্র কুরআনই ইসলাম'। তাঁর সন্দেহগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, 'আমরা কুরআনে কিছুই বাকী রাখি নাই' (সূরা আল-আনআম-৩৮) এছাড়াও 'এবং আমরা তোমার উপর গ্রন্থখানি (কুরআন) নাযিল করলাম সবকিছুর বর্ণনাকারীরূপে।' (সূরা

আন-নাহল- ৮৯)

উপরোক্ত উভয় দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীনের যাবতীয় কিছু কুরআনে আছে। তাঁর যাবতীয় হুকুম তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন এবং তাও বিশদরূপে। এরপর সুন্নাত বা অপর কিছুর আবশ্যকতা বাকী থাকে না।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলাম শরীআহ্ ও সুন্নাহ্ পৃষ্ঠা- ১৩৮)

দিন-কালের হিসেব করলে দেখা যাবে, ডাঃ তাওফীক সিদ্দিকীর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে ৪০ এর দশকে। আর জনাব মওদুদী সাহেবের 'তাফহীম' লেখার যুগও ঐ একই সময়ে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, 'সাহাবাগণ এবং হাদীস' প্রত্যাখ্যান একটি সুদূর প্রসারী ও নেটওয়ার্ক ভিত্তিক পরিকল্পনা।

নব্য লা-মাযহাবীদের ভ্রান্ত আক্রমণ

"চার মাযহাবের অন্তরালে" নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন- খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মাযহাবপন্থীদের সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, লেখক নিজেকে লা-মাযহাবী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। সাবাঈ খারিজী এবং শিয়াদের মতো সত্যের মধ্যখানে একটি মিথ্যার বীজ বপন করেছেন। লেখক তার পুস্তিকায় পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো আয়াত এবং হাদীসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নীতি অবলম্বন করতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন ডাহা মিথ্যা উদ্ধৃতি। তিনি কবি নজরুলের একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় নিজস্ব শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এতে কবিতার অর্থগত সমস্ত দোষ ঐ লেখক তার নিজের উপরে টেনে নিয়েছেন।

নজরুলের প্রকৃত কবিতাটি হচ্ছে-

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে\
আমরা তখনো বসে,\
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজি\
হাদীস কুরআন চষে।

অর্থাৎ চোর যখন চুরি করে পালায়, তখন অবশ্যই কোনো না কোনো প্রমাণ রেখে যায়। অথচ চোর মনে করে আমি তো ধরা পড়িনি।

বর্তমান ভারত উপমহাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশেও ইদানিং 'আহলে হাদীস' ফিরকার উদ্ভব লক্ষ্যণীয়। তাদের দল ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করছে। তাদের কিছু সংখ্যক মাসআলা মুসলিম সমাজে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা সাহাবায়ে কেরামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ছাড়ে। (নাউযুবিল্লাহ্)

যেমন তিন তালাক ও জুমুআর আযান সম্পর্কিত বিষয়ে এই আহলে হাদীস দলটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকে অস্বীকার করছেন। বর্ণিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা একটিকে আরেকটির মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে এমন অস্বাভাবিক প্রশ্নের সম্মূখীন করে, যা ভাবতেও শরীর

শিউরে উঠে।

সুদূর অতীতের 'নাজদাত' ফির্কার লোকেরা কেবল কুরআন-হাদীসে বিশ্বাস রাখতো। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মূল্যায়ন করতো না। তাই তারা মনগড়া মাসআলা-মাসায়েল দিয়ে বেড়াতো। একই ভাবে গেলো শতাব্দির অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীও ঐ একই ভাবধারায় গবেষণা করেছেন। ফলে তার গবেষণাকর্মে যেমন কুরআনের অর্থগত আধুনিকায়ণ হয়েছে, তেমনি হাদীসের ছাটাই-বাছাই, সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চা ও লা-মাযহাবী'র বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন থেকে সালাফী মুভমেন্ট

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নজদের অন্তর্গত উয়ায়না অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় বিজ্ঞতা অর্জন করে বিশেষ একটি আন্দোলনের জন্ম দেন। তার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা। তখনকার মুসলিম সমাজে- কবর পূঁজা, পীরকে সেজদা করা ইত্যাদি শির্ক গোনাহ্ জাতীয় রুসুম-রেওয়াজ প্রচুর পরিমাণে চালু হয়েছিলো। তিনি এগুলোকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করেন। নজদী সাহেবের শরীয়তপন্থী বক্তব্য শুনে যুগের কিছু সংখ্যক হক্কানী উলামায়ে কেরামও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ- সমাজে যখন সাহসী নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সরল প্রাণ উলামায়ে কেরাম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। স্বপক্ষের বক্তৃতা-বিবৃতিকে সানন্দে গ্রহণ করে নেন।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী'র রীতিনীতির মধ্যে যে বিষয়গুলো অনুসৃত হয়েছে তা হলোঃ-

১) এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সমুদয় উপাসনার পাত্র অলীক ও মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যা উপাস্যের যারা পূজা করে, তারা হত্যার যোগ্য।

২) মনুষ্য জাতির অধিকাংশই মুওয়াহ্হিদ বা একক আল্লাহ্র ভক্ত নয়,- কারণ তারা ওয়ালী-দরবেশদের কবর যিয়ারত করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং তাদের ক্রিয়াকলাপ কুরআনে বর্ণিত মক্কার মুশরিকগণের ক্রিয়া-কর্মের অনুরূপ।

৩) দু'আর সময় কোন নবী, ওয়ালী, পীর বা ফিরিশতার নামের অবতারণা করা শির্ক বা অংশীবাদিতার নামান্তর।

৪) আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও সাহায্য প্রার্থনা করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

৫) আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও নামে শপথ করা শির্ক।

৬) আল-কুরআন, সুন্নাহ্ এবং যুক্তিমূলক কিয়াসের ভিত্তি ছাড়া অপর কোনপ্রকার ইল্মের স্বীকৃতি ব্যক্ত করা কুফরির শামিল।

৭) সমুদয় কাজে কাদারের (তাকদীর, ভাগ্যলিপি) অস্বীকৃতি কুফ্র এবং ইল্হাদ অর্থাৎ অবিশ্বাস ও অধর্মাচরণের নামান্তর।

৮) তাবীলের (মনগড়া ব্যাখ্যা) সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা করা কুফরির পর্যায়ভুক্ত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করে তখনকার কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ-উলামায়ে কেরাম নজদীদের সংস্কার আন্দোলনকে স্বীকৃতি দান করেন। ঠিক একই সময় আরেকদল উলামায়ে কেরাম- যারা উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণ একমত ছিলেন না, তারা এই আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত হন। দু'টি দলের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা হয়। সময়ের তালে দলীয় তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একই সময় সমস্ত আরবভূখন্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের দখলে নেওয়া এক হলুদ-প্ল্যান তৈরীর পরিকল্পনা চলছে। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সুক্ষ্নতার ভিতর দিয়ে দু'টো দলের ভিতর ঢুকানো হয় উসকানীদাতা বৃটিশ গুপ্তচর বাহিনীর লোক। এতে নজদী আন্দোলনের মোড় অনেকটাই পাল্টে যায়। কিছু সংখ্যক জনসমর্থন ও শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে নজদী সমর্থকগণ সরাসরি সমর আন্দোলনে লিপ্ত হন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী কর্তৃক 'শির্ক' বিরোধী আন্দোলন তখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হয়।

নজদীরা প্রচার করলেনঃ-

১) ফরয নামাযের জামাআতে যোগদান প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

২) তামাকের ধূমপান হারাম। কেহ ধূমপান করলে অনূর্ধ্ব চল্লিশ ঘা বেত্রদন্ড দিতে হবে।

৩) দাড়ি মুন্ডন এবং গালি-গালাজের অপরাধের শাস্তি কাজী তার বিচার-বিবেচনা অনুসারে প্রদান করবেন।

৪) গোপন মুনাফার জন্যও যাকাত দিতে হবে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ।

৫) 'কালিমা তাইয়্যিবা' শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই কোন লোককে মুমিন বলে গণ্য করা হবে না। এরকম ব্যক্তির জবেহ্ করা পশু হালাল বলে গণ্য নয়।

৬) তসবীহ্ ব্যবহার করা নিষেধ। তৎপরিবর্তে আল্লাহ্র নাম ও দোয়া দরূদ নিজ নিজ হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উচিত।

৭) মসজিদের উপরে কোনপ্রকার গম্বুজ তৈরী করা নিষিদ্ধ। বরং মসজিদ সাদাসিদা হওয়া উচিত। (ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১)

নজদী কর্তৃক ইত্যাদি বিষয়গুলো যখন প্রচারিত হতে শুরু করে, তখনই তৎকালীন হক্কানী উলামায়ে কেরামের মাথা ঘুরে যায়। নজদীদের আসল চেহারা তাদের সামনে স্পষ্টতা লাভ করে। কিন্তু ততক্ষণে শুরু হয়ে যায় আরব জাহানে নজদী সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের নামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধবিগ্রহ। সাধারণ লোকেরা তখন বুঝতে পারে না যে, হচ্ছেটা কী?

নজদীদের নির্বিচার গণহত্যা ও দেশ দখলের যুদ্ধনীতি প্রত্যক্ষ করে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। তাদের সাথে যোগ দেয় গাতগাত ও দাখনা গোত্রের হিংস্র প্রকৃতির লোকেরা। যাদের কর্মতৎপরতাই লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ। এইসব গোত্রগুলো নজদীদের সাথে মিলিত হয়ে ১২২০ হিজরী থেকে ১২৩৩ হিজরী পর্যন্ত ব্যাপক হত্যাকান্ডের মাধ্যমে পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করে নেয়।

এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমাদের যুগে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারীরা নজদ থেকে বহির্গত হয় এবং মক্কা ও মদীনার হেরেমদ্বয়ের উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাব অবলম্বী বলে দাবী করতে থাকে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান কেবল তারাই এবং যারা তাদের সমমনা। পক্ষান্তরে যারা তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, তারা সকলেই মুশরিক। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের লোকদেরকে হত্যা করা, আলেমগণকে মেরে ফেলা তারা বৈধ মনে করে। তাদের আধিপত্য কায়েম রইল। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রাবল্য খতম করে দিলেন এবং তাদের শহর সমূহকে জনশূন্য করে দিলেন। তাদের মোকাবিলায় ১২৩৩ হিজরীতে মুসলমানদেরকে সাফল্য দান করলেন।"

নজদীদের এই হঠকারীতা সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইবনে সউদের আধিপত্য বিস্তারের সময় গাতগাত ও দাখনা গোত্রদ্বয় মুসলমানদেরকে হত্যা ও তাদের ধনসম্পদ লুট করার আকারে যে ফেতনা সৃষ্টি করেছিল, অবশেষে ইবনে সউদ অতিষ্ঠ হয়ে তা দমন করে এবং এই গোত্রদ্বয়ের শক্তি উৎপাটিত করে দেয়।" (চেরাগে মুহাম্মদ (সাঃ) পৃষ্ঠা-৭৬ ও মকতুবাত ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৭৯)

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রখ্যাত লেখক মরহুম আব্বাস আলী খান রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থকারের কথা' অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন, "এ ইতিহাসের কোথাও কণামাত্র অসত্য, স্বকপোলকল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করিনি। অনেকের কাছে তিক্ত হতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।"

ইতিহাস গ্রন্থে মরহুম খান সাহেব লিখেন, "আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আরবে যে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক বা মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ। পিতার নাম আবদুল ওয়াহ্হাব। ....তাঁর পুরা নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব।

"...... তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে একথা সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নও সম্ভব নয় কিছুতেই। মুহাম্মদ বিন সউদের সাহায্য সহযোগিতায় যে প্রচন্ড রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিল লক্ষ লক্ষ বেদুঈন। তাঁর ফলশ্রুতিস্বরূপ বার বার বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েও অবশেষে গোটা আরব দেশ তাদের করতলগত হয়। সউদ বংশের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমগ্র আরবভূমিতে এবং তার জন্যেই এ দেশটির পরিচয় হিসাবে বলা হয়ে থাকে সউদী আরব। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতাই এই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রত্যক্ষ ফল।" (বাংলার মুসলমানের ইতিহাস পৃষ্ঠা- ২৩৪-২৩৫)

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র লিপিবদ্ধ একটি উক্তি হচ্ছে, "মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এ তত্ত্ব আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার নয়। দুনিয়ার প্রথম মানুষ একজন মুসলমান, আল্লাহ্র নবী ও খলিফা ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে অগাধ জ্ঞান ভান্ডার দান করেন। তাঁর থেকে ইসলাম ও ইসলামী জাতীয়তার সূচনা। উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এ তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক ও

স্বাধীন আবাসভূমি দাবী করা হয়েছিল। এ জাতীয়তা ইসলামের শাশ্বত 'থিওরী' বা মতবাদ। হিন্দু কংগ্রেস উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এক জাতীয়তার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন এক প্রখ্যাত আলেম, দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী। তিনি কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করেন একই ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে বসবাসকারী মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে মিলে এক জাতি। উপমহাদেশে মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের দাবী করে।" (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস পৃষ্ঠা- ৪১৬-৪১৭)

উল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থের আলোচনা কিংবা সমালোচনার এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ লেখক নিজেই দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন যে, "এ ইতিহাসের কোথাও কণামাত্র অসত্য, স্বকপোলকল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করিনি।" সুতরাং ডজন ডজন অসত্য ও স্বকপোলকল্পিত ফিরিস্তির এই পুস্তকখানার সমালোচনা করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু উপরোল্লিখিত লেখকের দু'টো বক্তব্যের দিকে একটু নজর দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী বাংলার মুসলমান নন। তিনি আরবের মুসলমান। তাছাড়া, তাঁর আন্দোলনের মূলমন্ত্র এবং মওদুদী মতবাদের ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রও নিরান্নব্বই ভাগ সমান এবং অভিন্ন।

অন্যদিকে নিরীহ মুসলমানের খুনরঞ্জিত নজদী আন্দোলনকে ইসলামের সংস্কার আন্দোলন নামে চালিয়ে দেবার মূল কারণ, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার হীনস্বার্থ। যেহেতু মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন অখন্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর প্রস্তাব ছিলো, ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক, তবে এক দেশ হিসেবে। টুকরা টুকরা স্বাধীনতার চেয়ে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতাই ছিলো তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি একজাতীতত্ত্বের ঘোষণা দেন নি। কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবের এই ইতিহাস গ্রন্থে যেমন- সত্য ও মিথ্যা রয়েছে, তেমনি অতিরঞ্জন রয়েছে। একারণেই বিষয়টি পাঠকমহলে তুলে ধরা হলো। তবু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য রয়েছে- জনাব গোলাম মুর্তাজা রচিত কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থখানি।

সালাফী শব্দের অর্থ পূর্বসূরী। বর্তমানে নজ্‌দী বা ওয়াহ্হাবীদের একটি উপদল নিজেদেরকে সালাফী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের আক্বিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে "ইমাম ও মাযহাবের কোনো প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কুরআনের জ্ঞান ও হাদীসের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।"

মুসলিম সমাজ থেকে শির্‌ক-বিদআত উৎপাটনের লক্ষ্যে তারা ওয়াহ্হাবীদের অনুসরণ করেন। তাই ওয়াহ্হাবীদের অনুসরণকে কেন্দ্রকরে এই দলটির নাম রাখা হয়েছে সালাফী। বর্তমানে সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ ও রাষ্ট্র সালাফী আক্বিদায় বিশ্বাসী। বিশেষ করে পবিত্র মক্কা ও মদীনার হেরেমদ্বয় এখন সালাফী ইমামদের দ্বারা পরিচালিত। উক্ত হেরেমদ্বয়ে প্রধান চারটি মাযহাবের ইমামদের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

বর্তমান শিয়া মতবাদ

শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে, বর্তমানের কুরআন শরীফের একটি শব্দও বিশুদ্ধ নয়, বরং সাহাবায়ে কেরাম চুরি করেছেন। তিন চারজন সাহাবী ছাড়া বাদবাকী সবাই এই চুরাকারবারে লিপ্ত ছিলেন। একমাত্র আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর বংশধর ছাড়া বাদবাকী সবাই চক্রান্তকারী।

শুধু এখানেই শেষ নয়, বর্তমান ইরান নামক দেশটিতে যে শিয়া মতাবলম্বীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী। তিনি ১৯০১ ইংরেজীতে জন্ম গ্রহণ করেন। খোমেনী একাধারে লেখক, সুবক্তা এবং যুগের চাহিদা পূরণকারী একজন মুসলমানধারার দার্শনিকও ছিলেন। তার দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইরানের শাহ্-এর পরিবারের তিন শত বছরের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। আয়াতুল্লাহ খোমেনী ফ্রান্সে বসবাস করে নিজের দেশ ইরানে বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন। এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল সুনাম। বাস্তবতার জন্য তার দার্শনিক প্রজ্ঞা ছিলো অত্যন্ত ফলপ্রসু। তিনি সর্বপ্রথম অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে ইরানী মহিলাদের মাঝে ইসলামী দাওয়াত শুরু করেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সব রকমের সুবিধা দান এবং বাদশাহ্-এর বিরুদ্ধে মহিলাদের মাঠে নামানো হয়। দেশটি এখন শাহ্-এর শাসনমুক্ত। আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর এই বিপ্লবকে ফলপ্রসু করার পিছনে যে দার্শনিক প্রজ্ঞাটি কাজ করেছে, সেটি হলো মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ এবং দেশের যুবসমাজ ও কর্মীসমাজের সুবিধার জন্য ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তকরণ। এর একটি স্বরূপ হলো- গণতন্ত্রবাদী পশ্চিমা দেশগুলোর অবাধ যৌনতার মতো 'মুত্আ'-এর স্বীকৃতি।

'মুত্আ' সম্পর্কে চাইনিজ দর্শন ও আইনী স্বীকৃতি হচ্ছে যে, ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে দেশ ও জাতির স্বার্থে। দেশের সীমারেখার ভেতর অথবা বহির্বিশ্বেও ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অতএব ব্যক্তি যখন যেভাবে বসবাস করবে, জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে স্বজাতির যেকোনো ব্যক্তির সাথে মিলিত হতে পারবে। এতে দেশীয় আইন ও দেশীয় ধর্মীয় অনুশাসনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অর্থাৎ একজনের স্বামী অথবা স্ত্রী আরেকজনের সাথে বসবাস করতে আইনী আপত্তি নেই, তবে কোনোক্রমেই সন্তান ধারণ করতে পারবে না।

শিয়াপন্থীদের 'মুত্আ' হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের জন্য মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহবন্ধন। সময় অতিক্রান্ত হলে বিবাহ ছিন্ন হয়ে যায়। অবশ্য সন্তান ধারণের জন্য বাধ্যবাধকতা নেই।

এই পন্থাটা দেশ ও জাতির কর্মজীবী অর্থাৎ সেনাবাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলবাসী এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী অফিসার শ্রেণীর জন্য খুবই সহায়তাপূর্ণ। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দর্শন এই ব্যবস্থাকে ব্যক্তির মনের চাহিদার উপর ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, এই বিষয়টি হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা। এই দুর্বলতা থেকে মানুষকে আইনী মুক্তিদানের মাধ্যমেই পশ্চিমা দেশগুলো আজ এতো উন্নত।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর সমসাময়িক আরেকজন বিজ্ঞ দার্শনিক হচ্ছেন- আবুল আলা মওদুদী।

তিনি ১৯০৩ ইংরেজীতে ভারতের হায়দরাবাদ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার দর্শনের ধারা হচ্ছে, সুন্নী (সাহিত্যের ভাষায় যাকে রক্ষণশীল মুসলিম বলা হয়) মুসলিমদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক মূলনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সংমিশ্রণ দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে বিচক্ষণতার সাথে তাফহিমুল কুরআন, রাসায়েল মাসায়েল, খিলাফত্ ও মুলুকিয়ত এবং ছোটবড় অনেকগুলো বই-পুস্তক রচনা করেছেন। তার লেখার মূল বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী মূলনীতির (রক্ষণশীলতার) উপর আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে শিক্ষিত তরুণ সমাজকে বিপ্লবী করে তোলা।

একদিকে শিয়া সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করে নিজের মনগড়া মাসআলা মাসায়েল তৈরী করে নিয়েছে। এমনকি তারা তাদের দেশে শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেও সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী দার্শনিক জনাব আবুল আলা মওদুদী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্ত্বা ও সম্মানজনক ভাবে কুরআন-হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতিতে সেই পশ্চিমা দাশর্নিক প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্রের' প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক প্লেটো তাঁর আদর্শিক রাষ্ট্র গঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ব্যক্তিমানুষের সীমিত গন্ডীতে ন্যায়পরতার প্রতিফলন দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর। তাই সমাজব্যবস্থা, আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ও ক্ষমতালাভের পরই সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তি সামাজিক জীবনে কোন না কোনো ভাবে অসামাজিক কার্জকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য। এটা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। ফলে ব্যক্তির ন্যায়পরতা কখনো সহজে বুঝা যায় না। আবার কখনো সমাজের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। যে বিভ্রান্তির ফলে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে কখনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অতএব, ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে যদি আদর্শ রাষ্ট্র এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের হাতে দায়িত্ব অর্পন করা যায়, তাহলে সামাজিক বিভ্রান্তি অকেজো হয়ে যায়। জনাব মওদুদী সাহেবও এই জিনিসটিই চেয়ে ছিলেন।

মূল বিষয়টা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে? হয়তো হচ্ছে না! এবার দেখুন, যুগের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে ইসলামী দার্শনিক মাওলানা মওদুদী সাহেব কোথা থেকে এই 'উত্তরাধুনিক মতবাদ' প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পেয়েছেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ

গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে, সরকার জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণই গঠন করবে। আজকের গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় এই মূলনীতি আর নেই। এই বাক্যটি আজ প্রবাদবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গণতন্ত্রের মূল দর্শন হচ্ছে জনগণ এমন একটি সরকার গঠন করবে, যা জনগণকে শৃংখলাবদ্ধ ও সমাধিকারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পুরণের নিশ্চয়তা দিবে এই সরকার বা শাসনব্যবস্থা। সর্বকালেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা হচ্ছে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। মানুষের এই তিনটি মৌলিক চাহিদার স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জনকারী সরকারকেই গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে তিন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন। অভিভাবক, সৈনিক ও কারিগর এই তিন শ্রেণীর লোকের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কারিগর শ্রেণীর চেয়ে সৈনিক শ্রেণী সংখ্যায় কম হবে এবং তারচে কম হবে অভিভাবক শ্রেণী।

গণতান্ত্রিক সরকারের মূল প্রবক্তা দার্শনিক প্লেটো। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে বর্তমান গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তার কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “রাষ্ট্র বলতে ব্যক্তি-মানুষের সমষ্টিকেই বুঝায়, আর ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাংখার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রে। কাজেই রাষ্ট্রের যেমন রয়েছে দার্শনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক এ তিনটি দিক, মানবাত্মারও রয়েছে বুদ্ধিজাত, বীর্যজাত ও কামনাজাত এ তিনটি দিক। আর রাষ্ট্রীয় ন্যায়পরতা যেমন রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর নাগরিকদের সহযোগিতা ও সমঝোতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিগত ন্যায়পরতাও তেমনি মানবাত্মার তিন অংশের সমঝোতার মধ্যে নিহীত। তাই নির্ভেজাল দর্শনানুরাগ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ-কামনা এ দুই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে অভিভাবকদের। তাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করতে হবে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। আর শক্তির উৎস জনগণ। অতএব জনগণকে পৌরানিক কেচ্ছা-কাহিনীর বিশ্বাস থেকে বের করে বাস্তবতার সাথে আকৃষ্ট করতে হবে। বাস্তবতা দিয়ে জনগণকে সম্মুহিত করতে পারলেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরী করা সম্ভব।”

এরিস্টটল প্রসঙ্গ

দার্শনিক প্লেটো যখন ৪২ বছরে পা রেখেছেন, তখন এরিস্টটলের জন্ম (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৫ অব্দে)। এরিস্টটলের দার্শনিকতা অনেকাংশেই প্লেটোর দর্শনের অনুরূপ। তিনিও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি। তবে একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক জীবনে সফলতা অর্জন করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে অবশ্যই ‘রেটরিক’ হতে হবে। রেটরিক একটি গ্রীক শব্দ। এর বাংলা অর্থ বাগ্মিতাকৌশল। অর্থাৎ শ্রোতা বা পাঠকের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টিই বক্তা বা লেখকের

উদ্দেশ্য। সমাজজীবনে সফল হতে হলে বক্তা বা লেখককে অবশ্যই তার বক্তৃতা বা লেখনিকে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য বক্তা বা লেখককে শ্রোতা বা জনগোষ্ঠির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, শ্রোতা বা জনগোষ্ঠি যেনো তাকে উৎকৃষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন একজন ভালো মানুষ ভেবে নেয়। তিনি এমন কৌশলে বক্তব্য বা লেখনি উপস্থাপন করবেন, যেনো লোকেরা তার সাথে একমত হয় এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপছন্দ করে। সুদক্ষ 'রেটরিক'কে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সব মানুষের মানসিক অবস্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক নয়। সুতরাং কোন্ ধরণের মানুষের সাথে কিভাবে বক্তব্য বা লেখনি উপস্থাপন করছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করতে হলে, তাদের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হানতে হবে এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার বক্তব্য ও মন্তব্যকে বদলাতে হবে। আর এ কৌশল অবলম্বন করতে পারলেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব এবং আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ উপহার দেয়া সহজ।

রোজার বেকন প্রসঙ্গ

এবার দেখুন পশ্চিমা আরেক দার্শনিকের ধর্মমত সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা। তিনি রোজার বেকন। তার সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে ১২১০ থেকে ১২১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে ইংল্যান্ডের সামারসেট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মতে, ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকার অর্থ এই নয় যে, এর পদ্ধতি ও ফলাফল সর্বদা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। বরং দেখা যায়, ধর্মতত্ত্ব প্রায়ই এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা তার পরিসরের অঙ্গীভূত নয়। ধর্মতত্ত্ব প্রায়ই অন্ধভাবে এর সীমানা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, নিজের পরিসরের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদির আলোচনায়ও ধর্মতত্ত্ব ধর্মগ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে প্রায়ই তাদের টীকা-টিপ্পনীর ওপর নির্ভর করে। মূল ধর্মগ্রন্থ আলোচনা না করে ধর্মতাত্ত্বিকেরা প্রায়ই তাদের মামুলি অনুবাদের ওপর নির্ভর করে থাকে।

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের রাষ্ট্রও সেই একই গণতান্ত্রিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ জ্যাকব হোলিওয়াক্ বলেন, "এটা সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার। যার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বা পবিত্রতার কোন সংশ্রব, সম্পর্ক নেই" এটাই সেক্যুলারিজমের মূলনীতি।

অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের সবচে বড় দায়িত্ববোধ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও বিজ্ঞতাপূর্ণ কর্মতৎপরতা। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাস্তবতা, নৈতিকতা ও প্রাকৃতিক মূল্যবোধ দিয়ে মানবতার উন্নতিকেই বলে সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমের তিনটি মূলনীতি হচ্ছে, (১) জড়বাদের উপর ভিত্তি করে জীবনের উন্নতি সাধন। (২) চলমান বিজ্ঞানই থাকবে ব্যক্তির প্রকৃত ভরসা বা

রক্ষণাবেক্ষণকারী। (৩) অন্য কোনো জীবন থাকুক বা না থাকুক, বর্তমানই প্রকৃত এবং উন্নত জীবন।

১৮৪৬ খৃষ্টাদের পর একাধারে ১৯-২০ বছর পর্যন্ত এই বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও লেখালেখির ভিত্তিতে সেক্যুলারিজমের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে সত্য, তবে মূলনীতির পরিবর্তন ঘটেনি।

এদিকে সেক্যুলারিজমের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদুদী সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে, “বহুমূত্র রোগীকে যেভাবে চিনি থেকে দূরে থাকতে হয়, তেমনি আজকের মুসলমানকে তাছাউফতত্ত্ব বা সূফীতত্ত্ব থেকে দূরে থাকতে হবে।” অর্থাৎ তাঁর এই উক্তির অর্থ দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক নৈতিকতা ও পারলৌকিকতা বাদ দিয়ে কেবল বাস্তবতাই হোক মানুষের একমাত্র কাম্য। (তাজ্‌দীদ ও এহিয়ায়ে দ্বীন)

তা ছাড়াও তিনি বলেন, “প্রকৃত পক্ষে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও তসবিহ্‌ তাহলিল হচ্ছে মানুষকে এক বৃহৎ ইবাদতের জন্য যোগ্য করে তোলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র। অর্থাৎ ধর্মীয় আমলের মেরুদন্ড হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।” (...?)

মওদুদী মতবাদ

আশাকরি আপনার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মওদুদী মতবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু কোথায় এবং তাঁর মতবাদের ধারাবাহিকতার উৎস কি। আরেকটু সহজভাবে উপস্থাপন করছি। মওদুদী দর্শনের মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। যা খৃষ্টপূর্ব ও পরবর্তী যুগের পশ্চিমা দার্শনিকদের অধিকাংশেরই ঐকমত্য। সৃষ্টিকর্তা একজন এতে কোনো সন্দেহ নাই। এক সৃষ্টিকর্তার সাথে কাউকে শরীক করা অমার্জনীয় গোনাহের কাজ, এটা ইসলামেরও মূলমন্ত্র। খৃষ্টপূর্ব ৪৭০ অব্দে জন্ম নেয়া দার্শনিক সক্রেটিস্‌ও এই একই মূলমন্ত্র নিয়ে দর্শন চিন্তা করেছেন। আড়াই হাজার বছর পরে আজকের সমাজজীবনেও সক্রেটিসের চিন্তার ধারাবাহিকতা বিরাজমান। আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনে এবং অতীতের সকল আসমানী কিতাবগুলোতেও নিজের একত্ববাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর জনসম্প্রদায়ের মাঝে নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ গত সহস্রাব্দের আগের যুগে মানুষের চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তার সাথে মানুষ আরো কিছু বেশি চায়। মানুষের চাওয়ার নিশ্চয়তার ভেতর ঢুকে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সক্রেটিসী দর্শনে শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব যতোটা ছিলো, তারচে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল ও পরবর্তী যুগের দার্শনিকেরা। সকলের মন্তব্য একটাই, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিরপত্তা ও বেঁচে থাকার স্বাধীনতা।

দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় বেঁচে থাকার জন্য অতীতের বিজ্ঞজনেরা গণতন্ত্রের জন্ম দেন। যে গণতন্ত্র কালের বিবর্তনে পৃথিবীতে একাধিক দল, মত ও মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউ মানুষকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিতে পারে নি। তবে মন্দের ভালো, অন্তত গণতন্ত্রের মাঝে আজো মানুষের নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম হলেও

স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেখা যায়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ সর্বস্থানে পরাধীন হলেও অন্তত ভোট কেন্দ্রের নির্জন প্রকোষ্টে তারা স্বাধীন। সেখানে কেউ তাদের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারে না।

প্লেটো, এরিস্টটল ও পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের দাবী ছিলো যে, শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে থাকবে ক্ষমতা। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা অতি সহজ। অন্যদিকে, অতীত দার্শনিকদের আরেকটা বড় দাবী ছিলো যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তার সাথে সাথে আত্মার খাদ্য সংগ্রহের জন্য সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় নীতিমালার শিকল থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। যাতে ভালো এবং মন্দ এ দু'টো চারিত্রিক তৎপরতাকে নিজ থেকে যাচাই-বাছাই করে ব্যক্তির কাছে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ চারিত্রিক কর্মকান্ডে ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান। অতীত দার্শনিকদের এই দাবী আজকের যুগেও গ্রহণযোগ্য। উত্তরাধুনিক যুগে গণতন্ত্রের শত শত রূপরেখা তৈরী হলেও আজকের মানুষ দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় শিকল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দিনাতিপাত করছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকরা যে সামাজিক রূপরেখা তৈরী করে ছিলেন, চৌদ্দশ' খৃষ্টাব্দের স্কোলাস্টিক দর্শনে এসে তা থেমে যায়। একমাত্র ডান্স স্কোটাস্ ছাড়া বাদবাকী সবাই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দর্শনের বর্ণনাভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেন। আধুনিকতার রঙ্গে রঙিন হয়ে গণতান্ত্রিক সামাজিকতায়- পূঁজিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার হাওয়া লাগে। আজকের পশ্চিমা উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের আবরণে পূঁজিতন্ত্র এবং সেক্যুলারিজমই সবচে বেশি ফলপ্রসু। আর এখান থেকেই শিক্ষা নিলেন ইসলামী দার্শনিক মাওলানা মওদুদী সাহেব। তিনি ইসলামের নতুন রূপরেখা তৈরী করার প্রয়াস চালালেন। স্কোলাস্টিক দর্শনে যেভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন থেমে যায়, ঠিক তেমনি মাওলানা মওদুদী সাহেবও ইসলামী দর্শনে একটি নতুন পথ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনিতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন অতীত চিন্তাবিদদের ভুল ও উদাসীনতার ফিরিস্তি। অনেক ক্ষেত্রে এইসব ভুল ও উদাসীনতার জন্মদাতা তিনি নিজেই।

কারণ অতীতকে প্রত্যাখ্যান না করলে বর্তমানের উপস্থিতি ঘটে না। অতীতকে অতিক্রম করেই বর্তমানের বিজয় সূচিত হয়। 'গতস্য শোচনা নাস্তি' এই প্রবাদবাক্যকে প্রাধান্য না দিলে বর্তমান ও আগামী দিনের উদ্বোধন করা যায় না। এটা সর্বকালের পশ্চিমা দার্শনিক ধর্ম। তাই মওদুদী সাহেবও একই পথে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি ব্যক্তিকে ধর্মের চার দেয়ালের ভেতরে বন্দি রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করলেন।

মওদুদীবাদের মূলমন্ত্র এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যও একটাই- অতীতকে এরিস্টটলের শেখানো 'রেটরিক' ষ্টাইলে কলুষিত করে বর্তমানের উদ্বোধন। তাঁর মতবাদের মানুষ শুধু আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসন মানবে। বাদবাকী যতো ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী, অর্থাৎ নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি কেবল দলীয় শক্তি সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহৃত হবে। সেক্যুলারিজমের ভাষায় যাকে বলে- 'ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে শুধু জড়বাদ বা প্রাকৃতিক বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক সত্যতার উপর ভরসা' করে মওদুদীবাদের ইসলামী অনুশাসন। মওদুদী

মতবাদের ব্যক্তি নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের মাধ্যমে শরীর ও মননকে কেবলমাত্র জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবে। এই জিহাদের অর্থ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন।

ইসলামী দার্শনিক মওদুদী সাহেব একদিকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যকে সাহসীকতার সাথে মূল্যায়ণ করেছেন। অন্যদিকে কুরআনে বর্ণিত নবীদেরকে অপকর্মকারী সাব্যস্ত করেছেন। একদিকে তিনি কুরআনকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে সত্যায়ণ করেছেন, অন্যদিকে কুরআনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ হাদীস শরীফকে 'রোজার বেকন'-এর ভঙ্গিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আর তাঁর সৃষ্ট মতবাদের মূল শ্লোগান হচ্ছে- "রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া কোনক্রমেই ইসলামকে পূর্ণ বিজয়ী করা যাবে না এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে ইসলামকে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জনসমক্ষে প্রতিভাত করতেই হবে।"

মওদুদী মতবাদের দার্শনিক দিক

প্রথমতঃ সমাজের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ছাড়া কারো শাসন করার অধিকার নেই।" অর্থাৎ পৃথিবীতে মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যতো বাতিলপন্থী উদ্যোক্তা জন্ম নিয়েছেন, সকলেই সাধারণ মানুষের মননে যুক্তিনির্ভর আঘাত করেছেন। চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের সকল প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তুর কঠোর সমালোচনা এবং কৌশলগত প্রত্যাখ্যানের পথ বেছে নিয়েছেন। কুরআন-হাদীসের কিছু আয়াত ও বাণী দিয়ে সাধারণ মানুষের মন-মগজে ঢেলে দিয়েছেন নিজের মতবাদ। এই কৌশলটা সুদূর অতীতের সাবাঈরা যেমন করেছে, তেমনি মওদুদী সাহেবও চালিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে- ভাববাদ। অর্থাৎ যৌবনকালে মানুষের অন্তর ভাবের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যুবশক্তি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যেমন কাব্যিকতা তরুণ ও যুবক বয়সের এক প্রকার ফ্যাশন। গান গাওয়াও তরুণ-যুবক বয়সের ফ্যাশন। কাব্যিকতায় যেমন ভাবাবেগ রয়েছে, তেমনি গানে গানেও থাকে ভাবের উত্থাল তরঙ্গমালা। তাই ভাবাবেগে আপ্লুত তরুণ-যুবকদের দিয়ে যে কোনো কাজ করানো অধিক সহজ। পৃথিবীর ইতিহাসে যতো বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সবখানেই তরুণ-যুবকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মূলত তাদেরকে দিয়েই বিপ্লব সফল করানো হয়েছে। মার্কিন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কিউবার কমিউনিষ্ট বিপ্লব, পাকিস্তানে স্বৈরাচারী আইয়ূব সরকারের ক্ষমতায়ণ, ইরানে শিয়া বিপ্লব ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে দেশ ও জাতির তরুণ-যুবশক্তি।

একইভাবে বড়োদের কথা অমান্য করাও তরুণ-যুবক বয়সের একপ্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। মুরব্বীদের ভুল ধরতে তরুণ-যুবক বয়সের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহী। বিদ্যালয়ে মন বসে না। অথচ মুরব্বীদের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চাকুরী পাওয়া যাবে না, আর

অনুত্তীর্ণ হলে পিতামাতার বকা খেতে হবে। ইত্যাদি ভাবাবেগে তরুণ-যুবক বয়সের মানুষ সব সময় নিজেকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন ভাবতে থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জনাব মওদুদী সাহেব কলম চালালেন। যুবসমাজকে বুঝাতে লাগলেন যে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্যবস্থা এই ইসলামী ইমারতে মারাত্মক রকমের ভুল রয়ে গেছে। একটি দালানের ভিত্তিমূলে যদি অপক্কতা বা কার্পন্য থাকে, তাহলে একদিন অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। ইসলামের বেলায় এটাই হয়েছে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতা, গোপনীয়তা, সমতা ও সুকৌশলে নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের ছাতাতলে নতুন রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা।

মওদুদী মতবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অতীত এবং বর্তমানের শিয়া সম্প্রদায়ও এই হেকমত বা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমে তারা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। বরং কুরআন হাদীসের ভেতরে থেকে শুধু একটি বীজ বপন করেছিলেন মাত্র। দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর পর শিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপদল ইরানে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আজ ইরান নামক রাষ্ট্রে গণপূঁজিতন্ত্রবাদী সরকার ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্র সরকারের দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মানুষের আমরণ দুর্বলতার সদ্ব্যবহার।

আজকের শিয়া সম্প্রদায়ের জাতির পিতা বা ইমাম জনাব খোমেনী মৃত্যুর প্রাক্কালে একটি অসিওতনামা লিখে গেছেন। এই অসিওতনামার প্রথমেই লেখা রয়েছে, "এই অসিওতনামা আমার মুত্যুর আগে কেউ পড়তে পাবে না।" খোমেনী'র মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা সেটি পাঠ করেন। এতে লেখা রয়েছে, "আমি নবী নই এবং জাতির ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী ইমামও নই। তবে ইরান জাতিকে সুন্নী জামাতের হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য যে দায়িত্ব পালন করেছি, তা নবী বা ইমামের দায়িত্বের চেয়েও বড়। তাই জান্নাতজীবনে আমি শিয়া জাতির ইমামের দায়িত্ব পালন করবো এবং এ দায়িত্ব পালনের কথা আমি স্বপ্নযোগে নির্দেশিত হয়েছি।" (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা ইউছুফ লুদিয়ানবী প্রদত্ত ভাষণ, এই ভাষণের অডিও ক্যাসেট লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে।) এই অসিওতনামায় সুন্নীদের প্রতি অনেকগুলো বিষোদগারের মাঝে এই একটি মাত্র উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। কারণ এই বাক্যগুলো থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, শিয়া সম্প্রদায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও চির আধুনিক ইসলাম ধর্মকে বৈদ্যুতিক ছুরা দিয়ে জবেহ্ করেছেন। আর মওদুদীবাদের প্রতিষ্ঠাতা ঠিক একই কাজ করেছেন মিছরীর ছুরা দিয়ে।

আজকের শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে বসবাস করছেন। কারণ তারা পবিত্র কুরআনের সত্তর হাজার আয়াতের মাঝে মাত্র সাড়ে ছয় হাজারের মতো লিপিবদ্ধ করেছেন, বাদবাকী ভেনিস করে দিয়েছেন।' (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা ইউছুফ লুদিয়ানবী প্রদত্ত ভাষণ)

শিয়া সম্প্রদায়ের বাহাত্তরটি গোষ্ঠি বা দলের অধিকাংশের এই একই দাবী। তাদের এই

দাবীর প্রেক্ষিতে বুঝা যায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দোষী সাব্যস্ত করলো।

অন্যদিকে দার্শনিক মওদুদী সাহেব নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ না হওয়ার ব্যাপ্যারে যুক্তি দিয়েছেন, "মানুষ মাত্রেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক, মহাকালের মানুষ যাতে নবী-রাসূলদের খোদা মনে না করে সেজন্য নবী-রাসূলদের মাধ্যমে ইচ্ছে করেই ভুল করানো হয়েছে।" (রাসায়েল ও মাসায়েল) এইরকম যুক্তি মহিলা ও তরুণ-যুবক বয়সের লোকেরা অতি সহজেই বিশ্বাস করবে। তাদের ভাবাবেগে এরকম যুক্তি খুব সহজেই দাগ কাটে।

যেসব কারণে মওদুদীবাদ একটি স্বতন্ত্র মতবাদ

মাওলানা মওদুদী সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে- "রাছূলে খোদা কে ছেওয়া কিছি ইনছান কো মিইয়ারে হক্ব না বানায়ে, কিছিকো তানক্বীদ ছে বালাতর না ছমঝে, কিছি কি জেহনী গোলামী মে মোবতলা না হো।" অর্থঃ আল্লাহ্‌র রাসূল ব্যতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাউকেও মানা যাবে না। রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা যাবে না। রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কারোও জেহেনী গোলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে না। (দছতুরে জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা-৪)

তিনি অন্যত্র বলেন, "সাহাবাদিগকে সত্যের মাপকাঠি জানবেন না এবং সাহাবাদের অনুসরণ করবেন না। রাসূলে খোদা ব্যতীত কেউই সত্যের মানদন্ড বা হকের মাপকাঠি নহেন, কেহই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহেন।" [রাসায়েল ও মাসায়েল- পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯, ৮০]

মওদুদী সাহেব লিখেছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাকলীদ করা, চার মাযহাবসমূহ হতে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসরণ করা নাজায়েয ও গুনাহর কাজ। বরং নাজায়েয ও গুনাহের চেয়েও জঘন্যতম।" [রাসায়েল ও মাসায়েল- পৃষ্ঠা ২৫৩]

অন্যস্থানে তিনি বলেন, " দ্বীন অর্থ রাষ্ট্র। ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয় বরং ইহা হল একটি বিপ্লবী মতবাদ। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ও মুসলমান হচ্ছে বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম। গোটা দুনিয়ার সামাজিক সামগ্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে তাকে পুণঃগঠিত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য, আর মুসলমান হচ্ছে এক আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের নাম।" [তাফহীমাত ও নির্বাচিত রচনাবলী]

জনাব মওদুদীর আরেকটি উক্তি হচ্ছে, "প্রকৃত পক্ষে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও তসবিহ্ তাহলিল হচ্ছে মানুষকে এক বৃহৎ ইবাদতের জন্য যোগ্য করে তোলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র। অর্থাৎ ধর্মীয় আমলের মেরুদন্ড হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। [ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা]

মাওলানা মওদুদী বলেন, "নিষ্পাপ হওয়াটা আসলে নবীদের জন্মগত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আল্লাহ্ তাদেরকে নবূয়াত নামক সু-মহান পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দানের জন্য একটা হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ আল্লাহ্‌র এই হিফাযতমূলক ব্যবস্থাটা যদি ক্ষণিকের জন্যেও তাদের ব্যক্তি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে তেমন নবীদেরও হতে পারে। এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ্ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'টো একটা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে। [নির্বাচিত রচনাবলী]

তাফসীরবিদ মাওলানা মওদুদী লিখেন, "একদিন অপরাহ্নে দাউদ (আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ আলাইহিস্‌সালাম) নিজ প্রাসাদের ছাদে পায়চারী করছিলেন। এই সময় স্নানরত এক পরমা সুন্দরী রমনীর ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। দাউদ খোঁজ নিলেন মহিলাটি কে? জানা গেলো, সে এলিয়ামের কন্যা ও উরিয়াহিত্তার স্ত্রী বাতসাবা। দাউদ বাতসাবাকে ডেকে পাঠালেন এবং রাতে নিজের কাছে রাখলেন। সেই রাতেই সে গর্ভবতী হয়ে গেলো। পরে সে দাউদকে নিজের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানিয়ে দিল। এরপর দাউদ বাতসাবার স্বামী উরিয়াকে উয়াবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উয়াব তখন বনী আমুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলো এবং রাব্বা নগরীকে অবরোধ করে সেখানে অবস্থান করছিল। দাউদ উয়াবকে লিখলেন যে, রণাঙ্গনের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ স্পেনে চলছে, সেখানে উরিয়াকে নিয়োগ কর এবং তারপর তাকে একাকী রেখে সরে যাও, যাতে সে নিহত হয়। উয়াব নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো এবং উরিয়া নিহত হলো। এভাবে উরিয়াকে খতম করার পর দাউদ ঐ মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তার পেট থেকেই হযরত সোলাইমান আলাইহিস্‌সালাম জন্ম গ্রহণ করেন।" মওদুদী সাহেব পরের বাক্যে লিখেছেন, "ঘটনাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা নয়, যেহেতু তিনি মানুষ ছিলেন অতএব মানুষের পক্ষ থেকে এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক।" [নির্বাচিত রচনাবলী]

মডারেট ইসলামী রাজনীতির পুরোধা ইসলামী দার্শনিক মাওলানা মওদুদী বলেন, যতদিন আলেম সমাজ এই উৎস ভিত্তিমূল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং নির্ভূল চিন্তা শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ইজ্‌তিহাদ করে আদর্শিক ও বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধান করেছিলেন, ততদিন ইসলাম যুগের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল। কিন্তু যেদিন থেকে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা পরিহার করা হলো, হাদীসের সত্যানুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেল, নির্বিচারে পূর্ববর্তী তাফসীরকার ও মুহাদ্দিসগণের অন্ধ অনুকরণ শুরু হল, অতীতের ফিক্বাহ শাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের ইজ্‌তিহাদকেই অটল ও চিরস্থায়ী বিধানে পরিণত করা হলো এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ নীতিকে পরিত্যাগ করে বুযুর্গদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটিকেই মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো- সেদিন থেকেই ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেলো। তার সম্মুখ গতির পরিবর্তে পশ্চাদপসারণ শুরু হল। [তানকীহাত, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব।]

যেমন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক হাফিজ ইবনে কাছির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, "হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গণীমতের (সরকারী সম্পদ) সোনা-চাঁদি তার জন্য পৃথক করে রাখার নির্দেশ জারী করলেন।'-(খিলাফত ও মুলুকীয়াত)"

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, 'হযরত হাফিজ ইবনে কাছির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আসলে লিখেছেন, "হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গণীমতের সম্পদগুলোকে বায়তুল মালের সম্পত্তি

হিসেবে পৃথক করে রাখার নির্দেশ জারি করেছিলেন।" এছাড়াও অন্যান্য বিশুদ্ধ ইতিহাসের বক্তব্য, বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বিন্দুমাত্র দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। অথচ মাওলানা মওদুদী কর্তৃক প্রকৃত তথ্যসূত্রের বরাতে এই মিথ্যা প্রচারণা সত্যি হৃদয়-বিদারক। আজ চৌদ্দ'শ বছর পর ইসলামের সঠিক তথ্যানুসন্ধানী একশ্রেণীর গবেষক প্রকৃত ইসলামকে দারুণভাবে কলুষিত করেছেন। তারা ইসলামের মূল ইতিহাসকে কলঙ্কিত মনে করে এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, "হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআন-সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মহীন রাজনীতির গোড়াপত্তন করেছেন।"-(মওদুদী রচনাবলী)

আরেকটি ইতিহাস হচ্ছে, "হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজে তাঁর প্রিয় রাসূলের পিতৃব্য পুত্র ও কলিজার টুকরা ফাতিমার স্বামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন।"-(মওদুদী রচনাবলী) এ ছাড়াও লিপিবদ্ধ হয়েছে, "সকল আঞ্চলিক প্রশাসক এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার নির্দেশেই তারা এটা করতেন।"-(মওদুদী রচনাবলী)

অথচ 'খিলাফত ও মুলুকীয়াত' এবং মওদুদী রচনাবলী'র উক্ত দু'টো বক্তব্য ইসলামের মূল ইতিহাসের স্বপক্ষ-বিপক্ষ কোনো ধরণের বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ নেই। এটা এক প্রকার নগ্ন মিথ্যাচার।

বিশুদ্ধ ইতিহাস থেকে এই প্রতিহিংসার প্রমাণ হচ্ছে যে, "প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী বলেন, হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হবার পর আহলে বাইতের নারী-শিশুদেরও যখন উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন হযরত যয়নবের পরনে সাধারণ লেবাস ছিলো। তাঁকে চেনা যাচ্ছিলো না। বাঁদীরা তখন তাঁর দু'পাশে ছিলো। উবায়দুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলো- "এই মেয়েটি কে?" পরপর তিনবার সে এই প্রশ্ন করলো। কিন্তু তিনি মুখ খুললেন না। অবশেষে এক বাঁদী বললো, "তিনি যয়নব বিনতে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।" উবায়দুল্লাহ্ তখন হর্ষধ্বনিতে বললো, "সেই খোদার প্রশংসা, যিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন, ধ্বংস করেছেন এবং তোমাদের নামের সাথে কলংক মেখে দিয়েছেন।" [সাহাদতে হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] অতএব কোন্ ঘাটের জল দিয়ে কিসের শিরণী পাকানো হয়েছে, সেটা এখন সুস্পষ্ট। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব যে খারিজী চিন্তাধারার ইতিহাস থেকেই ইসলামের মূল বুনিয়াদে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছেন, তা আর অস্বচ্ছ নয়।

আশাকরি প্রকৃত বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে! নাকি আরেকটু স্পষ্ট করে বলবো? এতক্ষণের আলোচনা-পর্যালোচনায় এটাই প্রতিমান হয় যে, মওদুদীবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- ইসলামকে অনুশাসন মেনে গণপূঁজিতান্ত্রিক সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা। আর উদ্দেশ্য, খোমেনী সাহেবের মতো মহাকালের নেতৃত্ব। সে নেতৃত্ব মৃত্যুর আগে হোক অথবা পরে।

এবার বলুন! নিশ্চিত করে বলুন আমি কার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাবো?

এই তো দেখুন না! এক যুগে ইহুদীরা কম্বলের লোম বাছতে গিয়ে সমস্ত কম্বলটাকেই বিনষ্ট করে দিয়েছিল। যেমন- দুনিয়ায় তাওরাতী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই শুরু হলো মাসাআলা

মাসায়েলের বিশুদ্ধতা ও তাফসীর নিয়ে মতানৈক্য। কোন্‌টা সহীহ্ আর কোন্‌টা ভুল, এই ফায়সালা আবিষ্কার করতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত তাওরাতী সমস্ত ইমারতটাই ধ্বসে গেলো। ইতিহাসে বিচরণ করলে দেখা যায়, মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ইহুদীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। ফলে তাওরাত অনুসারীদের উপর আল্লাহ্‌র লানত পতিত হয়। একই অবস্থা খৃষ্টানদের বেলায়ও। সুতরাং আজকে যে আপনারা ইসলামী হুকুমতের মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির গ্যারান্টি দিবেন, সেটা কোন্ ইসলামী দলের মাধ্যমে?

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো।" (সূরা ফাতিহা-৫-৬) এই বাক্যগুলোর ব্যাখ্যায় যদি হাদীসের ভাষায় বলি- "মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী"-দের পথই সরল পথ এবং এই পথ ধরলেই দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাবো। তাহলে বলুন! আজকের যুগে এই পথটির ধারাবাহিকতা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে?

এবার বলুন! ভালো করে চিন্তাভাবনা করে বলুন! পবিত্র কুরআন-হাদীসের একটি বাক্যকেও যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে তবে তার দশা কি হয়? পবিত্র কুরআনে কি সন্দেহকারী সম্পর্কে বলা হয় নাই?

তবুও আপনি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চান? তা কোন্ ইসলাম? এবং কোন্ জাতের হুকুমত?

যে বা যারা বাপ-দাদা ও পূর্বসূরীদের সমালোচনা এবং গালি-গালাজ করে, তারা কি মুসলিম সমাজে সৎ লোকের স্বরূপ? আপনি এদের কথাই বলছেন?

তাহলে বলুন! ভালো করে চিন্তাভাবনা করে বলুন! কোথায় পাবো সেই আলিম! যিনি আমাকে আত্মিক খোরাক দেবেন?

প্রশ্নকারীর এই সকল উক্তি, সমালোচনা, পর্যালোচনা, মাঝেমধ্যে সমাধান ও বক্তব্য শোনে উত্তরদাতা হয়তো বিব্রত হবেন- নয়তো রাগান্বিত হবেন। কারণ- ইসলাম সম্পর্কে এতো কিছু জানার পরও যদি তিনি সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে একজন মুমিনের জন্য রাগান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি একটি উদাহরণ মাত্র। উপরোল্লিখিত আলোচনা, সমালোচনা, প্রশ্ন ও ইসলামের বাহ্যিকতার প্রতি সন্দেহ আজকের বিরাট অংকের মুসলমানের অন্তরেও আঁকুপাঁকু করছে।

পরিশেষে হয়তো উত্তরদাতা একথা বলবেন যে, আল্লাহ্‌কে দেখতে হলে, ফেরেশ্‌তাকে পেতে হলে, আখিরাত বিশ্বাস করতে হলে আপনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করুন এবং নিজকে চেনার চেষ্টা করুন। ইংরেজী দর্শন বাক্য হচ্ছে- নো দাই সেল্ফ, অর্থাৎ নিজকে চেনো। প্রশ্নকারী হয়তো তখন নিজেকে চেনার ব্যাপারে শত শত বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ খাড়া করবেন। মন-মগজ অন্তর-হৃদয় ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যাখ্যায় হয়তো তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডজন ডজন প্রমাণ হাজির করবেন। কিন্তু শরীরের চালিকা শক্তি রূহ্ (বা পশ্চিমা দার্শর্নিকদের মতে মন, যা অস্তিত্বহীন) নামক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় পেতে শেষ পর্যন্ত তিনি চিন্তার সাগরে ডুব দেবেন।

দ্বিতীয় পর্ব

পাঠকমহলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। উপরে বর্ণিত উদাহরণটিকে সংবেদশীল করতে গিয়ে বক্তব্যটা অতিদীর্ঘ হয়ে গেছে। তথ্যানুসন্ধানের দরুণ বিষয়টি তত্ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। “ইসলামের গোড়ায় গলদ” কথাটির শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে “গলদ”-এর কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত বাক্যটিকে যারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যে নিজেরাই ‘গলদ’-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, তা আর বলতে হচ্ছে না। তবে প্রত্যেক মুসলমানের এইটুকু সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, “নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব তোমরাও শয়তানকে শত্রু মনে করো।” একইভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় শয়তান অনেক লোককেই গোমরাহ্ করেছে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করছো না?” অতএব পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানের প্রকৃত এবং নির্ভরযোগ্য ভান্ডার হচ্ছে পবিত্র কুরআন। এ কথাটা যেমন বিশ্বের সকল দার্শনিকেরা জানেন, তেমনি বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, গবেষক, সাহিত্যিক, কবি, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ বলতে গেলে দুনিয়ার সর্বস্তরের বিজ্ঞজনেরাও জ্ঞাত। পবিত্র কুরআনই সকল জ্ঞানের প্রধান উৎস। কিন্তু কুরআন যেহেতু আল্লাহ্‌র কালাম, তাই কুরআনকে অর্থগত ও বিশুদ্ধভাবে বুঝতে হলে আরেকটি তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকর্ম অর্থাৎ হাদীস শরীফ। তাই পবিত্র হাদীস শরীফ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস। অতএব- পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে হাদীস্ শরীফ ছাড়া অন্য পন্থা কিংবা তৃতীয় কোনো উৎস নেই। হাদীস শরীফই হচ্ছে- কুরআনের প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব ইত্যাদি।

সুতরাং যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা কিংবা সমালোচনা করতে হলে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস শরীফকে চোখের সামনে রাখতে হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য এটাই নিয়ম। যেহেতু পবিত্র কুরআন শরীফ নিজেই নিজের সত্যতা এবং নির্ভুলতার গ্যারান্টি দিচ্ছে। তা ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন শরীফ বিশুদ্ধ থাকবে বলেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একইভাবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফও আমাদের কাছে রয়েছে নির্ভুল বলয়ে প্রতিষ্ঠিত।

আরেকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজকের এই উত্তরাধুনিক সভ্যতায় কোনো বিজ্ঞ অমুসলিম কিংবা সন্দেহযুক্ত মুসলিম পন্ডিত যদি পরিপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ পোষণ করেন, তাহলে তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। এটা শর্ত। অন্যান্য ধর্মে ও মতবাদে যেমন দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা রয়েছে, তেমনি ইসলামেও রয়েছে। তবে ইসলামের দর্শন, তাসাউফতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে ভিতরে ঢুকতে হয়। কারণ, ইসলাম শুধুমাত্র দর্শন, তাসাউফতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং অন্তরের ঐকান্তিক বিশ্বাস, মুখে বা কণ্ঠের স্বীকৃতি এবং আমলে বা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করার নামই ইসলাম। বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য ছোট একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন, দর্শন বা চিন্তা-গবেষণার তথ্য ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণ

(যন্ত্র) আবিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ কোনো বিজ্ঞানীই দর্শনের বাইরে অবস্থান করে নতুন যন্ত্র হঠাৎ আবিষ্কার করতে পারেন না। তাই আবিষ্কৃত যন্ত্রটিকে ব্যবহার করেই স্বাদ উপভোগ করা হয়।

কিন্তু ইসলামের বাস্তবতা এর উল্টো। ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার আগে ব্যবহার আরম্ভ করতে হয়। অর্থাৎ মুসলমান হয়ে ইসলামের দর্শন, তাসাউফতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে হয়।

সুতরাং পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে আরেকবার পড়ে নেওয়া দরকার- আওউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মওদুদী মতবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব নিঃসন্দেহে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি বয়সে যেমন বড়, তেমনি জ্ঞান-বিদ্যা-পান্ডিত্য বলতে গেলে আমার চেয়ে হাজার গুণ ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। তিনি যে যুগে ইসলামী ধারায় চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন, তখন আমার জন্মই হয়নি। সুতরাং তাঁর সাথে আমার তুলনাই হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি হয়তো একটি ঝিলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন- ঘোলাটে জলাশয়। অথচ আমি ঐ একই ঝিলের ভেতর দেখতে পাচ্ছি কিছু জলজ প্রাণীও রয়েছে। তবে এটা সত্য যে, আমি মরহুম মাওলানা মওদুদী সাহেবের ব্যক্তিগত ও চরিত্রগত কোনো বিষয়ে মোটেও কুধারণা রাখি না। শুধুমাত্র তাঁর লেখালেখি যতটুকু আমার চোখে পড়েছে, সেইটুকু নিয়েই আলোচনা, পর্যালোচনা কিংবা সমালোচনা করছি মাত্র। আল্লাহ্ আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন।

প্রায় বছর দশেক আগের কথা। পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ ইষ্ট লন্ডন মসজিদে উপস্থিত হলাম। উদ্দেশ্য আছরের নামায আদায় করবো। মসজিদে গিয়ে দেখি ওয়াজ মাহফিল চলছে। খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব বয়ান করছেন। অত্যন্ত আগ্রহভরে ওয়াজ শুনতে বসে গেলাম। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বয়ান করতে গিয়ে তিনি ইসলামী ইতিহাসের একটি ঘটনা বললেন। তিনি গল্পের ভঙ্গিতে বললেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ইহুদী ব্যক্তি বিচার দিলো। বিচারটি একজন নও-মুসলিমের বিরুদ্ধে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই পক্ষের বয়ান শুনে রায় ঘোষণা করলেন। এতে মুসলমান ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারে নব্য মুসলমান ব্যক্তি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি তখন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, ভাই উমর! আমি একটা বিচারের ছানী করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঘটনা কি? লোকটি উত্তরে বললেন, আমি নতুন মুসলমান! সব সময় মুসলমানদের সাথে থাকি। মুসলমানদের ডাকে সাড়া দেই। চাঁদা দান করি। এখন না হয় একটা অন্যায় করেই ফেলেছি! তাই বলে আমার বিচারের রায়টা ইহুদীর পক্ষে চলে যাবে! এটা কি যুক্তিসঙ্গত হলো? আপনিই বলুন! অন্যায় হলেও তো দলীয় দৃষ্টিকোণ এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে আমার পক্ষে রায় হওয়াটা উচিত ছিলো! মুসলমান ব্যক্তির কথাগুলো শুনে, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু বললেন- দাঁড়াও! লোকটিকে বাইরে দাঁড়াতে বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে এসে বললেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট নয়, তাঁর বিচারের ছানী এভাবেই করতে হয়'- বলেই তলোয়ার দিয়ে ব্যক্তিটির ঘাড়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে দেহ থেকে মস্তকটি আলাদা হয়ে পড়লো।"

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তকে যে ব্যক্তি সন্দেহপোষণ করবে, সে সাথে সাথে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর মুরতাদের শাস্তি শিরচ্ছেদ।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র নবী-রাসূল ও মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে বা সন্দেহপোষণ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। কারণ- পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে নবী-রাসূলদের সত্যবাদীতার অনেকগুলো আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে মনোনিত করেন বাণী বাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা হজ্জ আয়াত- ৭৫)

উল্লিখিত আয়াতের শব্দগুলোতেই বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিগণ কখনো ভুল করেন না অর্থাৎ তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে। যেহেতু পবিত্র কুরআন পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। অতএব পবিত্র কুরআনের মতো একটি নির্ভুল ও বিশাল জীবন-ব্যবস্থার আগাগোড়া বর্ণনা যদি কোনো সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির উপর নাযিল করা হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনকেই সন্দেহ করা হয়।

একইভাবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে সত্য, কিন্তু কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব নিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দ। তাঁরা কিন্তু সাধারণ কলেজ-ভার্সিটির শিষ্য বা ছাত্রের মতো ছিলেন না! বরং তাদেরকেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্য হিসেবেই আল্লাহ্‌র পক্ষথেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিলো। অতএব সাহাবাদের দ্বীনি ও ব্যক্তিগত জীবনে সন্দেহ করার অর্থও ইসালামের পুরো ইমারতটাকে সংশয়যুক্ত ধারণা করা। এরকম ধারণাপোষণকারীও মুরতাদ এবং কাফির সাব্যস্ত হবেন।

এখানে 'মুরতাদ' এবং 'কাফির' এই দুটো শব্দ দ্বারা আমি আমার আলোচনায় কাউকে টার্গেট করে দোষী বা ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) হিসেবে উল্লেখ করছি না। বরং কোনো নাগরিক যদি দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিংবা আইন অমান্য করে, তাহলে তাকে দেশদ্রোহী বলা হয়। এরকম অবস্থানকারীকে প্রচলিত বিচারে শাস্তিভোগ করতে হয়। কারণ, দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করার অর্থই দেশকে অমান্য করা। একইভাবে, আল্লাহ্‌র নবী-রাসূল ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করার অর্থও বিরুদ্ধাচরণ। একপ্রকার বিদ্রোহী অবস্থান।

মাওলানা মওদুদী সাহেবও খারিজী, শিয়া এবং বর্তমানের ওয়াহ্হাবী, আহলে হাদীস ও সালাফীদের মতো কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে উক্তি করেছেন, "সাহাবাদিগকে সত্যের মাপকাঠি জানবেন না এবং সাহাবাদের অনুসরণ করবেন না। রাসূলে খোদা ব্যতীত

কেহই সত্যের মানদন্ড বা হকের মাপকাঠি নহেন, কেহই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহেন।" [রাসায়েল ও মাসায়েল- পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯, ৮০]

আলোচনার খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য যদি আমরা মেনে নেই যে, "সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন।" তাহলে প্রশ্ন আসবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আমরা পাবো কোথায়? কে আমাদেরকে এনে দিবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ও নির্ভুল আদর্শ?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ'শ বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর তৈরী করা আদর্শ পেতে হলে ইতিহাসের বাড়িতে গিয়ে ধর্না দিতেই হবে। কিন্তু ইতিহাসের বাড়ির লোকেরা যদি নিম্নোক্ত ঘটনা উল্লেখ করে! যেমন-

"প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী বলেন, হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হবার পর আহলে বাইতের নারী-শিশুদেরও যখন উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন হযরত যয়নবের পরনে সাধারণ লেবাস ছিলো। তাঁকে চেনা যাচ্ছিলো না। বাঁদীরা তখন তাঁর দু'পাশে ছিলো। উবায়দুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলো- "এই মেয়েটি কে?" পরপর তিনবার সে এই প্রশ্ন করলো। কিন্তু তিনি মুখ খুললেন না। অবশেষে এক বাঁদী বললো, "তিনি যয়নব বিনতে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।" উবায়দুল্লাহ্ তখন হর্ষধ্বনিতে বললো, "সেই খোদার প্রশংসা, যিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন, ধ্বংস করেছেন এবং তোমাদের নামের সাথে কলঙ্ক মেখে দিয়েছেন।" এই ঘটনাটির অর্থগত মিথ্যাকে কি সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে? আপনি আমি আমরা সবাই মেনে নেবো? কোন ঈমানদার ব্যক্তি তা মেনে নেবে? পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো মানুষই এ ঘটনার অর্থকে বিশ্বাস করবে না। বরং উবায়দুল্লাহ্ ও তার বংশ-বুনিয়াদই মহাকালের মানুষের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। এটাই সত্য।

অথচ চৌদ্দশ বছর পর হঠাৎ জন্ম নিয়ে কেউ যদি বলে, "ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। এটা যেমন সত্য, ওটাও সত্য ছিলো, তা না হলে লোকেরা বলতো কেনো?" তাহলে এটা ইতিহাস হয়ে যাবে? আর যুগের গবেষকগণও মেনে নেবেন? কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। যদি এরকম বক্তব্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা আছে বলে কেউ ধারণা করে, তাহলে বিষয়টা হাস্যকর হয়ে উঠবে।

উদাহরণস্বরূপ- পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র।" (সূরা মায়িদা, ১৮ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশ) উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ পাঠ করে কেউ যদি ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে আল্লাহর সন্তান তা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি বিষয়টা হাস্যকর হবে না? কিন্তু বক্তব্য তো মিথ্যা নয়!

অতএব ইতিহাস রচিত এবং পুরাতন হলেই কি সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে? সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ব্যাপারে এই রকম মন্তব্য জাতশক্রতা ছাড়া আর কি বলবেন? না কি সত্য বলে মেনে নেবেন? যদি এরকম ধারণা করেন, তাহলে এ কথার অর্থ কি এটা হয় না যে, আহলে বাইত সম্পর্কে উবায়দুল্লাহ্র মন্তব্য সত্য? (নাউযুবিল্লাহ্)

মওদুদী মতবাদের আরেকটি দিক হচ্ছে- প্রতিপক্ষকে অদক্ষ, অক্ষম, অদূরদর্শী ও মিথ্যা প্রমাণ করে নিজের মতবাদকে সহীহ্ বা বিশুদ্ধতা দানের কৌশল। তাই ভারত উপমহাদেশের খ্যাতনামা দু'জন ইসলামী দার্শনিককে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি ছিলেন যুগের সংস্কারক। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীন-ই-এলাহি'র অপপ্রচার বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারত উপমহাদেশে দ্বীন-ই-এলাহি'র কালো অধ্যায়ের কথা এখনো যারা ইতিহাসে পাঠ করেন, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। দ্বীন-ই-এলাহি'র মতো একটি কুফরী ফিৎনা বন্ধ করা চাট্টিখানি কথা ছিলো না। তাই মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে ইসলামী দর্শনের বহুল প্রচার শুরু করেন। যাতে মানুষ অন্তত আত্মিক শক্তির মাধ্যমে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। তাই তিনি তাঁর মকতুবাত গ্রন্থে একটি হাদীস অবলম্বনে উল্লেখ করেন, "যখন ফিতনার সূচনা হবে, যখন বিদআত বিস্তৃতি লাভ করবে এবং সাহাবীদেরকে গালমন্দ দেয়া হবে তখন যারা আলিম তাদের উপর অনিবার্য কর্তব্য হলো বিভ্রান্তদের উপযুক্ত জবাব দেয়া। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এমন ব্যক্তির ফরয ও নফল কোন প্রকারের আমলই কবুল হয় না। (মাকতুবাত পৃষ্ঠা- ২৫১)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সংস্কার আন্দোলন তখনো থেমে থাকে নি। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ভারত উপমহাদেশের সীমানা ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্য তথা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। যেহেতু তখন মুসলিম বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিনে চলে গিয়ে ছিলো। পরের শতাব্দি অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম নেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ভারত উপমহাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে চ্যালেঞ্জ করে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র যোগ্য উত্তরসূরী হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারত যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিনস্থ হয়, তখন তিনি ভারতকে 'দারুল হর্‌ব' ফতোয়া দিয়ে জিহাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর এই জিহাদী আন্দোলনের অব্যাহত ধারাবাহিকতাই ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্'র স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংস্কার আন্দোলনের ধারায় ছিলোঃ ১) আক্বীদার সংশোধন ও কুরআনের প্রতি মানুষকে আহ্বান। ২) হাদীস ও সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। ৩) যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী শরীয়তকে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনরূপে উপস্থাপন। ৪) খোলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফত সম্পর্কে যাবতীয় সংশয় নিরসন এবং ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার আবশ্যকতা প্রমাণ। ৫) সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের কবল থেকে মুসলিম শাসনকে রক্ষাকল্পে জিহাদী ভূমিকা গ্রহণ। ৬) সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে হেদায়াতের প্রতি আহ্বান। ৭) তারবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ভবিষ্যত আন্দোলনের যোগ্য ব্যক্তি গঠন। (সূত্রঃ প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আক্বীদা ও ফিরাকে বাতিলা- মাওলানা আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী)

অথচ ভারত উপমহাদেশের উক্ত দু'জন সংস্কারককে মওদুদী সাহেব এমন ভাবে অবমূল্যায়ন করেছেন, যা সাবাঈ হিংস্রতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি তার রচনাবলীতে লিখেছেন, "সংস্কারের নামে দু'জন মৌলবী (মুজাদ্দিদে আলফেছানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সেই পুরোনো বিষ (তাসাউফতত্ত্ব) মানুষের মুখে আবার ঢেলে দিয়েছেন।" নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য বলে প্রমাণ করতে গিয়ে এই যে প্রোপাগান্ডা কৌশল, তা কিন্তু সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারে না। বরং ঐজাতীয় কৌশলী ব্যক্তিগণকে ইতিহাসের কলঙ্ক নিয়েই মাটির গহ্বরে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু মাওলানা মওদুদী প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' নামক রাজনৈতিক দলটি সেই আগের মতোই ক্ষমতা হাসিলের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এই দলটির রাজনৈতিক তৎপরতা দারুণভাবে সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষ করে কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া একশ্রেণীর রাজনীতি-বিলাসী তরুণ-যুবকের মাঝে এই দলটির কর্মতৎপরতা অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ছাত্রসমাজে জামায়াতে ইসলামী'র গ্রহণযোগ্যতার কারণ

একঃ খারিজীদের মতো সুদূরপ্রসারী চিন্তা-গবেষণার মধ্যদিয়ে পবিত্র কুরআন-হাদীসের দার্শনিকতার প্রত্যাখ্যান।

দুইঃ কুরআন-হাদীসের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা পরিহার।

তিনঃ নবী-রাসূলগণের মর্যাদার অবমূল্যায়ন। (যেমন- সাধারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো ধারণা করা)

চারঃ সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মকান্ডকে প্রত্যাখ্যান এবং মর্যাদাহানি।

পাঁচঃ ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর সীমাবদ্ধতা প্রত্যাখ্যানের সুযোগ সৃষ্টি।

ছয়ঃ দলীয়করণের ভিত্তিতে বিশাল জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা।

প্রথমটির ব্যাখ্যা জনসাধারণের মাঝে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসে কোনো দার্শনিকতা নেই। যা-কিছু আছে, সুস্পষ্ট এবং সরাসরি। অন্যদিকে, কুরআন-হাদীসের দার্শনিক দিক নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে মানুষ অকর্মন্য ও অলস হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে মানুষের মাঝে নিঃষ্ক্রয়তা ও সংসারবিরাগী ভাব জন্ম নেয়। ফলে আধুনিকতার আমদানী, দেশ ও জাতির উন্নয়নে অনাগ্রহ এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় কারণের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, তথাকথিত ফকীহ্ ও আলিম-উলামা কুরআন-হাদীসের প্রকৃত অর্থ না বুঝার কারণে অতিভক্তির মাধ্যমে অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। বিশেষ পরিবেশ ছাড়া কুরআন-হাদীস অধ্যয়ণ, সাধারণ শিক্ষিতের দ্বারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না-জায়েয ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে মুসলিম সমাজকে কুরআন-হাদীস থেকে অনেক দূরে রেখেছেন। ফলে, সাধারণ শিক্ষিতরা কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান খুঁজতে ভয় পায়। এমনকি কাঠমোল্লাদের অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতার

কারণে মানুষ কুরআন-হাদীস থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। তারা নিজেরা কুরআন-হাদীসের ভাষা বুঝে না বলে অন্যকেও শিখতে দেয় না। অতএব কুরআন-হাদীসকে সহজবোধ্য ও বহুল প্রচারের ভিত্তিতে অনেক নির্দেশ এবং মাসআলার অস্বীকার করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণের ব্যাখ্যায় তাদের ধারণা যে, নবী-রাসূলগণ নিঃসন্দেহে সাধারণ দশজন মানুষের মতো মানুষ ছিলেন। তাদেরকে দুনিয়ার মানুষের নেতৃত্ব দান করা হয়েছিলো মাত্র। সুতরাং তাদের জ্ঞান-বিদ্যা ও ঐশী শক্তির মূল্যায়ণই প্রয়োজন। বাদবাকী তো সাধারণ মানুষ। অতএব তাদেরকে এতো মর্যাদা দান করা হলে তারা তো খোদা হয়ে যাবেন!

চতুর্থ কারণের ব্যাখ্যায় তারা মনে করেন, মানুষ মাত্রেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আগের যুগের মানুষের ভুলের কারণেই আজ পৃথিবীতে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। সুতরাং উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যাত না হলে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করেও পৃথিবীতে ইসলামী শাসন কায়েম করা যাবে না। অন্যদিকে, পূর্বসূরীদের তৈরী করা সিদ্ধান্তগুলোকে যুগের চাহিদা পূরণে অচল প্রমাণ করতে না পারলে নতুন যুগের সূচনা সম্ভব নয়।

পঞ্চম কারণের ব্যাখ্যাটা এভাবেই করা হয় যে, মাযহাবের অনুসরণ করা গোনাহের কাজ। অর্থাৎ মাযহাবপন্থী সব মানুষই গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত রয়েছেন। প্রথম ও মধ্যযুগের আলিম-উলামারা মাযহাবের গন্ডিসীমা তৈরী করে মুসলমানদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পথ রুদ্ধ করেছেন। অতএব- মাযহাব কিংবা অন্যকোনো ব্যক্তির অন্ধ-অনুসরণ না করে, সরাসরি কুরআন-হাদীস অনুসরণ করাই শ্রেয়।

ষষ্ঠ কারণের ব্যাখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত কৌশলের মাধ্যমে করা হয়। যার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলের একেবারে সাধারণ কর্মীরাও অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অর্থাৎ কর্মীদের আক্বিদা এমন ভাবে গঠন করতে হবে, যাতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, সমাজে একমাত্র 'মওদুদী মতবাদপন্থী' ছাড়া আর কেউই 'খাঁটি মুসলমান' নন। এই চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি সতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফলে গত অর্ধ শতাব্দিকালের ব্যবদানে দেখা গেছে মওদুদী পন্থীদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি সবই প্রচলিত সমাজ থেকে পৃথক সংস্কৃতিতে গড়ে উঠছে। এমনকি সরকারী ও বেসরকারী বলতে গেলে সমাজের প্রতিটি সেক্টরে পৃথক কর্মকর্তা এবং কর্মীও তৈরি করা হচ্ছে।

এই সকল মূলমন্ত্রকে সামনে নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর উভ্যুদয়। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও কৌশলের মাধ্যমে তারা পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদানিং তাদের হস্তগত হয়েছে বিরাট শক্তিশালী তিনটি হাতিয়ার। একটি হচ্ছে, মওদুদী মতবাদ। এটা হচ্ছে- জামায়াতে ইসলামী দলের রাজনৈতিক বুনিয়াদ বা মূল অবকাটামো। যদিও আজকাল তারা মওদুদী মতবাদকে তাদের দলীয়করণ থেকে দূরে রাখছেন বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পুরোটাই মওদুদীবাদে বিশ্বাসী।

দ্বিতীয় হাতিয়ারটি হচ্ছে, আহলে হাদীস, সালাফী মুভমেন্ট ও ওয়াহ্‌হাবী তৎপরতা। যাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে- ফিক্‌হী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দলীয় স্বার্থ রক্ষা ও নতুন নতুন

মাসআলা-মাসায়েল তৈরী করার কাজে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলোর ফরেন অফিসের লেবেল লাগিয়ে ইরানী ও আহ্‌লে হাদীস এবং সালাফীদের দ্বারা পরিচালিত সৌদী শিয়াদের আর্থিক সহযোগিতা।

এই অর্থ সাহায্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক দৈন্যদশা ও রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই তিনটি হাতিয়ার অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বিদেশী অর্থ সাহায্য পেয়ে জামায়াতে ইসলামী ইদানিং বাংলাদেশের গরীব-দুস্থ মানুষের দোরগোড়ায় উপস্থিত।

মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রসঙ্গ

মওদুদী মতবাদকে দেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ সমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের লক্ষ্যে মিথ্যার উপর সত্যের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। যেমন, বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর একটি গ্রন্থ বাজারে এসেছে। পুস্তকখানির নাম "আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি"। পুস্তকখানার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা- এটা কোনো গোপন বিষয় নয়। পক্ষান্তরে তাঁকে ইমাম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে বা মানতে হবে, অথবা তাঁর যে কোনো মতামতকেই প্রাধান্য দিতে হবে, তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনাকে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে, এমন কোনো কথা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নেই। বরং কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই যে জামায়াতে ইসলামীর মূল উদ্দেশ্য- এ কথাই জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, ভূমিকা অধ্যায়)

সাঈদী সাহেবের এই উক্তির সাথে আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলো প্রমাণ করে যে, মূল বিষয়টাকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় মওদুদী মতবাদের রাজনৈতিক দলের কর্ম তৎপরতা এবং প্রতিষ্ঠাতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মওদুদী মতবাদের সকল আদর্শ মানেই জামায়াতে ইসলামী। যেহেতু তিনি ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা আমীর। তার লেখালেখি, চিন্তা-গবেষণা ও আদর্শকে কেন্দ্রকরেই জামায়াতে ইসলামী'র জন্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, শরীর যেখানে- মুখ মস্তক হাত পা নাড়ীভুড়িও সেখানে। একটা আরেকটার সাথে জড়িত এবং সবগুলো মিলেই শরীর। অতএব, মাওলানা মওদুদী মানেই জামায়াতে ইসলামী। কেউ যদি সহস্র-কোটি বার একথা বলেন যে, জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটি মাওলানা মওদুদী সাহেবের আদর্শের ভিত্তিতে নয়, তাহলে এটা ধোঁকা, অপব্যাখ্যা এবং মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রখ্যাত আলিম মাওলানা সাঈদী লিখেছেন, "যারা বদর, খন্দক, ইয়ারমুক, হুনাইন ইত্যাদী রণক্ষেত্রে পরস্পরে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধীদের সাথে নিজের

প্রাণবাজি রেখে একদিন যুদ্ধ করেছিলো, কালের আবর্তনে ষড়যন্ত্রকারীদের কূটকৌশলে তাঁরাই পরস্পরের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠলো। যাদের ষড়যন্ত্রে সাহাবায়ে কেরামদের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ফাটল ধরলো, এক ভাইয়ের হাত অন্য ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হলো, তারাই আবার সাধু সেজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনায় কোমর বেঁধে নেমে পড়লো।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি পৃষ্ঠা-১৩৮)

জনাব সাঈদী অন্যত্র লিখেছেন, "মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং উচ্চ পর্যায়ের গবেষক ও মুজতাহিদ ছিলেন।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি পৃষ্ঠা-২০২)

উক্ত বাক্যগুলো থেকে দু'টো সত্য প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের দ্বিতীয় যুগে ষড়যন্ত্রকারীরা সাধু সেজে ইসলামের ইতিহাস রচনা করেছিলো। আর মাওলানা সাঈদীর স্বীকৃতি হচ্ছে, মাওলানা মওদুদী সাহেব একজন 'গবেষক' ও 'মুজতাহিদ' ছিলেন। এখন প্রশ্ন আসে- গবেষক এবং মুজতাহিদ কাকে বলে? (গবেষক ও মুজতাহিদ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা হবে)

উক্ত বাক্যগুলো থেকে আরেকটি প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয় যে, কোনো সত্যাশ্রয়ী মুজতাহিদের কাছে যদি ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে, তাহলে তিনি তার গবেষণাকর্মে এগুলো স্থান দেন কেনো? অথবা ষড়যন্ত্রকারী রচিত ইতিহাস থেকে চৌদ্দশ' বছর পর উদাহরণ টানেন কেনো?

যেকোনো একজন পাঠকও যদি বিষয়টা উপলব্ধি করেন, তাহলে উত্তরটা স্পষ্ট। অর্থাৎ 'ডাল-মে কুচ কালা হে।'

সেই কালো ডালের খবরও ইদানিং স্বচ্ছ সলিলের মতো সমাজে ঢেউ খেলছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের মর্মবাণী এটাই যে, কোনো উম্মত যদি ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুকরণ-অনুসরণ করে তাহলে হাশরের বিচারের দিন সে ওদেরই দলভূক্ত বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইসব ব্যক্তিদেরকে উম্মত বলে গণ্য করবেন না।

অথচ বিজ্ঞ গবেষক মাওলানা মওদুদী সাহেব পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতে গিয়ে বাইবেলের অনুসরণ করেছেন বলে বাংলা অনুবাদক জনাব আব্দুল মান্নান তালিব স্বীকার করেছেন। অনুবাদকের বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, "তাফহীমের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যথোপযুক্ত ও সহায়ক ব্যবহার। প্রাচীন তাফসীরকারদের কেউ কেউ কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যত্রতত্র ব্যবহার করে অযথা বিড়ম্বনা ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে তাফহীমে বাইবেলের ব্যবহার যথেষ্ট সংযত ও যুক্তিগ্রাহ্য। আর আমাদের জীবনে যে বিষয়টির কোনো প্রায়োগিক গুরুত্ব নেই তেমন কোনো বিষয় নিয়ে অযথা শাব্দিক ও তাত্বিক গবেষণায় তাফহীমে কালক্ষেপন করা হয়নি।" (তাফহীমুল কুরআন **১**ম খন্ড অনুবাদকের কথা- দ্রষ্টব্য)

উক্ত বন্ধনীযুক্ত বক্তব্যে তিনটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। একঃ বিশাল আকারের কোনো গ্রন্থের তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের চেয়ে অনুবাদকের বেশি জানা থাকে। যেহেতু প্রত্যেকটি

বাক্যকে ভালোকরে অনুধাবন করেই অনুবাদ করেন। সুতরাং তিনি হচ্ছেন মূল লেখকের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব।

দুইঃ বাইবেলের যথোপযুক্ত ও সহায়ক ব্যবহার।

তিনঃ কুরআনের ব্যাখ্যায় প্রায়োগিক গুরুত্ববহনকারী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাকীগুলো ছাড় দিয়েছেন।

অতএব আমরা যদি উল্লিখিত দুই এবং তিন নম্বরের আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করি, তাহলে দেখা যাবে, মওদুদী সাহেবের সমস্ত গবেষণাটি ভ্রান্ততায় পর্যবশিত হচ্ছে। কারণ, মাওলানা সাঈদী সাহেব মাঝে মধ্যে ওয়াজ মাহফিলের ভাষণে উদাহরণ দেন যে, “রান্না করা তরকারীর ডেগে যদি কেউ একফোঁটা কেরোসিন ঢেলে দেয়, তবে যথেষ্ট।”

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, “ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।” (সূরা মায়িদা আয়াত- ৪৭) একইভাবে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, “আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।” (সূরা বাকারা আয়াত-১৪৬)

হাদীস শরীফে এসেছে, “হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিরূপে প্রশ্ন করো? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কুরআন শরীফ বিদ্যমান, যা সমস্ত কিতাবের চাইতে আল্লাহর নিকটবর্তী, তোমরা তা পাঠ করছো এবং তা সম্পূর্ণ খাঁটি, যাতে কোনো মিশ্রণ নাই।” (বুখারী)

উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণ- অনুকরণ হারাম।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতের ভাবার্থেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্বও আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজের কাছে রেখেছেন। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত জীবনকর্মই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর। (সূরা কিয়ামাহ্ ১৬-১৯ আয়াতের ভাবার্থ অনুসরণে)

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা যেখানে হাদীস শরীফ রূপে আমাদের কাছে রক্ষিত, সেখানে বাইবেলের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, অতীতের আহলে কিতাবীরা সত্য গোপন করেছে। সুতরাং তাদের (ইহুদী-নাসারাদের) ফর্মুলা বা নিয়মনীতি অনুসরণ করে তাফহীমের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন-হাদীসের সত্যকে গোপন করার বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রয়াস!

যেহেতু আল্লামা তকী উসমানী রচিত “ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু” গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, মাওলানা মওদুদী তাঁর ‘খিলাফত ও মুলুকিয়াত’ গ্রন্থে অসত্য বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু অসত্য বক্তব্যই নয়, জঘন্য অপরাধজনিত তথ্য দিয়েছেন, যা কল্পনা করাও কষ্টকর। যেমন, ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ নামক ইতিহাস গ্রন্থের তথ্যসূত্র

উল্লেখ করে নিজের মনগড়া বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, "খিলাফত ও মুলুকিয়াত গ্রন্থে লিখা হয়েছে, 'সে (হযরত যিয়াদ) খুতবায় হযরত আলীকে গালি দিতো আর তিনি (হাজার বিন আদি) উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতেন।' তথ্যসূত্র- তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯০" এদিকে মাওলানা তকী উসমানী লিখেছেন, "অথচ মাওলানার (মওদুদী সাহেব) দেয়া কোন বরাত গ্রন্থেই এ কথা নেই যে, যিয়াদ হযরত আলীকে গালি দিতো।

এবার তাবারীর বক্তব্য দেখুন- 'তিনি উসমান এবং তাঁর অনুগামীদের প্রসংগ টেনে তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের প্রসংগ টেনে তাদের অভিসম্পাত দিলেন। তখনই হাজার (হাজার বিন আদি) দাঁড়িয়ে গেলেন। তথ্যসূত্র-তাবারী খঃ ৪ পৃঃ ১৯০।"

একইভাবে, হযরত শামছুল হক ফরীদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত "ভুল সংশোধন" গ্রন্থেও একটি প্রমাণ রয়েছে। মাওলানা মওদুদী সাহেব একটি সহীহ্ হাদীসের বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে নিজের বক্তব্য শক্তিশালী করার প্রয়াস খুঁজেছেন। যে হাদীসটি সম্পর্কে শিয়া মতবাদ প্রসংগে আমরা আলোচনা করেছি।

অতএব, মাওলানা সাঈদীর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে একটি কাহিনী বলা প্রয়োজন। বৃটেনের টেলিভিশন ও ফিল্মী পর্দায় সর্বদা বহুল প্রচারিত ছবিগুলো হচ্ছে, 'হরার মুভি' অর্থাৎ 'ভৌতিক ছবি'। এইসব ফিল্মের মূল কর্মকান্ড হলো- একজন 'ভূত' মানুষের রূপধারণ করে চলাফেরা করে। বিশেষ করে, নাইটক্লাব কিংবা রাতের আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়। যুবক-যুবতীদের পাশে গিয়ে বসে। বন্ধুত্ব গড়ে তুলে। এক সময় কোলাকুলি করার বাহানায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যুবক কিংবা যুবতীর ঘাড়ের পার্শে চুমু দেয়। আর সাথে সাথে ঐ যুবক কিংবা যুবতী অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকেরা জড়ো হলে ভূত মানুষটি ভ্যানিস হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন যুবক বা যুবতীর জ্ঞান ফিরে তখন সে ঐ ভূতকে খুঁজতে থাকে। ধীরে ধীরে ক্লাবের ভিতরের প্রসাধনী রুমে ঢুকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ঐ চিহ্নের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ নিজের চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখে ভিন্ন চিত্র। তার নিজের অবয়বে ঐ ভূতটির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। অর্থাৎ সেও ভূতের দলভূক্ত হয়ে যায়।

আজকের পৃথিবীর যতো বড় রাজনীতিবিদ হোন, যদি বলেন যে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্লেটো ছিলেন না। তাহলে লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেই প্রত্যাখ্যান করবে। যেহেতু সত্য এটাই যে, গণতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ছিলেন দার্শনিক প্লেটো। হ্যাঁ, এটা যুক্তিযুক্ত যে, তিন সহস্রাধিক বছরের চিন্তা-গবেষণায় গণতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল দাবী বা শব্দগত অর্থ যে, জনগণের সিদ্ধান্ত এবং দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ, সেকথা কেউ পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

একইভাবে, মওদুদীবাদকে আজকের জামায়াতে ইসলামী নেতারা জামাতের আদর্শের ভিত্তি নয় বলে দাবী করেন। সাঈদী সাহেবও এই কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, মওদুদী সাহেবের শেখানো বুলি দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতাগণ কর্তৃক রাজনৈতিক মাঠে ভাষণ দেওয়া হয় কেনো?

উদাহরণস্বরূপ, “পাকিস্তানের মাওলানা সাইয়িদ ওছী মাযহার নদভী ১৯৭১ সালে জামায়াতের ইসলামী দলের কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বহিষ্কৃত হয়ে যান। এরপর তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাসনামলে ফেডারেল মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। তিনি জামায়াতের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, ১৯৭১ সালের কোনো এক সময় মাওলানা মওদুদী জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় বিশেষভাবে আগমন করেন। ‘বিশেষভাবে’ এ জন্যে যে, সে সময় তিনি না জামায়াতের আমীর ছিলেন, না শূরার সদস্য। কারণ, কিছু দিন পূর্বে তিনি ‘আমীর’ পদটি মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদকে সমর্পন করেছিলেন। এরপর এ পর্যন্ত কোনো নতুন নির্বাচনও হয়নি। এই সভায় মাওলানা নিজের এই চুড়ান্ত মত পেশ করেন যে, সত্তুরের নির্বাচনের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের বিকল্প পথ অবলম্বন করার চিন্তা করা উচিত। এতে মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদসহ শূরার অনেক সদস্য বিশেষতঃ যুবকরা ‘নির্বাচনী’ কর্মপদ্ধতি’র পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ দিতে শুরু করেন। তখন সামান্য কথাবার্তা ও বিতর্কের পর মাওলানা বিরক্ত এবং কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘এসব যুক্তিপ্রমাণ তো আমিই আপনাদেরকে শিখিয়ে ছিলাম। এতদসত্ত্বেও এখন আমি যে ফলশ্রুতিতে পৌঁছে গেছি, তা আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে আমি নিজের কর্তব্য পালন করেছি।” এই কথাগুলো বলে মাওলানা মওদুদী সাহেব হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। এর পর মাওলানা মওদুদী সাহেব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী দলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ রেখেছেন বলে জানা যায়। (তথ্যসূত্রঃ চেরাগে মুহাম্মদ (সাঃ) পৃষ্ঠা- ৫৫৮)

মওদুদী সাহেবের তুলনায় জামায়াতের নতুন নেতা মাওলানা সাঈদী সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, “তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৩১ জন দেশ বরেণ্য সুযোগ্য আলেমেদ্বীন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি হিসাবে ২২ দফার ওপর লিখিতভাবে একমত হয়েছিলেন। তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তানের ৩১ জন উচ্চ স্তরের আলেমদের তালিকায় আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা আতহার আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সারছীনার পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের নামও রয়েছে। উল্লেখিত বিষয়টি এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে ইসলামের উল্লেখিত মূলনীতিতে হক্কানী ওলামা-মাশায়েখদের ঐকমত্য রয়েছে।” (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, পৃষ্ঠা-২০০)

দুঃখজনক সত্য হলো, মাওলানা সাঈদী সাহেব উক্ত বক্তব্যের কোথাও একথা উল্লেখ করেন নি যে, উপরোল্লিখিত উলামা-মাশায়েখদের মধ্যে একমাত্র মওদুদী সাহেব ছাড়া বাদবাকী সবাই দল ত্যাগ করেছিলেন। এটাও সত্য যে, তারা কেবল নিরবে দল ত্যাগ করেন নি। বরং মাওলানা মওদুদী সাহেবের ভুল আক্বিদাগুলোকে সংশোধন করার জন্য ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব

দিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন সময় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ সময়সীমাও নির্ধারণ করে ছিলেন, যাতে মওদুদী সাহেব তার আক্বিদাগুলো সংশোধন করার সুযোগ পান। কিন্তু তিনি তা করেন নি। ফলে উলামা-মাশায়েখগণ জনসমক্ষে বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত করে গেছেন। বই-পুস্তক রচনা করে উপমহাদেশের সাধারণ জনগণকে মওদুদী মতবাদ থেকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, মাওলানা মনজুর নোমানী রচিতঃ 'মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্য্যের ইতিবৃত্ত ও বর্তমানে আমার ভূমিকা'। মাওলানা মনজুর নোমানী ঐ ব্যক্তি, যিনি ১৯৪২ সালের সেই আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদুদী সাহেবকে জামায়াতে ইসলামী দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মাওলানা মনজুর নোমানী যখন জামায়াতে ইসলামীর আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি দল থেকে ইস্তফা দেন।

মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামায়াতে ইসলামী দল থেকে ইস্তফা দিয়ে মওদুদী মতবাদ সম্পর্কে অনেক লেখালেখি করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "উলামায়ে দ্বীন সম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর যে সকল চিন্তাধারা পেশ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে কোনো বিশেষ চিন্তাশীল মহলের বিশেষত্ব জানা যায় না। কিন্তু সত্য এই যে, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনীর প্রতি তিনি আজীবন বিষোদগার করেছেন। মওদুদী সাহেব লিখেছেন, স্বাধীনতার পরোয়ানা নিয়ে যে 'মওলভী সাহেব' (মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনীর) পেশোয়ার থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত মাস কন্টেক্ট (জন সংযোগ) প্রচার করে ফিরছেন, এই পরোয়ানা আপনাকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয় যে, আপনার দাড়ি অবশ্যই জোরপূর্বক মুন্ডন করা হবে না, না আপনার আবা (আরব দেশীয় পোশাক) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং না আপনার তসবীহ ছিনিয়ে নেয়া হবে। তবে এ বিষয়ের গ্যারান্টি নেই যে, আপনার বংশ থেকে দ্বিতীয় পুরুষে কোনো উদয়শংকর এবং তৃতীয় পুরুষে কোনো দেবীকারানীর উদ্ভব হবে না।" (তরজমানুল কুরআন ১৩৫৭ হিঃ)

এখন এ পৃথিবীতে না হোসাইন আহমদ মদনী আছেন, না মওদুদী। তার ভবিষ্যৎ বাণীর পর অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সত্য জগৎবাসীর সম্মুখে রয়েছে যে, হোসাইন আহমদ মদনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষে না কোনো উদয়শংকর আর না কোনো দেবীকারানী জন্ম নিয়েছে। বরং মদনী পরিবারে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, হাফিজ, ক্বারী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ইত্যাদি ইসলামের বিশুদ্ধ খেদমতগার জন্ম নিয়েছেন এবং দ্বীনের দায়িত্ব পালন করছেন। অধমের জানামতে এই পরিবারে ডজনেরও বেশি মহিলা হাফিজ, ক্বারী ও ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিতাগণ রয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, মওদুদী সাহেবের সন্তানদের এবং তার দলের যে অবস্থা, তা সকলের জানা। তার সন্তানরা তো ধিকৃত। মওদুদী সাহবেরে গদি এবং দল সেই লোকদের দখলে, যাদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আজ সারা বিশ্ব ওয়াকিফহাল।" (মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী কী আপবীতী, ২৯৮-৩০০ পৃষ্ঠা)

মওদুদী মতবাদ সম্পর্কে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, "এই

সব অভিজ্ঞতার সমষ্টি দ্বারা তাঁহার সম্পর্কে আমার যে সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা আমি অবিকলভাবে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। পূর্বেকার লেখাসমূহ যদি আমার এই নূতন লেখার অনুরোপ দেখা যায় তবে তো ঠিকই থাকিবে। আর যদি পূর্বের কোন লেখা আমার এই নূতন লেখার ব্যতিক্রম হয় তবে পূর্বের লেখা মনসূখ- পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এখন হইতে আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমাত্র নিম্নে বর্ণিত লেখাকেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করিতে হইবে। মাওলানা মওদুদীর রচনাবলী বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে এবং এই বিষয়ে তাহাদের উপকার হইয়াছে। শুধু এতটুকু কথাই আমি বলিয়াছি- আমার এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া যদি কেহ বলে যে, আমি মওদুদী সাহেবের ঐসব মতামতের সমর্থনকারী যাহা তিনি পূর্বাপর ওলামা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিয়াছেন, তবে তাহা একেবারেই ভুল এবং অবান্তর কথা হইবে।

যদিও জামায়াতের গঠনতন্ত্রে মাওলানা মওদুদী সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামী ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত এবং আইন-কানুনের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদুদীর উপর যাহা প্রয়োগ করা যায়, তাহা জামায়াতে ইসলামীর উপর প্রযোজ্য হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদুদীর ভিত্তি এবং প্রোগ্রামও বানাইয়া রাখিয়াছে। তদুপরি প্রতি ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহারা ঐ সব রচনার বিরোধিতা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা মওদুদী সাহেবের ঐসব মতবাদ রচনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। যদি কেহ সত্যই এইরূপ হন যে, ঐ ধরনের বিষয়েও মওদুদী সাহেবের বিরোধী হন এবং আহলে সুন্নত আলেম সম্প্রদায়ের মতামতকে তাহার বিরুদ্ধে সঠিক সত্য গণ্য করেন, তবে তাঁহার উপর অভিযোগ আসিবে না।

নামায সম্পর্কে মাসআলা এই যে, ইমাম এইরূপ ব্যক্তিকে বানানো উচিত যে আহলে সুন্নতের অনুসারী হয়। অতএব যাহারা মওদুদী সাহেবের ঐসব বিষয়ের সঙ্গে একমত হয় তাহাকে স্বেচ্ছায় ইমাম বানানো জায়েয নহে।" (বান্দা, মুহাম্মদ শফী - ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৯৫ হিজরী) [বুখারী বাংলা তরজমা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রচিত ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১৫-৩১৭]

একইভাবে মাওলানা শাসছুল হক ফরীদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "ভুল সংশোধন" নামক পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী জামায়াতের মূলনীতিতে এই ঘোষণা দিয়া না দিবেন যে, 'আমরা মওদুদী সাহেবের ঐ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি' তাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হইবে না। যাহারা সাহাবায়ে কেরামদের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হউন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়েয হইবে না।" (ভুল সংশোধন. পৃষ্ঠা- ১২৪)

বর্তমান বাংলাদেশের জন্য মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন জাতীয় সম্পদ। আরেকজন মাওলানা সাঈদী হয়তো বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন তৈরী করতে পারবে না। সাঈদী'র মতো তুখোড় বক্তা ও বিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম আজকের বাংলাদেশে বিরল। তিনি

জামায়াতে ইসলামী দল করেন, এতে মোটেও আপত্তি নেই। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু দলীয় স্বার্থে সত্যকে ঢাকা দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। মাওলানা সাঈদী রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ খৃষ্টাব্দে। অথচ উল্লিখিত উলামা-মাশায়েখগণ 'জামায়াতে ইসলামী' জন্ম নেওয়ার পরের বৎসর থেকেই দলটি ত্যাগ করতে শুরু করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন। মওদুদী সাহেবের ঔদ্ধত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো পরিমার্জন, পরিবর্তন করার অনুরোধ জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বই-পুস্তক রচনা করে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু মাওলানা সাঈদী সাহেব একজন বিচক্ষণ আলিম হয়েও কিভাবে জামায়াতে ইসলামী'র কীর্তিকান্ডকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটাই বুঝে আসে না।

মাওলানা সাঈদী লিখেছেন, "অপরদিকে কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলকর্তৃক গৃহিত ইসলামী জীবন দর্শনই যে মানব জাতির একমাত্র শেষ অবলম্বন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের একমাত্র অপরিহার্য ব্যবস্থা, এ বিষয়টিও তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সর্বাধিক যোগ্যতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্তৃক প্রভাবিত মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর মানস জগতে ইসলাম সম্পর্কে যে অজ্ঞতা বাসা বেঁধেছিলো, মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ক্ষুরধার লেখনী সে অজ্ঞতার জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। মুসলিম মিল্লাতের একজন হিসাবে দাবি করেও যাদের ধারণা ছিলো, বর্তমানে বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে কোরআন-সুন্নাহ্ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। ধনতাত্মিক অর্থ ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মোকাবেলায় তৃতীয় কোনো অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলাম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। পাশ্চাত্যের এসব মানস সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে এসব অমূলক ধারণা মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমেই বিদূরিত হয়েছে।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, পৃষ্ঠা-২০১)

সম্মানিত মাওলানা সাঈদী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রথমাংশটি প্রকৃত অর্থেই প্রশ্নবোধক। যেহেতু- মওদুদী সাহেব স্বয়ং লিখেছেন, "হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজে তাঁর প্রিয় রাসূলের পিতৃব্য পুত্র ও কলিজার টুকরা ফাতিমার স্বামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র বিরুদ্ধে গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিতেন।"-(মওদুদী রচনাবলী, সূত্রঃ ইসলাম ও মওদূদীবাদের সংঘাত)

এ ছাড়াও, "সকল আঞ্চলিক প্রশাসক এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার নির্দেশেই তারা এটা করতেন।"-(মওদুদী রচনাবলী, সূত্রঃ ইসলাম ও মওদূদীবাদের সংঘাত)

কোনো মাওলানা কিংবা আলিম ব্যক্তি যদি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যের মতো ডাহা মিথ্যা রচনা করেন, তাহলে মিথ্যা জিনিষটিও লজ্জা পাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাওলানা সাঈদী সাহেব একবার লন্ডনের একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "বাংলাদেশী মুসলমান ছেলেমেয়েদের ইদানিংকার চলাফেরা দেখে শয়তানও হতভম্ব হয়। শয়তানও মনে মনে চিন্তা করে যে, আমি তো শয়তান! কিন্তু এরা তো দেখি আমার চেয়েও নিচে নেমে গেছে!" অতএব মওদুদী সাহেব সম্পর্কে মাওলানা সাঈদী'র এই গা-বাঁচানো নীতি সত্যি

দুঃখজনক।

আজ চৌদ্দশ' বছর হয়ে গেছে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। পৃথিবীতে অনেক আমুল পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংসারিক এমনকি পৃথিবীর মানবসভ্যতা পর্যন্ত উলটপালট হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, ইসলামের সহীহ্ ইতিহাস এখনো মুমিনদের কাছে বিশুদ্ধ ভাবে বিদ্যমান। এখনো সাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যায়। আকাশের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র যেমন সত্যই উদিত হচ্ছে, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের উজ্জ্বল জীবনাদর্শের ইতিহাসও মানুষের কাছে বিশুদ্ধভাবে রয়েছে। তবে এটা সত্য যে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণকারী একদল সাবাঈ বংশধারার লোক হরহামেশাই পৃথিবীতে ছিলো, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর প্রমাণ অবশ্য উপরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

মাওলানা সাঈদী লিখেছেন, "মুসলিম মিল্লাতের একজন হিসাবে দাবি করেও যাদের ধারণা ছিলো, বর্তমানে বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে কোরআন-সুন্নাহ্ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। ধনতাত্ত্বিক অর্থ ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মোকাবেলায় তৃতীয় কোনো অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলাম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। পাশ্চাত্যের এসব মানস সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে এসব অমূলক ধারণা মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমেই বিদূরিত হয়েছে।" (আমি কেনো জামায়াতে ইসলামী করি, পৃষ্ঠা - ২০১)

অবিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম মাওলানা সাঈদী সাহেব, 'মুসলিম মিল্লাতের একজন হিসাবে দাবি করেও যাদের ধারণা ছিলো,- এই বাক্যগুলো দিয়ে কার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন? যেহেতু প্যারাটির শেষ বাক্যগুলোতে তিনি- 'পাশ্চাত্যের এসব মানস সন্তানদের' কথা উল্লেখ করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিম মিল্লাতের এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কারা? তিনি কি কোনো আলিম বা উলামায়ে কেরামের প্রতি ইশারা করে মনের জ্বালা নিবারণ করেছেন?

মাওলানা সাঈদী সাহেব যদি পশ্চিমা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বলে কোনো আলিম-উলামাকে উদ্দেশ্য করেন, তাহলে তো এটা স্পষ্ট যে, উল্লিখিত প্রসঙ্গে কেবল ইমাম চতুষ্টয়কেই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। কারণ পৃথিবীর ধনতাত্ত্বিক অর্থ ব্যবস্থা, আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলামের ইমামগণই শরীয়তী সীমাবদ্ধতা তৈরী করেছেন। যাতে মুসলিম মানস ধনতন্ত্রের গহ্বরে ডুবে নিজেকে ধ্বংস না করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে কোনো মুসলমান যাতে তলিয়ে না যায়। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার খপ্পরে পড়ে মুসলিম যাতে সূদী ব্যবসার দ্বারা নিজের আখিরাত ধ্বংস না করে।

সাধারণ মুসলমানদের জন্য মুজতাহিদগণের ইজদিহাদী সীমাবদ্ধতা তো খারাপ হবার কথা নয়। কিংবা অতীতের কোনো আলিম-উলামাও মাযহাবী ইমামগণের শরয়ী আইনগুলোকে উম্মাহ্র জন্য অকল্যাণকর বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। তাহলে আজ এই অঙ্গুলির ইশারা কেনো?

আসল ব্যাপারটা আমরা ঠিকই বুঝতে পারি। অতীতকে প্রত্যাখ্যান না করলে বর্তমানের

সূচনা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ- "-এসব বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এজন্য কুরআনের আয়াতের শাব্দিক ও অর্থগত প্রতিপাদ্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা ও কর্মের গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এ ধরনের বিদ্যাবত্তা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন তিনি স্থান-কাল অনুযায়ী শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে আংশিক পরিবর্তনও করতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব বিষয়ে নতুন বিধানও রচনা করতে পারেন।" (মাওলানা মওদুদী রচিত, সূদ ও আধুনিক ব্যাকিং, পৃষ্ঠা- ১১৯ গ্রন্থখানা অনুবাদ করেছেন আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান)

উক্ত বাক্যগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদী সাহেব স্বঘোষিত সংস্কারক! একইভাবে মাওলানা সাঈদী সাহেবের বক্তব্যেও এই কথাই স্বীকৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অতীতের যে সকল মুজতাহিদগণ শরীয়তের আইন প্রণয়ন করে গেছেন, তাঁরা কি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না? তাঁরা কি কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করতে অক্ষম ছিলেন? অথবা তাঁরা তাঁদের জীবনে কি এমন কোনো কর্ম করেছেন যা শরীয়ত বিরোধী?

অথচ মাওলানা মওদুদী রচিত 'সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠার একটি বক্তব্যে ইমাম আযম ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাদীস চয়নকে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যকলাপের এমন মুখোমুখি স্থানে দাঁড় করিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে অপকৌশলী তৎপরতা। এতে সাধারণ পাঠকগণকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলা হয়েছে। যাতে মুজতাহিদগণের পুরো গবেষণাকর্মটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,- 'হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, "বর্গা ব্যবস্থা যে পরিহার করে না তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ঝুঁকি নিতে হবে।"

আলোচ্য হাদীস কঠোর ভাষায় বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ করলেও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার কারণে এটা অস্পষ্ট যে, বর্গা প্রথার সব ক'টি পদ্ধতিই নিষিদ্ধ না বিশেষ কোনো পদ্ধতি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত? এ প্রশ্নের সমাধান পেতে রীতিমতো গবেষণা প্রয়োজন।

একইভাবে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে,- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর ক্বিরাতরূপে গণ্য হবে।" এই হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া কিছুতেই চলবে না। অথচ অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- "সূরাতুল ফাতিহা যে পড়েনি তার নামায শুদ্ধ হয়নি।"

এ হাদীসের আলোকে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক। হাদীসের এ দৃশ্যতঃ বিরোধ নিরসনকল্পে প্রথম হাদীস মূল ধরে দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এ হাদীসের লক্ষ্য ইমাম ও মুনফারিদ, মুক্তাদী নয়। সুতরাং ইমাম ও মুনফারিদের জন্য সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও মুক্তাদীর জন্য তা নিষিদ্ধ। কেননা, ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর ক্বিরাত বলে গণ্য হবে। (তথ্যসূত্র- মাযহাব কি ও কেন? পৃষ্ঠা- ১৩)

উপরোক্ত উদাহরণদ্বয় ও মাওলানা মওদুদী সাহেবের চিন্তা-গবেষণাগুলোকে একস্থানে এনে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি পুরো বিষয়টাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন তিনি

মাযাহাব অনুসরণ না করার জন্য তার দলীয় কর্মীদের নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কেও উপদেশ দিয়েছেন যে, 'মাযহাব অনুসরণ একটি গোনাহের কাজ।'

তবে আসল কথা হচ্ছে মাওলানা মওদুদী সাহেবের উক্ত নসিহত কিংবা অসিওত শুধু একা তার নয়। তিনি শেখানো বুলি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও কৌশলের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। মাযহাব অনুসরণ না করার তাগিদ যেমন সুদূর অতীতের খারিজীরা করেছিল, তেমনি খারিজীদের পুরো বাহাত্তরটা দলই সেই একই বক্তব্য দিয়ে আসছে। এমনকি নিকট অতীতের ওয়াহ্‌হাবী, সালাফী ও আহলে হাদীসগণও এই একই বুলি আওড়াচ্ছেন। কারণ, ইসলামের প্রতিষ্ঠিত শরীয়তকে কলুষিত না করতে পারলে, নিজেদেরকে বিকশিত করা যায় না। কিন্তু তারা এটা চিন্তা করেন না যে, মনে মনে মুজাদ্দিদ সাজতে গিয়ে তাদের আসল চেহারাই উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ- বর্তমান যুগের পূঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইন ভঙ্গ করা একটি মঝার ব্যাপার। কোটি কোটি আইনজীবী ইদানিং ব্যবসা বা কাস্টমার ধরার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। কারণ, লোকেরা তাদের বৃত্তিটাকে অন্য চোখে দেখে। কারণ, পূঁজিবাদী দেশের শাসকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্লামেন্টে চিল্লাচিল্লি করে নতুন নতুন আইন প্রনয়ণ করেন। কিন্তু আইনজীবীরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে সেগুলোকে ভঙ্গ করেন। যেহেতু দুপাইস হাসিলের এটা একটা সুগম পন্থা। কখনো দেখা যায় যে, সরকার আইন তৈরী করে। কিন্তু কিছুদিন পর আবার ভোটের স্বার্থে নিজেরাই তা ভঙ্গ করতে বা রহিত করতে বাধ্য হয়। যেমন- ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্লাশফেমী আইন তৈরী করা হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো, সেক্যুলারিজমের গুরত্বারোপ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কারো ধর্মীয় অনুশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই আইনটি তৈরীর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন বৃটেনের মন্ত্রী পরিষদ। কিন্তু তাদের নিজেদের দেশে যখন খৃষ্টান ও ইহুদীদের মাঝে মতানৈক্য শুরু হলো, তখন তারা আইনটি বদলাতে বাধ্য হলেন। অর্থাৎ শুধু খৃষ্টান ধর্মের উপর কোনো আক্রমণ করা যাবে না। কিছুদিন পর যখন ইহুদীরা খৃষ্টান কর্তৃক আক্রান্ত হলো, তখন আবার আইন বদলি করা হলো। কিন্তু ইসলামে কখনো এমন সুযোগ নেই। এজন্যই আল্লাহ্‌র কালামকে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই রক্ষা করছেন। এটা আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা। ফলে খারিজীরা ইসলামকে কলুষিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে এবং নিজেরাই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, খারিজীদের প্রথম প্রথম ভূমিকা, উক্তি ও মন্তব্য এতোটা ইসলাম বিরোধী ছিলো না। কিন্তু জনসমর্থন লাভ করার পর তাদের আসল চেহারা উদ্ভাসিত হয়। একইভাবে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও এই একই পথ অনুসরণ করে ছিলেন। কিন্তু জনসমর্থন অর্জন করার পর ইসলাম থেকে বেরিয়ে যান।

মাওলানা সাঈদী উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, "নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র, নিরশ্বরবাদ, বৈরাগ্যবাদ, সামন্তবাদ, পূঁজিবাদী গণতন্ত্র, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা ও কাদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদি মানব রচিত কুফরী মতবাদ-মতাদর্শ সমষ্টির ভিত্তিহীনতা, অসারতা, অবৈজ্ঞানিকতা এবং মানব জাতির জন্য এসব মতবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি, পৃষ্ঠা-২০১)

মাওলানা সাঈদী সাহেবের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সারগোদার শহরের এক জনসভায় মাওলানা মওদুদী সাহেব বলেন, "আমরা খাঁটি ইসলাম পেশ করি; কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ন্যায় নয়। আমরা লিবারিলিজমের প্রবক্তা; কিন্তু আধুনিকপন্থীদের ন্যায় নয়।" (জামায়াতের দৈনিক পত্রিকা 'তসলীম' ২০ জুন ১৯৫৫)

মওদুদী সাহেব যে 'খাঁটি ইসলাম পেশ করছেন, যা প্রাচীনপন্থীদের ন্যায় নয়' সেটা কোনদিকে ইশারা করা হয়েছে?

ইসলামের প্রাচীনপন্থা বলতে কোন্টা? সাহাবায়ে কেরামের যুগ? তাবেঈদের যুগ? তাবে-তাবেঈদের যুগ? নাকি মুজতাহিদ কিংবা ইমামগণের যুগ?

আমরা যদি মুজতাহিদ বা ইমামগণের যুগকে প্রাচীনপন্থা হিসেবে ধরে নেই। তাহলে সেটা প্রমাণিত হবে? কারণ, মাওলানা মওদুদী সাহেব তো তার লেখালেখিতে মুজতাহিদ বা ইমামগণের চুলচেরা সমালোচনা করেছেন। তিনি তো এমনও বলেছেন যে, "তাক্বলীদ করা বা কারো অনুসরণ করা গোনাহের কাজ।"

এবার আমরা যদি প্রাচীনপন্থা বলতে তাবে-তাবেঈ, তাবেঈ অথবা সাহাবায়ে কেরামের যুগকে ধরে নেই। তাহলে মওদুদী সাহেবের লেখালেখির দিকে নজর দিতে হবে। তিনি তো স্পষ্টভাষায় লিখেছেন, "সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি জানবেন না।" অর্থাৎ মওদুদী সাহেব তো সাহাবায়ে কেরামের পন্থাকেও প্রাচীনপন্থী বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং মুজতাহিদদের যুগ কিংবা ইমামদের যুগের তো প্রশ্নই উঠে না।

এখন বাকি রইলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা! কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর বিশ্ববরেণ্য লেখক মওদুদী সাহেব তো নবী-রাসূলগণকেও নিস্পাপ মনে করেন না। এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও ভুলের উর্ধ্বে নন বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি নিজ খেয়াল খুশী মতো কিছু বলেন না, বরং যা কিছু বলেন, তা সবই তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকট অহীরূপে প্রেরণ করা হয়।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন, "অতএব তাঁর কাছে যা কিছু প্রেরণ করা হয় তা অহী ছাড়া কিছু নয়।"

অথচ মাওলানা মওদুদী সাহেব তাঁর তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁহার নিকট কাতর কণ্ঠে এই দোয়া কর যে, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করার ব্যাপারে তোমার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হইয়াছে; কিংবা তাহাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে তাহা যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন, সেই দিকে যেন তিনি ভ্রুক্ষেপ না করেন।" (তাফহীমুল কোরআন ১৯ খন্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ মাওলানা মওদুদী সাহেব প্রাচীনপন্থী বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামকেও মনে করেন না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই

প্রশ্ন আসে, মওদুদী সাহেবের ইসলাম, এটা কোন্ ইসলাম?

উত্তরে হয়তো মাওলানা সাঈদী সাহেব একথাই বলবেন যে, মওদুদী সৃষ্ট খাঁটি ইসলামের কথাই বলা হয়েছে! অতএব আমরা যদি দার্শনিক লিও-টলস্টয়ের বোকা-আইভানের মতো ধরে নেই যে, মওদুদী সাহেবের সৃষ্ট ইসলামই খাঁটি! তাহলে মওদুদী সাহেবের ঐ মন্তব্যের দিকে আবার তাকাতে হয়। তিনি বলেছেন, 'আমরা লিবারিলিজমের প্রবক্তা; কিন্তু আধুনিকপন্থীদের ন্যায় নয়।' অর্থাৎ আধুনিক ইসলামেও তিনি বিশ্বাসী নন, বরং লিবারিলিজমের প্রবক্তা। এবার ইংরেজী অভিধানের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লিবারিলিজম ইংরেজী শব্দ। এর বাংলা অর্থ = উদারনীতি। ব্যাখ্যাকারগণ এই (লিবারিলিজম) নীতিকে মধ্যমপন্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উদারতার ভিত্তিতে রাজনীতি বা ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এখন প্রশ্ন আসে, মাওলানা মওদুদী সাহেব তো উক্ত বক্তব্যে রাজনীতির কথা উল্লেখ করেন নি। বলেছেন, খাঁটি ইসলামের কথা। যে ইসলাম উদারতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে বা করবেন। তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মওদুদী সাহেব 'নতুন একটি ইসলাম'-এর জন্ম দিয়েছেন! যে ইসলামের উৎস হচ্ছে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে আরেকটি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন! কারণ- উপরোক্ত মন্তব্য, বক্তব্য ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে উত্তরটা কি এভাবে বলা যায় না?

লিবারিলিজম

এবার লিবারিলিজমের জন্ম বৃত্তান্ত জানা প্রয়োজন। লিবারিলিজমের জন্ম হয়েছে বৃটিশ রাজনৈতিক 'উইগার' বা 'উইগ' দল থেকে। পনর'শ শতাব্দির পর বৃটেনে দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছিলো। এক- টোরী ও দুই- উইগার বা উইগ। বৃটেনের রাজা জেম্স দ্বিতীয় ছিলেন কট্টর ধর্মপ্রাণ লোক। তিনি রাজ্যক্ষমতা লাভ করেই সমস্ত দেশজুড়ে ধর্মীয় আইন-কানুন বলবৎ করেন। এতে সাধারণ জনগণের মাঝে অস্ফুট প্রতিবাদ শুরু হয়। উইগার দলীয় নেতৃবৃন্দগণ জনগণের এই অস্ফুট প্রতিবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। রাজা জেম্স দ্বিতীয়কে হত্যা করে তারা রাজ্যক্ষমতা তাদের হাতে নিয়ে নেয়। শুরু হয় 'টোরী' ও 'উইগার'দের রাজনৈতিক সংঘাত। উইগাররা তাদের নতুন মেনিফেস্টো প্রচার করে। এতে স্পষ্টাক্ষরে লিখা হয়- 'আমরা ধর্মীয় রাজনীতির প্রবক্তা নই, তবে ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মাঝামাঝিতে আমাদের অবস্থান। অর্থাৎ আমরা লিবারেল।

তারপর থেকে শুরু হয় 'লিবারেল' সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা। দীর্ঘদিন এই সাব্জেক্ট নিয়ে প্রচুর গবেষণা ও লেখালেখি হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে জন্ম নেয়া রাজনীতিবিদ লেখক ও গবেষক 'জন লক' প্রচার করলেন লিবরিলিজমের প্রকৃত অবকাঠামো। 'জন লক' ছিলেন প্রাচীন সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠাতা মারচিগ্লীও'র রাজনৈতিক রূপকার। অর্থাৎ মারচিগ্লীও নামক রাজনৈতিক দার্শনিক তের'শ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার সর্বপ্রথম প্রস্তাব দেন। তার এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তথাকথিত উইগার দলের জন্ম হয়।

ষোল'শ শতাব্দির শেষার্ধে রাজনৈতিক গবেষক জন লক লিবারেলিজমের পূর্ণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন। জন লক-এর মতে, মানুষ স্বাধীনভাবেই জন্ম নেয়। কিন্তু সমাজের নিয়মানুবর্তিতা তাকে বিভিন্ন রকম পরাধীনতার শিকল পরিয়ে দেয়। সুতরাং মানুষের এই আজন্ম স্বাধীনতাকে কেন্দ্রকরেই লিবরেলিজমের প্রবর্তন। অর্থাৎ জনগণ ভোট দিয়ে একজনকে জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেবে। কোন একজন জোর করে কারো উপর নেতৃত্ব খাটাতে পারবে না। একইভাবে, ব্যক্তি তার ধর্মীয় সীমাবদ্ধতায় কাউকে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দিবে না। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া কোনো নাস্তিক ব্যক্তিকে কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা দান করা হবে না। অতএব জনগণের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালক নির্বাচন এবং ধর্মীয় অনুশাসনে ব্যক্তি'র মননের মূল্যায়নই লিবরেলিজম।

পরবর্তী যুগে লিবারিলিজম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক গবেষক জন স্টোয়াট (১৮০৬-), গর্গ উইলহ্যাম ফ্রিডরেক (১৭৭০-) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাদের সকলেরই মন্তব্য ঐ একটাই। তবে কেউ কেউ বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবাদের উপর। উইলহ্যাম ফ্রিডরেক এর লেখায় তো এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রাচীন সেক্যুলারিজম থেকেই উইগার এবং পরবর্তীতে লিবারিলিজমের জন্ম।

অতএব মাওলানা সাঈদী সাহেব তো বিভিন্ন মাহফিলে সিংহের মতো গর্জন করে বলেন, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরী মতবাদ।

কিছুক্ষণের জন্য না হয় সাঈদী সাহেবের বক্তব্যকে স্বীকার করে নিলাম। এবার সাঈদী সাহেব ব্যাখ্যা দেবেন কি, মাওলানা মওদুদী যে 'ইসলামী লিবারিলিজমের' কথা বলছেন, সেটা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম থেকে আলাদা?

অবশ্যই নয়। কোনোক্রমেই পৃথক নয়। বর্তমান বৃটেনের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হচ্ছে লিবারেল ডেমোক্রাট। সাংবাদিকতার নিরীক্ষায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে উঠাবসা করতে হয়েছে। লিবারেল ডেমোক্রাটদের অনেকগুলো মেনিফেস্টো পড়ার সুযোগ হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের একমাত্র লিবারেল ডেমোক্রাট দলই প্রকৃত সেক্যুলারিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং মরহুম মাওলানা মওদুদী সাহেবের ইসলাম এবং জনাব মাওলানা সাঈদী সাহেবের ইসলাম যে, 'ধর্মের নামে সেক্যুলারিজম' তা আর অস্পষ্ট নয়।

তা ছাড়া আজকের যুগের রাজনীতিবিদদের একটি নীতি বা আইডিওলজী হচ্ছে যে, স্বপক্ষ দলকে বিরোধী অবস্থান থেকে গালিগালাজ। অর্থাৎ এমনভাবে সমালোচনা ও গালাগাল করা হয়, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, প্রকৃত অর্থেই অমুক দলটি তমুকের শত্রু। কিন্তু যখন ভোটের সময় আসে, তখন ঠিকই এক প্লাটফর্মে গিয়ে গলাগলি করেন। এই নীতিটি সর্বপ্রথম দার্শনিক এরিস্টটল তার রেটরিক স্টাইলের ধারায় কালের রাজনৈতিক বিজ্ঞজনদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সুতরাং এই নীতি যেমন ছিলো মার্কিন পূঁজিপতিদের, তেমনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলার, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, এমনকি বর্তমানের বুশ-ব্লেয়ারেরও এই একই নীতি বা আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

অতএব এখন যদি জামায়াতী ইসলামী দলের কোনো নেতা লক্ষ-কোটি বার চিৎকার দিয়ে

বলেন, সেক্যুলারিজম একটি কুফরী মতবাদ। তাতে অবশ্যই সবাই একমত হবেন। কিন্তু 'মওদুদী মতবাদ' বা 'জামায়াতে ইসলামী' দলকে যখন সেক্যুলারিজম থেকে পৃথক করতে যাবেন, তখনই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যেহেতু অতীতের খারিজীরা 'ইসলামের গোড়ায় গলদ' নামক একটি অপপ্রচার শুরু করেছিল। অথচ ইতিহাসের চাবুক তাদেরকে পিটিয়ে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে। একইভাবে- শিয়া, মুতাযিলাসহ বাহাত্তরটি দলই ইসলাম থেকে দূরে বহুদূরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং মওদুদী মতবাদও যে খারিজী আদর্শের ধারাবাহিকতা, সেকথা হয়তো পৃথকভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাঈদী'র বক্তব্যের আরেকটি উদ্ধৃতি হচ্ছে, "অনেকেই এ কথাটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন নি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আজমাঈনদের সম্মান ও মর্যাদা অথবা তাঁদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় নয় এবং সে উদ্দেশ্যেও উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়নি। বরং যেসব বিষয় সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে একটি অপরিহার্য তাত্ত্বিক প্রয়োজনে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখন যে ব্যক্তিই উল্লেখিত বিষয়সমূহে দ্বিমত পোষণ করবে তাকে অবশ্যই আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে আলোচনা করতেই হবে। আর মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ই প্রথম ব্যক্তি নন যিনি সাহাবায়ে কেরামদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন। অথচ প্রথম হিজরী শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোনো না কোনো তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস, হাদীসের ভাষ্যকারগণ, ফকীহ্গণ, দার্শনিকগণ এবং ইসলামের ইতিহাস রচয়িতাগণ সাহাবায়ে কেরামদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছেন।" (আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি; পৃষ্ঠা- ২০৫)

মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যের সমালোচনায় যাবার আগে উক্ত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠার একটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ- মাওলানা সাঈদী নিজেই ফতোয়া দিচ্ছেন যে, "কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে তার প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। শরীয়তের অকাট্যভাবে প্রমাণ্য কোনো বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকার জ্ঞাপন করা অথবা বিরোধিতা করা অবশ্যই কুফরীর শামিল হবে। মুসলমান ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে তার সাথে সৎকাজে সহযোগিতা করা বা অংশগ্রহণ করা না জায়েয নয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন- 'সৎকাজে ও পরহেযগারীর কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে গোনাহ্ ও সীমালংঘনমূলক অপরাধ জনিত বিষয়াদিতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না। (সূরা মায়িদাহ্-২)"

প্রথম প্রশ্নঃ- মাওলানা সাঈদী সাহেব ফতোয়ার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'মুসলমান ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে তার সাথে সৎকাজে সহযোগিতা করা বা অংশগ্রহণ করা না জায়েয নয়।' একই ফতোয়ার সাক্ষী হিসেবে উদ্ধৃতিমূলক আয়াতের বাক্যগুলো হচ্ছে বিপরীতমুখী। উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'পক্ষান্তরে গোনাহ্ ও সীমালংঘনমূলক অপরাধ জনিত বিষয়াদিতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না।' আশাকরি মাওলানা সাঈদী সাহেবের এই ফতোয়াটা

ছাপার ভুল নয়। যেহেতু উপরের বাক্যগুলো এর সপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যেমন বাক্যগুলোর প্রথমেই তিনি বলেছেন, 'কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে তার প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। শরীয়তের অকাট্যভাবে প্রামাণ্য কোনো বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকার জ্ঞাপন করা অথবা বিরোধিতা করা অবশ্যই কুফরীর শামিল হবে।'

সুতরাং প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা যদি কোনো সাধারণ পাঠক এভাবে আবিষ্কার করেন যে, কুরআনের আয়াতে যা-ই বলা হোক, মাওলানা সাঈদী বলছেন- গোনাহ্গার ব্যক্তির সাথে ভালো কাজে সহযোগিতা করা জায়েয, অতএব তিনিও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, মাওলানা মওদুদী একজন গোনাহ্গার কিন্তু তার সাথে সৎ কাজে সহযোগিতা ঠিক আছে!

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ মাওলানা সাঈদী একদিকে বলছেন, 'কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে তার প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। শরীয়তের অকাট্যভাবে প্রামাণ্য কোনো বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকার জ্ঞাপন করা অথবা বিরোধিতা করা অবশ্যই কুফরীর শামিল হবে।'

অতএব পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী আপনার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং সেই সকল মুমিনগণ যারা আপনার অনুসরণ করছেন।" (সূরা আনফাল আয়াত- ৬৪)

একইভাবে দীর্ঘ একটি হাদীসের ভাবার্থের শেষ অংশে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক নবীর জন্যই খাছ রাজদার (বিশ্বস্ত তথ্য সংগ্রহকারী), বিশ্বস্ত বন্ধু, গোপন তথ্য রক্ষাকারীরূপে কিছু বিশ্বস্ত লোক থাকতেন। আমার খাছ (বিশ্বস্ত) রাজদার, বিশ্বস্ত বন্ধু, গোপন তথ্য রক্ষাকারী হলো মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান।" (তথ্য সূত্রঃ ভুল সংশোধন; পৃষ্ঠা- ৩৩)

অতএব উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামগণের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ এবং গোনাহের কাজ। তাহলে মাওলানা সাঈদী সাহেবের ফতোয়া দ্বারা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবকে কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে?

এখন সাঈদী সাহেব হয়তো বলবেন যে, মাওলানা মওদুদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেন নি। বরং প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। তাহলে একথা প্রমাণ করতে হবে- 'প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা কি? সমালোচনা কি? এবং দোষচর্চা কি?

'প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা' হচ্ছে, হ্যাঁ এটা সত্য যে হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা-সহ সাহাবায়ে কেরামগণ একটি ঘটনাকে কেন্দ্রকরে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমনকি যুদ্ধও করেছেন। প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ইসলামের খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থায় খেলাফত ও রাজতন্ত্র দু'টি ধারা প্রচলিত হয়। এই হচ্ছে প্রথম শতাব্দিতে সাহাবায়ে কেরামদের মতবিরোধের স্বরূপ। আর এতোটুকুই হবে 'প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা'। এর বেশি কোনো মুসলমান যদি লিখতে যান, তাহলে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামের সহীহ্ বা বিশুদ্ধ ইতিহাস সামনে নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেহেতু আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াসহ অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিশদ আলোচনা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পরবর্তী কথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা এবং দোষচর্চা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত

আলিমে দ্বীন বর্তমান যুগের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা তকী উসমানী লিখেছেন, "হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র মর্মান্তিক শাহাদাতের পর তাঁর শাসন কালই ছিলো ইসলামের সোনালী ইতিহাসের উজ্জ্বলতম যুগ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন বিরাজমান ছিলো সুখ-শান্তি, স্থিতি ও নিরাপত্তা। বহিঃশত্রুর মনে ছিলো ইসলামী খিলাফতের অপ্রতিহত প্রভাব। ফলে মুসলিম জাহানের সীমান্ত পানে চোখ তুলে তাকানোর সাহস ছিলো না তাদের। কিন্তু সীমাহীন লজ্জা ও বেদনার বিষয় যে, ইসলামের মুখোশহীন ও মুখোশধারী শত্রুরা নবীজীর এই প্রিয় সাহাবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও প্রচারনার এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ইসলামী ইতিহাসের এ স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় আজ হারিয়ে গেছে মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিপথ থেকে। এই মজলুম সাহাবীর চরিত্র হননে এমন কোন অপকৌশল নেই যা শত্রুরা ব্যবহার করেনি। সম্ভবতঃ ইসলামী ইতিহাসের আর কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি ওরা এতটা নগ্ন, এতটা নির্মম হয়নি।

সাধারণ ইতিহাস পাঠকের দৃষ্টিতে নবীজীর স্নেহধন্য সাহাবী হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র পরিচয় আজ এই যে, ক্ষমতার মসনদ ছিলো তাঁর স্বপ্ন। হত্যা ও রক্তপাত ছিলো তাঁর নেশা এবং ধোকাবাজির রাজনীতি ছিলো তাঁর পেশা। বস্তুতঃ ক্ষমতার অন্ধ মোহই তাঁকে মাতিয়ে তুলেছিলো খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে। প্রচারণার এই ধুম্রজালে ইসলামী উম্মাহ আজ বিস্মৃত হতে চলেছে যে, হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠার অনন্য গৌরবের অধিকারী ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হলো, "আমার উম্মতের যে প্রথম সৈন্যদলটি নৌ-অভিযানে অংশ নিবে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী)

ইত্যবসরে স্বনাম খ্যাত গবেষক চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী রচিত খিলাফত ও মুলুকিয়াত (রাজতন্ত্র) বইটি বাজারে এলো। তাতে তিনি হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ গুলো ঘসে মেজে, নতুন মোড়কে, নতুন সাজে পেশ করেছেন। ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের মনে মাওলানার লেখনী ও ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা সাধারণ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো। ফলে সে মহলে বইটি মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো। তাদের চিন্তায় এ ধারণা একরূপ বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্রের গিলোটিনে হত্যার জঘন্যতম অপরাধের প্রধান আসামী হলেন হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।" (তথ্যসূত্রঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া (রা') গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ পৃষ্ঠায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাওলানা মওদুদী সাহেব একজন সত্য গোপনকারী। তিনি ইচ্ছে করে হাদীসের বাণী, ইতিহাসের তথ্য ও পূর্বসূরী গবেষকদের অনেকগুলো বাক্যকে নিজের ইচ্ছেমতো এবং নিজের প্রয়োজন মতো- জোড়াতালি, সংযোজন, সংশোধন করেছেন। এমনকি নিজের মত ও মন্তব্যকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামগণকে মিথ্যাবাদী হিসেবেও সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

অতএব শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাঈদী সাহেবের ফতোয়ায় যে তিনি নিজেও দায়ী, তা হয়তো

পৃথকভাবে বলতে হচ্ছে না।

স্বয়ং মওদুদী সাহেবের ভাষ্য

সাহাবায়ে কেরামকে স্বয়ং মওদুদী সাহেব যে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন না, সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উক্তির দিকে লক্ষ্য করা যায়।

"জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র (মূল উর্দু) ধারা-৩ এর ৬ উপধারা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

'রসূলে খোদা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি মেনে নিবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করবে না, কারো মানসিক গোলামীতে নিমজ্জিত হবে না। আল্লাহর নির্ধারিত এ পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠিতে প্রত্যেককে যাচাই করবে ও পরখ করে নিবে। এ মাপকাঠির (আল্লাহর রাসুল) বিচারে যে যে মর্যাদায় পড়বে, তাকে ঐ মর্যদা দান করবে।'

এটি হচ্ছে ঐ মূলকথা, যা থেকে ঐসব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার (জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন আমীর মাওলানা মওদুদীর) জবাব হচ্ছেঃ "আমরা সত্যের মাপকাঠি বলতে ঐ বস্তুকে বুঝাই, যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সত্য (হক) এবং যার পরিপন্থী হওয়া মিথ্যা (বাতিল) বলে সাব্যস্ত হয়। এই দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি শুধু আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নত। সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তারা কিতাব ও সুন্নাতের মাপকাঠিতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ প্রমাণিত হয়েছেন। কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে যাচাই করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই (সাহাবীদের) মহান দলটি পুরোপুরি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যেই তাদের ইজমা (সম্মিলিত মত) আমাদের নিকট শরীয়তের অন্যতম দলিল। কেননা আমাদের মতে কিতাব ও সুন্নাতের সামান্যতম বিরোধী কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব।"

তিনি অন্যত্র লিখেন, "সমালোচনা (তানকীদ) অর্থ দোষ চর্চা বা ছিদ্রান্বেষণ করা কোনো মুর্খ ব্যক্তি বুঝলেও বুঝতে পারে, কিন্তু আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তিনি এ শব্দ হতে এ অর্থ বুঝাবেন। আসলে সমালোচনা অর্থ মূল্যায়ন করা, পরীক্ষা করা অথবা যাচাই করা ও পরখ করা। খোদ গঠনতন্ত্রের উল্লিখিত উক্তির গৃহীত ব্যাখ্যাও যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। এরপর দোষ চর্চার অর্থ শুধু ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে যে, ফিতনাবাজ ও গোলযোগ পাঁকাতে ইচ্ছুক। অধিকন্তু এ বাক্যটির তাৎপর্য ও লক্ষ্য আরো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর রসূলকে মাপকাঠি মেনে নেয়ার পর ঐ মাপে যার যে মর্যাদা প্রাপ্য হবে, তাকে সেই মর্যাদা দেয়া হবে। এরপরও এ থেকে কেমন করে এ অর্থ গৃহীত হতে পারে যে, আল্লাহর কুরআন ও রসূলের হাদীসসমূহে সাহাবায়ে কেরামের যে ভূয়সী প্রশংসা এসেছে, তা মেনে নেয়া ওয়াজিব নয়?" (সূত্র- রাসায়েল ও মাসায়েল, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০-৩১-৩২)

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের উক্ত জবাবের উপর আমি বিশদ আলোচনা করতে চাই না। কারণ- আমাদের অন্যান্য আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। শুধু একটি কথা বলা যাবে যে, সমালোচনা শব্দের অর্থ জনাব মওদুদী সাহেবের ভাষায়- 'আসলে

সমালোচনা অর্থ মূল্যায়ন করা, পরীক্ষা করা অথবা যাচাই করা ও পরখ করা।'

সমালোচনা শব্দের আরবী হচ্ছে, 'তানকীদ'। তাই 'তানকীদ' শব্দের ইংরেজী 'ক্রিটিসিজ্‌ম' এবং বাংলা 'সমালোচনা'। তাহলে এই শব্দের অর্থ তিনি যেভাবে বুঝেছেন, তা তার ভাষায়ই উল্লেখ করতে হয়- 'সমালোচনা (তানকীদ) অর্থ দোষ চর্চা বা ছিদ্রান্বেষণ করা কোনো মুর্খ ব্যক্তি বুঝলেও বুঝতে পারে, কিন্তু আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এটা আশা করা যায় না.....' অর্থাৎ তিনি নিজেই ছিদ্রান্বেষণের গহ্বরে রয়েছেন। কারণ- 'তানকীদ' শব্দের অর্থ তিনি যা করেছেন, তা বিভ্রান্তিকর এবং অর্থ বিকৃতির পরিচায়ক। অন্যদিকে- শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদুদী লিখেছেন, 'আসলে সমালোচনা অর্থ মূল্যায়ন করা, পরীক্ষা করা অথবা যাচাই করা ও পরখ করা।' অথচ অনেকগুলো হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে- সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে 'পরীক্ষা করা, যাচাই করা ও পরখ করা' পরবর্তী যুগের কারো প্রতি অনুমতি নেই।

তাফসীরে সাঈদী প্রসঙ্গ

মাওলানা সাঈদীর আরেকটি বিরাট গ্রন্থ ইদানিং বাজারজাত হয়েছে। 'তাফসীরে সাঈদী' সূরা আল-ফাতিহা গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় 'কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, "..... সাহাবাদের মধ্যে এ দুটো দলের সম্মান ও মর্যাদা সমপর্যায়ের হয়নি। এরপর আরেকটি দল ছিল ইতিহাসে যাদেরকে তোলাকা বলা হয়েছে। তোলাকা মানে হচ্ছে, মক্কার এমন এক বংশ, যারা শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া, ওয়ালীদ ইবনে উকবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত বংশের লোক ছিলেন।" (তাফসীরে সাঈদী, আল-ফাতিহা গ্রন্থ পৃষ্ঠা- ৯৭)

উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ব্যাপারটি সন্নিবেশিত করণের কোনো সামঞ্জস্য আছে কি-না তা স্পষ্ট নয়। কারণ, পবিত্র কুরআন অবশ্যই নির্ভুল, সন্দেহমুক্ত এবং আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাছাড়া হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং একাজের জন্য সকল সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ বা পরামর্শ দিয়েছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের পরীক্ষা, দৃঢ়তা ও মর্যাদার তারতম্য এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য মোটেই বোধগম্য নয়।

এই সমালোচনা দেখে অনেকে হয়তো বিষয়টিকে ছিদ্রান্বেষী তৎপরতা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। আসলে উল্লিখিত বক্তব্যে একটি ভিন্ন মতলব লুক্কায়িত রয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য সন্নিবেশিত করার অর্থই হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হেয়প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশ্য। কারণ- ইতিহাসের পাতায় স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআন শরীফ অনুলেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। হাদীস সংকলনকারী ইমামগণ হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, তিনি (মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ১৩০ খানা বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। একইভাবে, বুখারী শরীফের (মুসলমানদের প্রথম নৌবহর সম্পর্কিত) হাদীস প্রমাণ করে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু জীবতকালেই বেহেশ্তের সুসংবাদ শুনে গেছেন।

অন্যদিকে, মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখনিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে রাজতন্ত্রের পুরোধা, আহলে বাইতদের প্রতি হিংসুক, ইসলামের খেলাফত ধ্বংসকারী এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি এখন সমস্ত বিশ্বজুড়ে আন্দোলন্মোখ। সুতরাং মাওলানা সাঈদী'র এই অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য পবিত্র কুরআনের তাফসীর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার অর্থ দাঁড়ায়- কিছু সংখ্যক সাহাবী সৎ এবং ভালো লোক ছিলেন না? অথবা তোলাকা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যাওয়ার দরুণ হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সন্দেহ করা হচ্ছে? হয়তো তিনি স্বগোত্রীয় টানে হেরফের করতে পারেন? যে কারণে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কুরআন লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব দেন নাই? (নাউযুবিল্লাহ্)

অতএব সাঈদী সাহেব যতোই চিৎকার দেন না কেনো যে, তিনি মওদুদী মতবাদে বিশ্বাসী নন। অথবা তিনি মওদুদী সাহেবকে ইমাম মানেন না। এমনকি জামায়াতে ইসলামী দলও এটা মনে করে না। আসলে এগুলো সঠিক নয়। যেহেতু মাওলানা সাঈদী সাহেবের সকল কর্মতৎপরতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মওদুদী মতবাদের প্রকৃত পক্ষাবলম্বনকারী।

মওদুদী মতবাদের অর্থনীতি

মওদুদী মতবাদের শুধু সমালোচিত দিকটির আলোচনা করার আমার উদ্দেশ্য নয়। হয়তো বিচক্ষণ পাঠক এটা লক্ষ্য করতে পারবেন। তবে এটা সত্য যে, সমালোচনার পরিবর্তে একতরফা এবং কঠোর আলোচনা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। আমিও এটা স্বীকার করি। যেহেতু মওদুদী মতবাদে কেবল খারাপ দিক লক্ষ্যণীয় নয়। বরং প্রশংসার দাবী রাখে এরকম ভালো দিকও প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিশেষ করে বিগত (এবং বর্তমান) শতাব্দির পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মওদুদীবাদের ইসলাম ঘেষা লেখালেখি নিরাশার পরিবর্তে আশার আলো জ্বালিয়ে ছিলো। অত্যন্ত সুন্দর এবং সাবলিল ভাষায় ইসলামী অর্থনীতির নতুনত্ব উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম রাজনীতিবিদদের তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে পূঁজিবাদের সামনে দাঁড়াতে হবে। সূদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং বিষয়ে মওদুদীবাদের চিন্তাধারা সত্যি গ্রহণযোগ্য। তবে গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয়। যেহেতু ইতিহাসে এরকম একটা প্রমাণ রয়েছে যে, মুতাযিলাদের সবচে বড় এবং বিশেষ বিজ্ঞতা সম্পন্ন মুফাসসির হচ্ছেন, আল্লামা জামাখশারী সাহেব। তিনি মুতাযিলা দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করেছেন। তার তাফসীর গ্রন্থের নাম 'তাফসীরে কাশ্শাফ'।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, আহলে সুন্নাতের উচ্চতর ডিগ্রীধারী উলামায়ে কেরাম এখনো 'তাফসীরে কাশ্‌শাফ' অধ্যয়ন করেন। কারণ তাফসীরে কাশ্‌শাফের বর্ণনাভঙ্গি, ভাষা, উপস্থাপনা শৈলী, গবেষণার স্বরূপ ইত্যাদি অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ এবং সাবলীল।

একইভাবে, মওদুদীবাদেও ইসলামী অর্থনীতিতে নতুনত্ব আনয়ণের দাবীতে আত্মঘাতি কিছু ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 'সংশোধনের কার্যকর পদ্ধতি' শিরোনামে একস্থানে পরামর্শ দিয়েছেন যে, "প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও কার্যকরযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয়া আসলে মানবিক প্রচেষ্টাবলীর সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণেরই ফলশ্রুতি। এ দুনিয়ারই কোনো কোনো এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করার ন্যায় চরম বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সুদ রহিত করে যাকাতের সংগঠন কায়েম করার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, একথা বলা কোনো ক্রমেই শোভা পায় না। তবে একথা ঠিক প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ব্যবস্থায় জীবন গড়ে তোলা রহিম করিমের ন্যায় যে কোনো সাধারণ লোকের কাজ নয়। এ কাজ কেবল তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে দুটো শর্ত পাওয়া যায়-

একঃ যারা যথার্থই পুরাতন ব্যবস্থা পরিহার করেছে এবং যে পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনের সমগ্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করার লক্ষ্য গৃহীত হয়েছে তার ওপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

দুইঃ যারা অনুকরণ প্রবৃত্তির পরিবর্তে ইজতিহাদী প্রবৃত্তির অধিকারী। যারা নিছক প্রয়োজনীয় বুদ্ধির বৃত্তিটুকুর অধিকারী নয়, যা পুরাতন ব্যবস্থাকে তার পূর্বের পরিচালকদের ন্যায় দক্ষতা সহকারে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট, বরং এমন বিশেষ পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী যা বিধ্বস্ত পথরেখাগুলো পরিহার করে নতুন পথরেখা তৈরী করার জন্য প্রয়োজন।"

উক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যেমন,

১) প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কার্যকর চেষ্টা নিলে ফলপ্রসু হওয়া অবাস্তব নয়।

২) এই রকম চেষ্টা করা রহিম করিমের মতো সাধারণ মানুষের কাজ নয়, বরং যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের এটা দায়িত্ব।

৩) সমাজতান্ত্রিক দেশে বা রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব নয়।

৪) যারা দৃঢ়তার সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরাতন পরিহার করে নতুনত্ব গ্রহণে ব্রতী হবে, তাদের দ্বারাই তা সম্ভব।

৫) যারা অনুকরণের স্বভাব পরিবর্তন করে নিজস্ব গবেষণার অধিকারী, তাদেরকে এ কাজের জন্য দক্ষ বলা যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদুদী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের মর্মার্থকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে দেখা গেছে-

'তোরা যে যা বলিস ভাই!

আমার সোনার হরিণ চাই।'

অর্থাৎ ইসলামের আগাগোড়া পরিবর্তন পরিমার্জন করে নতুনত্ব আনয়নই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের সময় এবং পূর্ববর্তী যুগেও পৃথিবীতে পূঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সে যুগের পরিবেশগত কারণে অর্থনীতির বাহ্যিক চেহারা ভিন্ন ছিলো বটে, তবে নিয়ম-কানুন প্রায় একই ছিলো। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, সমাজে তথা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে নতুনত্ব আনতে পেরেছিলেন, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই! একইভাবে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও ফকীহ্ উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী 'অনুরকণ প্রবৃত্তির' স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন, সেটা তো নিঃসন্দেহে স্বীকার করা ঈমানের দাবী।

অতএব প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্বসূরী ফকীহ্গণের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তগুলোতে বিভ্রান্তি কোথায়? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন্ কোন্ সমস্যাবলীতে তাদের ভুল রয়েছে? সেগুলো আগে চিহ্নিত করতে হবে। অবশ্য মাওলানা মওদুদী সাহেব যে সকল ভুল আবিষ্কার করেছেন, সেগুলোকে অতীতের উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী ভুল না বলে, বরং বর্তমানের মুসলিম সমাজে এগুলোর পরিপূর্ণ অনুকরণই যে অনুপস্থিত সেই বিষয়টি উল্লেখ করা উচিত ছিলো।

পরের কথা হচ্ছে, বর্তমান পূঁজিবাদী বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর প্রতিকার কি? এ সমস্যার জবাব তো অত্যন্ত সাধারণ যে, মুসলিম সমাজে স্থুলবুদ্ধি, অল্পবিদ্যা আর অপক্ক সমাজসেবকদের আধিক্যের কারণেই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য মাওলানা মওদুদী সাহেবের বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, "যারা দৃঢ়তার সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরাতন পরিহার করে নতুনত্ব গ্রহণে ব্রতী হবে, তাদের দ্বারাই তা সম্ভব।" এই বাক্যগুলোই বিভ্রান্তিকর। এমনকি ঈমান বিরোধী বললেও ভুল হবে না। কারণ, ইসলামী জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরাতন পরিহার করা অসম্ভব। যেহেতু, 'ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম" আমাদেরকে গন্ডির ভিতর আবদ্ধ করেছে।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদুদীর আরেকটি আপত্তিকর উক্তি বা উক্তির ব্যাখ্যা হচ্ছে- "যারা অনুকরণের স্বভাব পরিবর্তন করে নিজস্ব গবেষণার অধিকারী, তাদেরকে এ কাজের জন্য দক্ষ বলা যেতে পারে।"

কারণ- যুক্তির খাতিরে যুক্তি এবং তর্কের খাতিরে তর্ক যদি শুরু হয়, তাহলে দেখা যাবে- এরকম কথা বা বিশ্বাস কুফরীর সামীল। যেমন- একটি শিশু স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবককে অনুকরণ, অনুসরণ করে এবং করতে বাধ্য। ছাত্র/ছাত্রীরা উস্তাদের অনুকরণ করতে বাধ্য হয়। একইভাবে- সমাজে সুশিক্ষা ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলগণকেও মানুষেরা অনুকরণ করে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অর্থে কেউ যদি আনুগত্যের ধারাকে অস্বীকার বা পরিহার করে, তাহলে তাকে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলা যাবে?

কিন্তু জনাব মওদুদী সাহেবের ঐ বাক্যগুলো তো সেই কথারই পুণরাবৃত্তি বলা যায়, যা তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গে বলেছেন। যেমন- 'সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি নন।' 'নবী রাসূলদের উপর

থেকে মাঝে মধ্যে আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ সরানো হয়েছে।' 'মাযহাব মেনে চলা একপ্রকার গোনাহের কাজ।' ইত্যাদি বক্তব্যগুলো কি ভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক নয়?

তবে স্বীকার করি যে, মওদুদীবাদের অর্থনৈতিক অবকাটামো একশ্রেণীর লোকের জন্য অত্যন্ত ফায়দাকর। প্রকৃত অর্থে মওদুদীবাদপন্থী লোকদের জন্যেই তা ফলপ্রসু বা ব্যবহৃত। যেহেতু 'মওদুদী বিশ্বে'র অধিকাংশ লোক এটা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারছেন যে, মওদুদীবাদ একটি ভিন্নজাতের ভিন্ন মতবাদ। তার কারণ, কোনো মওদুদীবাদপন্থী ব্যক্তি অন্য কোনো দল, গোষ্ঠি এমনকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে কম দেখা যায়। কারণ, মওদুদীপন্থীরা মনে করেন, অন্যরা গোঁড়া মুসলমান। যেহেতু তারা 'মডারেট ইসলামে' বিশ্বাসী। তাই আজ বাংলাদেশের শহরে শহরে যেমন মওদুদীবাদপন্থী ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক্তারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, উকিল-ব্যারিষ্টারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তেমনি ঔষধ ফ্যাক্টরীও তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ মওদুদীপন্থীদের মূল আক্বিদাই হচ্ছে দলীয়ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। যা অতীতের খারিজী ও বর্তমানের 'শিয়া'দের ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করা যায়। সুন্নীরা যেমন শিয়াদের সাথে আত্মীয়তা, উঠা-বসা করে না, তেমনি শিয়া সম্প্রদায়ও সুন্নীদের থেকে আলাদাভাবে জীবন-যাপন করে। তবে মওদুদীপন্থীরা একটু ভিন্ন।

মডারেট ইসলামের জন্ম এবং...

তিনটি মতবাদের ঐক্যবদ্ধ গবেষণার ফসল এই মডার্ণ ত্রিত্ববাদতন্ত্র কিংবা মডারেট ইসলাম অথবা প্র্যাক্টিসিং ইসলাম।

একঃ সতেরো শতকের মাঝামাঝিতে জন্ম নিয়েছে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন বা নজদী মতবাদ (বর্তমান নাম সালাফী মুভমেন্ট)।

দুইঃ উনিশ শতকের প্রথম দিকে জন্ম নিয়েছে 'আহলে হাদীস' গোষ্ঠি।

তিনঃ বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে জন্ম গ্রহণ করেছে 'মওদুদী মতবাদ'।

এই তিন মতবাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ "ইমাম ও মাযহাবের কোনো প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কুরআনের জ্ঞান ও সুবিধামত হাদীসের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।" তবে সকলের কর্মক্ষেত্র একটু ভিন্ন। প্রথম দুটো দল ইসলামের শরয়ী বা বিধি-বিধানে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করেছেন। যেমন, সালাফী বা ওয়াহ্‌হাবীদের আক্বিদা হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতকে লক্ষ্য করে। বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো শাসন করার অধিকার নেই।" সুতরাং ওয়াহ্‌হাবীরা একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন অর্থাৎ কুরআন ও কিছুসংখ্যক হাদীস ছাড়া আর কোনো মাসআলা-মাসাইল মানতে রাজী নন। অবশ্য প্রথমে তারা উম্মতদের মাঝে এই উদ্দেশ্য সরাসরি উচ্চারণ করে নি। পরে যখন কিছুটা শক্তি সঞ্চিত হলো, তখনই তাদের আসল চেহারা প্রস্ফুটিত হয়। অতিসাম্প্রতিককালে ইহুদী-মার্কিন পরোক্ষ মদদে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয়টির মাধ্যমে গণআন্দোলন সৃষ্টি, রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার সুগভীর

ষড়যন্ত্র।

কৌশলী কর্ম তৎপরতা দিয়ে মানুষের মন-মগজ ও বিবেকের কাছে এমন কিছু উদ্ভট যুক্তি খাড়া করেন, যা দেখে-শোনে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা মনস্তাত্বিকভাবে বিব্রত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদীসের বিশেষ বিশেষ অংশ তাদের সামনে উপস্থাপন করে মানুষগুলোকে রীতিমতো ধোঁকা দেওয়া হয়। তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, বুযুর্গানে দ্বীন, মাযহাবের ইমাম, ইসলামী দার্শনিক, সূফী, দরবেশ বলতে গেলে সর্বস্তরের আলিম-উলামাদের তারা কঠোর সমালোচনা করেন।

অন্যদিকে, মওদুদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে রাজনৈতিক ফিল্ডওয়ার্ক। অন্যরা নিজের মনগড়া শরীয়তের আবিষ্কার করে, মওদুদী সাহেব ও তাঁর উত্তরসূরীগণ সেগুলোকে সমাজে প্রচার করেন। জীবতকালে তিনি সেগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। তার ক্ষুরধার লেখনি দিয়ে সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যাতে লোকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে দলভূক্ত হয়। তিনি উপমহাদেশের সারগোদার শহরের এক জনসভায় বলেন, "আমরা খাঁটি ইসলাম পেশ করি; কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ন্যায় নয়। আমরা লিবারিলিজমের প্রবক্তা; কিন্তু আধুনিকপন্থীদের ন্যায় নয়। (জামায়াতের দৈনিক পত্রিকা 'তসলীম' ২০ জুন ১৯৫৫)

ঐদিনই উপমহাদেশের সকল স্তরের জনসাধারণের সামনে মওদুদী মতবাদের আসল চেহারা প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। ফলে মওদুদী মতবাদ যে খাঁটি ইসলামী দল নয় এবং তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ আহলে হাদীস ও সালাফী দলগুলোও যে সাবাঈ ষড়যন্ত্র, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম বক্তৃতা-বিবৃতি লেখালেখি শুরু করেন। শত শত বই-পুস্তক লেখা হয়েছে উক্ত মতবাদ সম্পর্কে। বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে এই তিনটি মতবাদের নতুন নাম হয়েছে- মডারেট ইসলাম অথবা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম।

মাযহাবকে কেনো আক্রমণ করা হলো

চার মাযহাব নিয়ে আক্রমণের মূল কারণ ইসলামের বাউন্ডারী বা দেয়ালে ফাটল সৃষ্টির প্রয়াস।

পূর্বসূরী ইমাম চতুষ্টয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দ্বীনের যে সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরী হয়েছে, তা ইয়াহুদ-নাসারাপন্থী বুদ্ধিজীবিদের অবিজ্ঞতার বাইরে। পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় যেমন তারা বিফল হয়েছে, তেমনি হাদীসের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করতে গিয়েও ইহুদী-খৃষ্টানরা হতাশ হয়েছে। পরবর্তীকালে ইয়াহুদ-নাসারা চক্রান্তকারীরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অবলম্বন করে। যা ইসলামী ইতিহাসের তৃতীয় খলিফার যুগ থেকে স্পষ্ট হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এখনো ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে।

‘ইজতিহাদ’ ও ‘রায়’-এর গোড়ার কথা

আল্লামা শাহরাস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, ইবাদত ও মুয়ামিলাতে মানুষ অসংখ্য ঘটনাবলীর সম্মূখীন হচ্ছিল। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, প্রত্যেক ঘটনা ও বিষয়ের উপর শরঈ দলীল পাওয়া যেতো না, আর এমনটি হওয়াই অতি স্বাভাবিক যে, শরঈ দলীল হলো সীমিত আর ঘটনা ও বিষয়াবলী হলো সীমাহীন। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সীমিত বস্তু কখনো সীমাহীনকে আয়ত্ত করতে পারে না। সুতরাং আবশ্যকীয়ভাবে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন দেখা দিলো। যাতে প্রত্যেকটি ঘটনা ও বিষয়ের প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদ দ্বারা সে প্রয়োজন মেটানো যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য ঘটনার সম্মূখীন হয়েছেন। তাঁদের সম্মূখে কিতাবুল্লাহ্ (আল-কুরআন) এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা হাদীস বর্তমান ছিল। সংঘটিত বিষয়াবলী তাঁরা কিতাবুল্লাহয় সন্ধান করতেন। যদি কোন স্পষ্ট দলীল পেয়ে যেতেন, তবে সে অনুসারে ফয়সালা করতেন। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের দিকে ধাবিত হতেন। হাফিয সাহাবাগণকে তালাশ করা হতো। স্মৃতিশক্তিতে ধারণাকারীগণকে ডেকে এনে ঘটিত বিষয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা ও ফয়সালা সন্ধান করা হতো। যদি চেষ্টা সাধনার পর কোন হাদীস পাওয়া না যেতো, তখন ‘ইজতিহাদ’ ও ‘রায়’ দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা হতো। এ বিষয়টি স্মর্তব্য যে, এ বিষয়ে তাঁরা সে বিচারকের ন্যায় ছিলেন, যিনি কোন বিশেষ বিধি-বিধানের পাবন্দ বটে, কিন্তু কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি যখন বিধি-বিধানের কোন আঁচ না পান, তখন নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে ন্যায়-নীতির চাহিদা অনুসারে ফয়সালা দিয়ে থাকেন।

যেমন হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে লিখেছিলেন, “যে বিষয়টি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে পাওয়া যাবে না এবং তোমার মনেও সংশয় জাগে, তবে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে কাজ করবে এবং সেটিকে তার সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা ও উদাহরণের উপর বিন্যাস করবে।” (সুনানে দারু কুত্নী পৃঃ ৫১২)

সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুগণ কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদ্যমান অবস্থায় তাঁরা তাতে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকতেন। যদি কিতাব ও সুন্নাতে তা না পেতেন, তবে তাঁদের মধ্যকার খ্যাতনামা ফকীহ্গণের ‘কিয়াস’ ও ‘রায়’-এর আশ্রয় নিতেন।

কতিপয় সাহাবী হাদীস ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাত্ওয়ার বিষয়ে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করতেন না। এমতাবস্থায় তাঁরা হাদীসের পরিবর্তে স্বীয় ‘রায়’ দ্বারা ‘ফাতওয়া’ দিতেন- যাতে তাঁদের অজান্তে কোথাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যে কথা সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে যায়।

হযরত ইব্নে হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলতেন, “আল্লাহ্র কসম! যদি আমি ইচ্ছা করতাম

তবে লাগাতার দু'দিন হাদীস বর্ণনা করতে পারতাম। কিন্ত আমার জন্য এ বিষয়টিই প্রতিবন্ধক ছিলো যে, নবীজীর অধিকাংশ সাহাবা আমার ন্যায় হাদীস শ্রবণ করেছেন, আমি যেভাবে তাঁর দরবারে হাযির থাকতাম, তাঁরাও থাকতেন। তাঁরা এখন যে সব হাদীস বর্ণনা করছেন, (তাঁদের স্মৃতিশক্তির কারণে) তা হুবহু তাই নয়। আমার ভয় হচ্ছে আমি যেনো তাঁদের মতো না হয়ে যাই।" (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

আবূ আমর শাইবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি পূর্ণ এক বছর হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" এ কথা বলেন নি। যখন তিনি এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন, তখন তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেতো। তখন তিনি বলতেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 'এমন' বলেছেন, অথবা 'এ ধরনের' বলেছেন অথবা এর নিকটবর্তী বলেছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বীয় 'রায়' দ্বারা 'ফাতওয়া' প্রদানে অগ্রাধিকার দিতেন। যাতে ভুল হলে যিম্মাদারী তিনি নিজের ঘাড়ে নিতে পারতেন, ভুল কোনো কথা বলে যেন তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত না হয়। তিনি নিজের 'রায়' দ্বারা 'ফাত্ওয়া' প্রদানের পর বলতেন. "আমি আমার রায় মতে এ কথা বললাম। যদি তা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, আর যদি ভুল হয় তবে এর যিম্মাদারী আমার উপর ও শয়তানের উপর পড়বে।"

এইসব কারণে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস গ্রহণে সাধারণ মুহাদ্দিসগণের তুলনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্ত আরোপ করতেন। যেহেতু সেকালে হাদীস জালকরণের ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আর যেহেতু সেকালে ইরাক মুসলিম বিশ্বের মাঝে চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক দিক থেকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো, তাই ইরাক হাদীস ও হাদীস জালকারীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিলো। এ কারণেই হাদীস গ্রহণে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিশেষ ব্যবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিলো। আর এ কারণেই তিনি এমন সব নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসই গ্রহণ করতেন যা বিশ্বস্ততার দিক থেকে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। এ দিক থেকে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাধারণ মুহাদ্দিসগণের চেয়ে হাদীস গ্রহণে অধিক সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। এ বিষয়ে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অপর মুহাদ্দিসগণ থেকে অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন বিধায় সাধারণ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে যে সব হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছিলো, তা ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিএর নিকট দুর্বল বলে সাব্যস্ত হতো।

যেমন- একবার ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কার দারুল খাইয়াতীন মহল্লায় মিলিত হলেন। উভয়ের মধ্যে ইল্‌মী আলোচনা শুরু হলো। ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা নামায আদায়কালে রুকুতে যাওয়া অবস্থায় এবং রুকু থেকে উঠাকালে

কেনো হস্তদ্বয় উঠাও না?"

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "কেননা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।" ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "এ কেমন কথা? আমাকে যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন এবং যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে এবং সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরুকালে হস্তদ্বয় উঠাতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন, তখন হস্তদ্বয় উঠাতেন।"

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমাকে হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্রাহীম নাখঈ হতে, ইব্রাহীম, আলকামা ও আসরয়াদ হতে এবং তাঁরা উভয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র নামায শুরুকালেই হাত মুবারক উঠাতেন, তারপর কখনো হাত উঠাতেন না।"

তারপর ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমি তো যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে, যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে, সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে সনদ সূত্রে তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি বলছো, হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন? হাম্মাদের সাথে যুহরীর এবং ইবরাহীমের সাথে সালিমের সম্পর্ক কি?

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে অধিক ফিক্হবিদ এবং ইব্রাহীম সালিমের চেয়ে অধিক ফিক্হাবিদ ছিলেন। আলকামাও ইব্ন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে কম ফকীহ্ ছিলেন না, যদিও ইব্ন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবী। আর আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অতিশয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, "ইব্রাহীম সালিম হতে অধিক ফিকহ্বিদ ছিলেন। যদি ইব্ন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য না পেতেন, তবে বলতাম আলকামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইব্ন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে অধিক ফিকহ্বিদ ছিলেন। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-তো ইব্ন মাসউদই; তাঁর ফিক্হে বিজ্ঞতা কে মোকাবিলা করতে পারে? ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিএর এই কথাগুলো শুনে ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চুপ হয়ে গেলেন।"(ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৭)

যেমন আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, যহরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখনই কূফা আগমন করতেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর খিদমতে হাযির হতেন। তিনি একবার তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল খাত্তাব। একটি বিষয় সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ছেড়ে কয়েক বছর নিরুদ্দেশ থাকলো। তার স্ত্রী মনে করলো যে, তার স্বামী মরে গিয়েছে। সুতরাং সে স্ত্রীলোক অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলো।

এমতাবস্থায় তার প্রথম স্বামী ফিরে এলো। এ সম্পর্কে আপনার ফাত্ওয়া কি? অবশ্য এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিষ্যদেরকে পূর্বাহ্নেই বলেছিলেন, যদি এ বিষয়ে হযরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোন হাদীস বর্ণনা করেন, তবে অবশ্যই তা হবে ভিত্তিহীন। আর যদি তিনি নিজস্ব মত দ্বারা ফাত্ওয়া দেন, তবে ভুল করবেন। ইমাম আযম আবূ হানীফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসার পর কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। প্রথমেই বলো, এমন ঘটনা ঘটেছে, না এখনো ঘটে নাই? উত্তর এলো, না- ঘটে নাই। তখন কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যা ঘটে নাই, এমন বিষয়ে কেনো তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো? তখন ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমরা বিপদ আসার পূর্বেই তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চাই, যাতে বিপদ এলে আমরা তাতে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে পারি।

হাফিজ ইব্ন আব্দুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'লা-মাযহাবী' ও 'আহলে হাদীস' ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনায় চরম বাড়াবাড়ি করেছেন। বলতে কি এ ক্ষেত্রে তারা সীমালংঘন করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অপবাদ এই যে, তিনি 'রায়' ও 'কিয়াস'-কে হাদীস ও আসারের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি দলীল গ্রহণকালে 'রায়' ও 'কিয়াস'-কে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে 'লা-মাযহাবী' 'আহলে হাদীস' বলতে চান যে, যখন হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে, তখন 'কিয়াস' ও 'রায়' বাতিল বলে গণ্য হবে। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কোনো 'খবরে আহাদ' আগ্রহ্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো না কোনো কারণ অবশ্যই দেখিয়েছেন। তাঁর একা এই নীতি অনুসরণ করেন নাই। ইমাম আবূ হানীফা যা করেছিলেন, অবশ্য তা কূফার সকল ইমাম, যেমন ইব্রাহীম নাখঈ ও ইব্ন মাসউদের শিষ্যগণও করেছেন। তবে হ্যাঁ, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ ফিক্হ তৈরী এবং প্রত্যেক যুগোপযোগী একটি ফিক্হশাস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে হতে পারে এমন বিষয়াবলীকে বর্তমান ধরে নিয়ে সে ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতিহাদী 'রায়' 'কিয়াস' ও ইস্তিহসান দ্বারা বুঝা ও তার জবাব প্রদানে সমকালীন মুজতাহিদগণের চেয়ে একটু অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁদের সাথে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য হয়েছিলো। আর এ কারণেই 'লা-মাযহাবী' ' আহলে হাদীস'-গণ তাঁর উপর কঠোর সমালোচনা এবং বিদ্আতের ফতোয়া আরোপ করে ছিলেন।

(এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে যুগের 'লা-মাযহাবী' ও 'আহলে হাদীস' বর্তমান যুগের নব্য লা-মাযহাবী ও আহলে হাদীসের পরম্পরা নয়। সে যুগের লা-মাযহাবী বলতে ঐ সকল ফকীহ্ ছিলেন, যারা কেবল কোনো ঘটনা ঘটলে এর উপর ফতোয়া দিতেন এবং হাদীসের অনুসরণ ও অনুকরণে ছিলেন বদ্ধপরিকর। একইভাবে 'আহলে হাদীস' ঐসব ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হতো, যাঁরা হাদীস নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করতেন। কেবল হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ফতোয়া দিতেন। তারা তাদের নিজস্ব মতামত বা 'রায়' প্রয়োগ করতেন না। কিন্তু বর্তমান যুগের 'লা-মাযহাবী' ও 'আহলে হাদীস' পুরোটাই ভিন্ন। অর্থাৎ আকাশ পাতাল তফাৎ।)

ইব্ন আব্দুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যত্র লিখেন, "একদল মুহাদ্দিস ইমাম আযম আবূ

হানীফাকে ‘মুরযীয়া’ দলভূক্ত বলেও দোষারূপ করেছেন।”

ডঃ মুস্তফা হুসনী সুবাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, “আমার ন্যায় নিষ্ঠ বিচার-বিবেচনায় ইমাম আবূ হানীফার মুরযীয়া হওয়া বিশুদ্ধ সূন্নত সম্মত। বস্তত্বপক্ষে উলামায়ে কেরামের মধ্যে এমন অধিক সংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা ‘মুরযীয়া’ বলে গণ্য। কারণ, মুরযীয়া’ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিএর বিরুদ্ধে যে ঝড় উখাপিত হয়েছে, এমনটি আর কারো অপর হয় নাই। এর একমাত্র কারণ, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের নিকট একজন সর্বসম্মত ইমাম ছিলেন। সুতরাং তাঁর উপর ‘মুরযীয়া’ হওয়ার অপবাদ দেওয়ার অর্থ নিজেও ‘মুরযীয়া’ হওয়া।

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁর উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁর প্রতি এমন সব উদ্ভট কথাবার্তা নিক্ষেপ করেছেন, যা থেকে বস্তুত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। মুহাদ্দিসগণ নিজেরা এমন সব মনগড়া অপবাদ ইমাম আযমের উপর আরোপ করেছেন যা তিনি নন, বরং তা সাধারণ আলিমের প্রতিও আরোপিত হতে পারে না। অথচ একথা স্পষ্ট যে, বিরাট একদল ব্যক্তিত্বশীল উলামা (মুহাদ্দিস) ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি’র ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।”

যাঁরা ইমাম আযমের স্বীকৃতি ও প্রশংসা করেছেন, তাঁদের এক বিরাট তালিকা লিপিবদ্ধ করে ডঃ মুস্তফা হুসানী সুবাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, “অতীতকালে প্রবচন হিসেবে বলা হতো, ‘কারো ব্যক্তিত্বের বিষয়ে নিন্দুকদের অধিক বাড়াবাড়ি তাঁদের ধ্বংসের কারণ হয়।’ এই তো, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর ব্যাপারে অধিক বাড়াবাড়ির ফলে দুটি দল ধ্বংস হয়ে গোলো। একদল তাঁর প্রতি ভালোবাসার বাড়াবাড়ি [শিয়া ও রাফিযী] আর অন্য দল চরম হিংসা পোষণ করে অর্থাৎ ‘খারিজী’ গোষ্ঠি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই আলীর বিষয়ে দু’টি দল ধ্বংস হবে। একদল তাঁর প্রতি চরম ভালোবাসা পোষণকারী, আরেক দল তাঁর প্রতি পরম বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণকারী।” (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -পৃষ্ঠা-১৭২- ১৭৩)

এক কথায় ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি’র যুগটি ছিলো ইল্‌মের যুগ। তাঁর ‘ফিক্‌হ’-এর উসূল ও ফুরূ-এর (শাখা-প্রশাখা) বিন্যাস ও বিভিন্ন মাসাইলের আহ্‌কাম নিরূপণ এবং তাঁর কর্ম পদ্ধতি বিশাল আকার ধারণ করেছিলো। হিদায়ার শরাহ্ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থের লিখক হানাফী মাযহাবের মাসাইলের সংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার বলেছেন।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সাধারণত ফকীহ্‌রা যা শুনেন এবং জ্ঞাত হন, সে বিষয়েই ফাত্‌ওয়া দিয়ে থাকেন। ফিক্‌হের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা ও তা অবহিত করার এই পদ্ধতি সেকালে ছিলো না, যা আজকাল ফকীহ্ ও মুফ্‌তীগণের মাঝে প্রচলিত। (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -পৃষ্ঠা-১৬০- ১৬১)

ফিক্‌হী আহ্‌কাম নিরূপণে ইমাম আযম আবূ হানীফার নীতি অতি আশ্চর্যজনক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিলো। তিনি প্রত্যেকটি মাসআলার দলীল গ্রহণ এবং হুকুম নিরূপণে বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনে এমন সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁর শিষ্যগণও হতবাক হয়ে যেতেন। ইমাম আযম

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিএর এই আশ্চর্যজনক ক্ষমতা সম্পর্কে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই লোকটি (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তো এমন যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই স্তম্ভটি সোনার প্রমাণিত করবেন, তবে নিশ্চয়ই-এর স্বপক্ষে দলীল উপস্থিত করতে পারবেন।" (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -পৃষ্ঠা-১৬২-১৬৩)

অথচ সে যুগেও মুহাদ্দিসগণের কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন, যাঁরা হাদীস জানতেন কিন্তু অর্থ বুঝতেন না। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সেইসব মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এমনও কেউ আছেন, যিনি হাদীস লিখতেন বটে, কিন্তু না অর্থ বুঝার চেষ্টা করেন, আর না হাদীস নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। অথচ যখন তাকে কোনো ফিক্হী মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বসে পড়েন এবং পড়তে শুরু করেন। যেমনটি করেন কোনো মুন্শী।" (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -পৃষ্ঠা-১৬৩)

তথাকথিত 'আহলে হাদীস'দের মধ্যে এরকম আরো অনেকেই ছিলেন। যেমনঃ

ক) জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার এক দুশমন ঢিলা দ্বারা পবিত্র হয়ে উযূ ব্যতীতই 'সালাতুল বিত্র' আদায় করতেন এবং তার এই কাজের জন্য বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা দলীল দিতেন 'মান ইস্তাজমারা ফালইওয়াতির'

হাদীসের 'ফালইওয়াতির' শব্দের অর্থে বুযুর্গ 'সালাতুল বিত্র' বুঝেছেন এবং বিনা উযূতেই নামায আদায় করেছেন। অথচ হাদীসে 'ফালইওয়াতির' অর্থ হলো পবিত্র হওয়ার জন্য তিন, পাঁচ অথবা সাতটি ঢিলা বা বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করার নির্দেশ।

খ) আরেক মুহাদ্দিসকে দরসে হাদীসের মজলিসে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, একটি মুরগী কূপে পড়ে গিয়েছে- এর হুকুম কি? তখন মুহাদ্দিস বললেন, 'তুমি কেনো কূয়ায় ঢাক্না দিলে না? তা হলে মুরগীও পড়তো না, মাসআলাও জিজ্ঞেস করতে হতো না।'

গ) অনুরূপ আরেক মুহাদ্দিস 'নাহা আন ইয়াছক্বীয়ার রাজুলা মা-আহু যার্উ গাইরিন' এই হাদীসের অর্থ বুঝেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর শস্যক্ষেত্রে পানি দ্বারা সিক্ত করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাংকেতিকভাবে যুদ্ধে যে সব মহিলা গর্ভবতী হয়েছিলো, তাদের সঙ্গম করতে নিষেধ করেছিলেন।

উপরোক্ত এইসব অনবিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের বোকামী যখন ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর মজলিসে ফাঁস হয়ে যায়, তখন তারা বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। এ সকল নামেমাত্র মুহাদ্দিসগণ ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সূক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্ণাতিসূক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ, বিজ্ঞতা ও গবেষণাকর্মে হিংসাতুর হয়েই অপবাদ রটাতে শুরু করেন। তাঁর সম্পর্কে মুসলমানদের মনে ঘৃণা সৃষ্টিতে, তাঁর বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারী ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে জঘন্য জঘন্য কথা ছড়াতে থাকে। এমনকি তিনি হাদীস অগ্রাহ্য করতেন বলেও এইসব তথাকথিক মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা অপবাদ আরোপে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮)

মাযহাব ও হাদীসের ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- নূ'মান, উপনাম আবূ হানীফা। বংশ তালিকা- আবূ হানীফা নোমান বিন সাবিত বিন যূতী। প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে তাঁর জন্ম সবার আগে। সমস্ত পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মুসলিম তাঁর মাযহাবের অনুসারী। তিনি 'ইমাম আযম' বলে খ্যাত।

ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কূফা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে তিন ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। কেউ লিখেছেন- তিনি ৬৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ লিখেছেন- ৭০ হিজরী আর কেউ লিখেছেন ৮০ হিজরী। অবশ্য ৭০ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে- অধিকাংশ গবেষক, প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী ও সূত্র বর্ণনাকারীরা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। এখনো বাগদাদ শহরে তাঁর মাজার অক্ষত রয়েছে এবং ঐ এলাকাটি 'আযমীয়া এলাকা' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে এলাকাটির নামকরণ তাঁর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পিতা বাল্যকালে তাঁর দাদার সাথে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর খিদমতে যেতেন এবং বিভিন্ন উৎসবে তাঁর খেদমতে ফালুদা নামক উন্নতমানের আহার্য পেশ করতেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর পিতা ও পিতামহ উচ্চ বংশীয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। একজন সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই 'খলীফাতুল মুসলিমীন'-এর সমীপে এ ধরনে উত্তম আহার্য হাদিয়া দিতে পারেন।

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হন। কুরআন হিফযে তাঁর উস্তাদ ছিলেন হযরত আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ১৭ হিজরীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর সময় কূফা নগরীতে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন। তিনি প্রখ্যাত কুরআন ভাষ্যকার, হাদীসবিদ ও ফকীহ্ মুজতাহিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে কূফার মু'আল্লিম, মুফতী ও গভর্ণরের পরামর্শদাতা হিসেবে পাঠান। এ ছাড়া কূফা নগরে ২০ অথবা ৪০ বদরী সাহাবীসহ প্রায় দেড় হাজার সাহাবীর স্থায়ী বসবাস ছিলো সেখানে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু কূফা নগরীতে 'দারুল খিলাফত' তৈরী করার ফলে সেখানে জ্ঞান চর্চার এক ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পারিবারিক সূত্রে এবং পরিবেশগত ইল্‌মী সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হন।

'মু'জামুল বুলদান' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত কা'ব আল-আহবার রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর কাছে বিশ্ব পরিচিতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা মাখ্‌লূকাতকে সৃষ্টির পর প্রত্যেককে যথাযোগ্য আসবাব ও গুণাবলী দান

করলেন। আক্ল ও বুদ্ধিমত্তা কূফাকে পছন্দ করলে 'ইল্ম' বললো, 'আমিও তোমার সাথে আছি'।

কূফা নগরীতে তখন থেকেই ইল্ম সংগ্রহের দু'টি ধারা সৃষ্টি হয়। একদিকে হযরত আব্দুল্লাহ্ মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। যাঁর সম্পর্কে 'মাকালাতে কাওসারী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর ১৪০ জন শাগরিদ ছিলেন। যাদের একেকজন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ও মুজতাহিদ ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছেন, হযরত আলকামা ইব্নে কায়স নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃতঃ ৬২ হিঃ), হযরত মাসরূক ইবনে আজদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃতঃ ৬৩ হিঃ), আমর ইবনে শুরাহবীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৬৪ হিঃ), শুরায়হ ইবনে হারিস আল-কিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৭হিঃ), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৩ হিঃ) হযরত উবায়দা ইবনে আমর সালমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯২ হিঃ), আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৫ হিঃ) হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৫ হিঃ) প্রমুখ। এঁদের কয়েকজন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর কাছ থেকেও সরাসরি ইল্ম হাসিল করেছেন। ফলে, দু'দিকের ইল্ম অর্জন করে তাঁরা সমকালীন বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

অন্যদিকে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কয়েক শত যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। এরমধ্যে হযরত ইমাম আমির আশ্-শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন অনন্য শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ্ তাবিঈ। তিনি ৪৮ জন সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে রীতিমতো হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর সাক্ষাতে দশমাস অবস্থান করে হাদীসের গভীর ও ব্যাপক ইল্ম অর্জন করেন।

হাফিয যাহ্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে ইমাম শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন। তিনি আরো বলেন, কূফায় ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাদীসে উস্তাদ ছিলেন ২৯ জন তাবিঈ, যারা যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ হিসেবে খ্যাত। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কূফা নগরীতে ৯৩ জন তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "ইমাম আবু হানীফার উস্তাদগণের সংখ্যা এত অধিক যে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হাফ্স আল কাবীর চার হাজার-এর উল্লেখ করেছেন। অপর কেউ কেউ বলেছেন ঃ তাবিঈগণের মধ্যে তাঁর চার হাজার উস্তাদ ছিলেন। তাদের পরবর্তীগণের কথা আর কি বলবো?" (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

আজকের সমাজে এক শ্রেণীর 'শিক্ষিত বোকা'-র আর্বিভাব ঘটেছে। যারা সচরাচর বলেন- 'ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বড় যুক্তিবিদ ছিলেন। তিনি যুক্তির মাধ্যমে মাসআলা আবিষ্কার করতেন। তাঁর মাঝে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ছিলো না।'

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, তৎকালীন একদল খারিজী আলিম ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য লিপ্ত হয়। খারিজীদের ঐ সকল আলিমদের ফতোয়া হচ্ছে- "কবীরা গুনাহ্কারী কাফির হয়ে যায়।" তারা ইমাম আযমের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাছে এসে বললো- 'মসজিদের দরোজায় দু'টি জানাযা হাজির। একটি হলো এক মদ্যপায়ী, যে অধিক মদ্যপানের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। দ্বিতীয়টি এক ব্যাভিচারিণীর, যে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলো এবং গর্ভধারণের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কোন্ ধর্ম ও গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো? এরা কি ইয়াহুদী? খারিজীরা উত্তর দিলো, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি খৃষ্টান? খারিজীরা উত্তর দিলো, না। ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা তো অগ্নিপূজক নয়? তারা বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সবশেষে তাদের সম্পর্ক কোন্ দ্বীনের সাথে? খারিজীরা বললো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর সাক্ষ্যদাতা মিল্লাতের সাথে। ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক আছে। এবার বলুন, কালেমা তাইয়িবার শাহাদত কি ঈমানের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, না এক-পঞ্চমাংশ? খারিজী আলিমরা বললো, ঈমান বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় না।

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, এই সাক্ষ্যের সাথে ঈমানের সম্পর্ক কি? জবাবে খারিজীরা বললো, পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ইমাম আযম বললেন, তারপর এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রশ্নের কি অর্থ থাকতে পারে যাদের মু'মিন হওয়ার বিষয়ে আপনারা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছেন? খারিজীরা বললো, এখন আমাদের বলুন, এরা কি জান্নাতী না জাহান্নামী? ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি তাদের বিষয়ে সে কথাই বলবো যা, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এদের চেয়ে আরো জঘন্য অপরাধী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছিলেন, "সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীম আয়াত- ৩৬)

আর ঐ কথাই বলবো যা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এদের চেয়েও বড় গুনাহ্গার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছিলেন, "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদা, আয়াত- ১১৮)

আর যখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-কে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিলো, "আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো অথচ ইতর জনেরা তোমার অনুসরণ করবে" (সূরা শু'আরা, আয়াত- ১১১) তখন তিনি বলেছিলেন, "তারা কী করতো তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব নেয়া তো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে; মু'মিনদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। (সূরা শু'আরা, আয়াত- ১১২-১১৪) ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম-এর কথারই পুনরাবৃত্তি করবো, "তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তা হলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (সূরা

হূদ, আয়াত- ৩১) ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সিদ্ধান্ত শুনে খারিজীরা নিশ্চুপ চলে গেলো। (তথ্যসূত্রঃ মানাকিবে আবূ হানীফা [মাক্কি] খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৪)

ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে তর্কযুদ্ধে ও যুক্তিতর্কে যোগ দিতেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ইমাম হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে নিষেধ করতেন। ইমাম তনয় হাম্মাদও রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সে যুগের এক বিরাট মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি একবার পিতা আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তর্কযুদ্ধ করে থাকেন, অথচ আমাকে নিষেধ করেন কেনো?' উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'আমি তর্কযুদ্ধকালে গভীরভাবে এ বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখি যে, বিরোধী পক্ষ যেনো এ সব থেকে বিরত থাকে। আর তোমাদের এ বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকে তোমাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা ও লজ্জিত করা। যারা নিজের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল কিংবা লজ্জিত করার ইচ্ছা রাখে, মূলত তারা যেনো তাদের প্রতিপক্ষকে কাফির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষকে কাফির বানাতে চায়, সে প্রতিপক্ষকে কাফির সাব্যস্ত করার পূর্বেই নিজে কাফির হয়ে যায়।' (ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃষ্ঠা- ৩৮)

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাদীসের জ্ঞান ও মাসআলা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল বর্ণনাকারীই এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের হাফিয ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বারো লক্ষ হাদীসের বিরাট সম্ভার সংকলন করে বারো লক্ষ মাসআলা সৃষ্টি করেছিলেন। কারো মতে তিনি দেড় লক্ষাধিক হাদীস জানতেন। কেউ কেউ লক্ষাধিকও বলেছেন। কোনো ঐতিহাসিকদের মতে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ন্যুনতম তিরাশী হাজার হাদীসের হাফীয ছিলেন। এই সংখ্যার নিম্নে কোনো ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেন নি। আর সবগুলো মাসআলাই কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়েছে।

কাযী ইয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মাদারিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'একদিন মদীনা শরীফে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। দীর্ঘ সময় তাঁরা ইল্মী আলোচনা ও পর্যালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারপর ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘর্মাক্ত অবস্থায় ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। হযরত লাইস ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে ঘর্মসিক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো? আপনি এমন ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন কেনো? ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাবে বলেন, আমি আবূ হানীফার সাথে মুনাযারা ও মুনাকাশায় (পরস্পর আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিতর্ক) ঘর্মাক্ত হয়েছি। হে মিসরী (ইবনে সা'দ), 'নিঃসন্দেহে তিনি (আবূ হানীফা) একজন মস্তবড় ফকীহ্।"

উল্লিখিত গ্রন্থে এ-ও লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উদ্ভাবিত ষাট হাজার মাসাইল সংগ্রহ করেছিলেন এবং গভীরভাবে এগুলো অধ্যয়ন করতেন। (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা-৪২১)

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শিষ্য। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিন বছর কাল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে হানাফী মাযহাবের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি বাগদাদ থেকে বিদায় নেবার দিন বলেন, "আমি ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে এক উটের বোঝার পরিমাণ ইল্‌ম বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মধ্যজীবনের ছাত্র। ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি তিন বছরকাল আবূ ইউসুফের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিকট হতে জ্ঞানের তিনটি বৃহৎ ভান্ডার লিখেছি।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা-৪২১)

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আবূ আব্দিল্লাহ্ মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী। পরিচিত নাম ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর উপাধি 'ইমাম দারুল হিজরত' এবং মদীনা তায়্যিবার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ৯৩ হিজরীতে পবিত্র ভূমি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে শাইবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনামতে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম সাল ৯৫ হিজরী। তিনি মদীনা লেখাপড়া ও জ্ঞান সাধনা করে ১৭৯ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে শেষ শয্যা গ্রহণ করেছেন।

মদীনার প্রখ্যাত মুজতাহিদ রাবীয়াতুর-রায় হতে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে হাদীস ও ফিকহী জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ তাবিঈন থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ হাদীসই তিনি ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছেন এবং রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুদীর্ঘকাল হাদীসের চর্চা ও জ্ঞান অর্জন করেছেন বলে তাঁকে, 'হিজাযের ইমাম' বলা হতো। বিশ্বে বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষার জন্য ছুটে আসতো। তিনি মসজিদে নববীতে যখন হাদীসের দরস্ দিতেন, তখন ভালো পোশাক পরতেন এবং খুশবো ব্যবহার করে অত্যন্ত নম্রতার সাথে বসতেন। তাঁর আওয়াজ কখনো উঁচু হতো না।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভযোগ্য গ্রন্থ 'মুআত্তা'। হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেন, "এই গ্রন্থটি সংকলনের পর আমি মদীনার সত্তরজন ফকীহ্‌র সমীপে তা পেশ করলাম। তাঁরা সবাই আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। এই কারণেই আমি গ্রন্থটির নাম মুআত্তা রাখলাম।"

মুআত্তা 'শুধু হাদীসের কিতাব' সম্পর্কে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একমত না হলেও এটা সত্য যে, মুওয়াত্তা একটি গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতমানের হাদীস ও ফিক্‌হী সমাধানযুক্ত গ্রন্থ। মুআত্তায় সর্বমোট ১৭২০টি হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ৬০০ হাদীস সনদযুক্ত।

অতিসাম্প্রতিককালের একদল 'পঙ্গু শিক্ষিত' বলেন যে, 'ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাদ্দিস ছিলেন না এবং মুআত্তা হাদীসের কিতাব নয়। অথচ এদের বিদ্যার্জনে যে পঙ্গুত্বের সমস্যা রয়েছে তা হয়তো তারা নিজেরাই জানে না।

বিশ্বের সমস্ত উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যানুযায়ী প্রমাণিত যে, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদে নববীতে হাদীসের দরস দিতেন। তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ্, হাদীসবিদগণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে এসে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরসে হাদীসে বসে জ্ঞান অর্জন করতেন।

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম শাফিঈ'র পূর্ণ নাম- আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে শাফিঈ। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বংশ পরম্পরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলে যায়। তিনি ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বছর বয়সে মায়ের সাথে পবিত্র ভূমি মক্কা শরীফে চলে আসেন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এখানেই গ্রহণ করেন। তিনি আরবী সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায় পান্ডিত্য হাসিল করেন। পরবর্তীতে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান নিয়ে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। মদীনায় অবস্থানের পর তিনি সরকারী চাকুরী নিয়ে ইয়েমেনে গমন করেন। সেখানে ১৮৪ হিজরীতে তার উপর একটি মামলা দায়ের করা হয়। এতে তিনি প্রশাসনের রোষানলে পতিত হন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অন্যতম শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের হস্তক্ষেপে বিষয়টি সমাধান হয় এবং তিনি সসম্মানে রেহাই পান। পরে তিনি ইমাম মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বাগদাদে কিছুকাল কাটিয়ে দেন। অবশেষে তিনি ১৯৯ হিজরীতে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তাঁর মাযহাবের প্রবর্তন ঘটে। ২০৪ হিজরীতে তিনি মিসরেই ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পুরো নাম- আবূ আব্দিল্লাহ্ আহমদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী। ১৬৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশিষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসূফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইল্‌ম অর্জন করেন। তিনি তাকওয়া, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, বিশ্বস্ততা এবং সত্যের উপর দৃঢ় থাকার কারণে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। সমস্ত বিশ্বের তৎকালিন উলামায়ে কেরাম তাঁকে সুনজরে দেখতেন। 'খাল্‌কে কুরআন' বিষয়ে তিনি চরম দৃঢ়তার সাথে মুতাযিলাদের সাথে মুকাবিলা করেছেন এবং শাসনযন্ত্রের নানাবিদ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

'খাল্‌কে কুরআন' বিষয়ে ইমাম আহমদের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দৃঢ়তা ও অবিচলতা যুগ

যুগ ধরে মুসলমানদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলিত মুসনাদে আহমদ একটি প্রসিদ্ধ হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাব। তিনি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের হাফিয ছিলেন। তা থেকে চল্লিশ হাজার হাদীস ছাটাই-বাছাই করে মুসনাদে স্থান দেন। তিনি বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলিত না করে, সাহাবী ভিত্তিক সংকলন করেন। অর্থাৎ এক সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস তিনি একস্থানে লিপিবদ্ধ করেন। এতে বিষয়ভিত্তিক হাদীসের সন্নিবেশ ঘটেনি।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে কখনো মতভেদ দেখা দিলে তোমরা মুসনাদের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি সে হাদীসটি মুসনাদে পাওয়া যায়, তবে ভালো কথা, আর যদি সে হাদীস মুসনাদে না পাও তবে তা হুজ্জত্ নয়।' সুতরাং 'মুসনাদে আহমদ' সম্পর্কে একদল মুহাদ্দিসীনের অভিমত হচ্ছে, 'মুসনাদে বর্ণিত সকল হাদীসই হুজ্জত এবং তাতে বর্ণিত সকল হাদীসই বিশুদ্ধ।'

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৪১ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় মুসলিম জনতার বিশাল জমায়েত ঘটেছিলো।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবা আন-জুফী। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসীন ও হাফিযে হাদীসগণের ইমাম ছিলেন। এতে কোনো প্রকার মতপার্থক্য নেই। তিনি ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর দিন বর্তমান রাশিয়ার বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স থেকে হাদীস হিফয (কণ্ঠস্থ) করা শুরু করেন। তিনি বলেন, "হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরাতে দু'বার, বসরা নগরীতে চারবার সফর করেছি। ছয় বছর হিজাযে অবস্থান করেছি। কূফা ও বাগদাদে মুহাদ্দিসীনের সাথে কতবার গিয়েছি তার কোনো হিসেব নেই।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইসলামী দুনিয়ার এমন কোনো শহর ভ্রমণের বাকী রাখেন নি। হাদীসে কোনো শায়খের নাম শুনলেই তিনি সাথে সাথে তাঁর নিকট যেতেন এবং প্রথমে তাঁকে পরীক্ষা করতেন, প্রশ্ন করতেন, তারপর তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন। স্মৃতিশক্তি, মুখস্থকরণ, স্মৃতিতে ধারণ, হাদীসের সনদ ও মতনের গুপ্ত দোষত্রুটি অনুধাবনে ইমাম বুখারীকে আল্লাহ্ তাআলা আশ্চর্যতম ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। একবার বাগদাদের মুহাদ্দিসীন তাঁর স্মৃতিশক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পর্কে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ইতিহাস খ্যাত এ ঘটনাটি ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি ও ইল্‌মে হাদীসে তাঁর ইমামতের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। হাদীস ও সুন্নাত অনুসন্ধান ও সংগ্রহের পথে চরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনে, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে আল্লাহ্ পাক তাঁকে এমন গুণ দান করেছিলেন যে, যার

কারণে সারা বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং মাহমূদ ইবনে নাযির ইবনে সাহল আশ-শাফিঈ বলেন, "আমি বসরা, সিরিয়া, হিজায ও কূফা গিয়েছি। এখানকার মুহাদ্দিসীনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি দেখেছি, যেখানেই মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কথা আলোচিত হতো, তাঁরা সবাই তাঁকে সবার ঊর্ধ্বে সম্মান দিতেন।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ্ হাদীসসমূহ একত্রিত করতে, সেগুলোকে যাছাই-বাছাই করতে, তারপর সাজাতে সুদীর্ঘ ষোল বছরকাল সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর কর্ম পদ্ধতি এই ছিলো যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখনই তিনি কোন হাদীস লিখতেন, তখন প্রথমে উযূ করে দু'রাকাত নামায পড়তেন, তারপর হাদীস লিখনের বিষয়ে আল্লাহর কাছে 'ইস্তিখারা' করতেন। অবশেষে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ্ বুখারীতে শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ্ ও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত ও প্রমাণিত হাদীসসমূহই লিপিবদ্ধ করেন এবং এমন সব রাবীর হাদীসই সংকলন করেন, যাঁদের ন্যায়পরতা, বিশুদ্ধতা, হিফ্য ও সংরক্ষণ এবং তাঁর উস্তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-র নিকট শুধু হাদীসের রাবী তাঁর উস্তাদের সমকালীন হলেই তাঁর বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট ছিলো না বরং উস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সাক্ষাতের স্পষ্ট প্রমাণ মিললেই তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। এদিক থেকে তাঁর গ্রন্থটি সন্দেহমূক্ত ও সূক্ষ্ণ শর্তাবলীর উপর সংকলিত। শুধু তাই নয়, উক্ত গ্রন্থটি 'যঈফ' ও 'হাসান' হাদীস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতেই বিরোচিত। এ কারণেই তা 'সহীহ বুখারী' বলে প্রসিদ্ধ।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গ্রন্থটিকে হাদীস ও ফিকহের পরিচ্ছেদ-এর উপর বিন্যাস করেন। তবে এর সাথে তিনি আহকামে শরীয়ার দিকে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি রাখেন এবং অতিশয় দূরদৃষ্টির সাথে এ কাজ সমাধা করেন। চরম সতর্কতা অবলম্বন করে তিনি সমস্ত আহ্কামে শরীআহ্ ও ফিক্হী মাসাইল গ্রন্থে বর্ণনা না করে 'তরজমাতুল বাব' এ তা উল্লেখ করতেন। হাদীস দ্বারা তার প্রমাণ পেশ করতেন।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ্ বুখারীতে শরঈ আহকাম উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মাওকূফ, আসার, মুআল্লাক হাদীস, সাহাবা ও তাবিঈনের ফাতওয়া ও উলামায়ে কেরামের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় সহীহ্ বুখারী সম্পর্কে লিখেন, 'সহীহ্ বুখারীতে মুকাররার (পুনরোল্লেখ) হাদীসসহ মোট ৭৩৯৭টি হাদীস রয়েছে। এ সংখ্যাতে 'মুআল্লাক হাদীস, মুতাবে' রিওয়ায়াত ও মাওকূফ আছারসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়। মুকাররার ব্যতীত শুধু মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা হলো ২৬০২।

হাফিয যাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'ইমাম বুখারীর 'আল-জামিউস সহীহ্' ইসলামী গ্রন্থগুলোর মধ্যে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যদি কোন হাদীস শিক্ষার্থী এই গ্রন্থ স্বয়ং তার রচয়িতা কিংবা তাঁর কোন্ শিষ্য থেকে শোনা বা পড়ার জন্য এক হাজার মাইল সফর করেন, তবুও তাঁর পরিশ্রম বিফল হবে না।'

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ্ বুখারীকে যখন হাদীস পিপাসুদের সম্মুখে পেশ

করেন এবং তার দারস দেয়া শুরু করেন, তখন তাঁর সুখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দূরদুরান্ত থেকে হাদীস পিপাসুগণ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে সহীহ্ বুখারী শ্রবণের জন্য দলে দলে এসে জামায়েত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে সহীহ্ বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে পৌঁছে যায় এবং সহীহ্ বুখারীর কপি হাতে হাতে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের মুহাদ্দিসগণ অপরাপর গ্রন্থের পরিবর্তে সহীহ্ বুখারী পড়তে, পড়াতে, মুখস্থ করতে ও করাতে এবং তার শরাহ্ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) লিখা নিজেদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

ফলে, সহীহ্ বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা বা শরাহ্ এ পর্যন্ত ৮২টি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া সহীহ্ বুখারীতে উল্লিখিত হাদীসের রাবীদের জীবনী গ্রন্থও রচিত হয়েছে অর্ধশতাধিক। তিনি ২৫৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পুরো নাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। ২০৪ হিজরীতে তিনি (রাশিয়ার) নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম বিশ্বের সব কটি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথাকার হাদীসের বড় উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদগণের নিকটও তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম বুখারীর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। তিনি ইমাম বুখারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যাঁর কারণে ইমাম মুসলিম সহীহ্ মুসলিম সংকলনে ইমাম বুখারীর অনুসরণ করেছিলেন। সহীহ মুসলিম শরীফে মুকাররার হাদীস ব্যতীত চার হাজার হাদীস রয়েছে। তিনি ২৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম নাসাঈর পূর্ণ নাম আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব। তিনি সমকালিন যুগের সর্বজনমান্য একজন হাফিযে হাদীস ও ইমাম ছিলেন। হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা শাস্ত্রের প্রথম কাতারের একজন নেতা ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ২১৫ হিজরীতে ইমাম নাসাঈ (রাশিয়া) খুরাসানের 'নাসা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম বিশ্ব, তথা খুরাসান, হিজায, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, জাযিরা প্রভৃতি অঞ্চল সফর করেন এবং তথাকার হাদীসের উস্তাদ ও ইমামগণের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। ইল্‌মে হাদীসে বিরাট পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাফিয যাহাবী বলেন, 'ইমাম নাসাঈ ইমাম মুসলিম-এর চেয়েও উঁচু স্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)। তিনি ৩০৩ হিজরীতে মক্কার 'রামলা' এলাকায় ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পুরো নাম- সুলাইমান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আল-আসাদী আস-সিজিস্তানী। আফগানিস্তানের কান্দাহার ও চিশ্‌ত-এর নিকট 'সীস্তান' নামক স্থানে তিনি ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আবূ দাঊদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উস্তাদ, যেমন ইমাম আহমদ ইবনে আবূ শাইবা, কুতাইবা ইবনে সাঈদ থেকে হাদীস শুনেছেন, ইমাম নাসাঈ ও অপরাপর ইমামগণ আবূ দাঊদ থেকে হাদীস শুনেছেন।

ইমাম হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'ইমাম আবূ দাঊদ নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।'

ইমাম সুলাইমান আল-খাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ আপনাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন যে, আবূ দাউদ-এর সুনান একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কীয় বিষয়ে এ ধরণের গ্রন্থ অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। উলামা ও ফুকাহার সর্বস্তরে এ গ্রন্থখানি সমাদৃত। ফুকাহার মধ্যে মাযহাবী মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থখানি ফয়সালাকারীর ভূমিকা পালন করেছে। ইল্‌মের সকল পিপাসু ব্যক্তিই এ দ্বারা পিপাসা নিবারণ করেছেন। ইরাক, মিসর পশ্চিমা দেশসমূহের অধিবাসীগণ ছাড়াও অনেক দেশের ফকীহ্‌গণ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করছে। বুখারী ও মুসলিমের ব্যাপারে খুরাসানবাসীরা অধিকতর আসক্ত হলেও আবূ দাউদ-এর গ্রন্থ বিন্যাস ও ফিক্‌হী আহ্‌কাম সংগ্রহের দিক থেকে তা বুখারী ও মুসলিম-এর চেয়েও অধিকতর উপকারী। অবশ্য আবূ ঈসা তিরিমিযীর গ্রন্থ 'জামে তিরমিযী'ও এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম গ্রন্থ।' (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৭৫ হিজরীতে বসরা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে ৪৮০০ হাদীস তাঁর সুনানের জন্য নির্বাচিত করেন। ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত সুনানে আহ্‌কাম সম্পর্কিত হাদীসই সংকলিত করেছেন। (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম ইবনে মাজাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পূর্ণ নাম আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্। ২০৭ হিজরীতে কাযবীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই হাদীস অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভে ব্রতী ছিলেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম লাইছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্রদের থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা ও গ্রহণ করেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে আবূ ইয়া'লা আল-খলীল আল-কাযবিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর 'ইতিহাস' ও 'সুনান' সবিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইরাকে আরব, ইরাকে আযম, মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্রে তিনি সফর করেছেন।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

হাফিয ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সুনানে ইবনে মাজাহ্তে মোট ৩২টি পরিচ্ছেদ, পনেরশত অধ্যায় এবং চার হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস ব্যতীত সকল হাদীসই অতি উত্তম।"

তিনি ২৭৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মাজাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ ৫টি হাদীস সংকলন গ্রন্থকে মৌলিক ও সহীহ্ গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত করেন। তৎপরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ ও উলামায়ে কেরাম সুনানে ইবনে মাজাহ্কেও মৌলিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে এ পর্যন্ত সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা মৌলিক সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে, ১) বুখারী শরীফ। ২) মুসলিম শরীফ। ৩) সুনানে সানাঈ শরীফ। ৪) সুনানে আবূ দাউদ শরীফ। ৫) জামে তিরমিযী শরীফ। ৬) সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরীফ। সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরীফকে সর্বপ্রথম ৫০৭ হিজরীতে হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহির আল-মুকাদ্দাসী সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ অর্থাৎ সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন। (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পূর্ণ নাম- আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাতা আস-সুলামী আত্-তিরমিযী। রাশিয়ার খুরাসান এলাকার তিরমিয শহরে ২০৯ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সময়কার প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণ যেমন- কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে মূসা, সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-দের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বলেন, "ইমাম তিরমিযী সর্বসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ। তাঁর বিশুদ্ধতার জন্য এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী হাদীসের বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করতেন এবং থেকে হাদীসও গ্রহণ করতেন।" (তথ্যসূত্রঃ ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্)

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জন্মস্থান তিরমিয শহরে ২৭৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইবনে তাইমীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পূর্ণ নাম- তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবদুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন আবদুল্লাহ্ বিন তাইমীয়া আল হার্রানী ৬৬১ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল (২২ জানুয়ারী ১২৬৩ খৃষ্টাব্দ) সোমবার দামেশ্‌কের নিকটবর্তী হার্রান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরা হার্রান শহর আক্রমণ শুরু করলে তাঁর পিতা পরিবারকে নিয়ে দামেশ্‌কে চলে যান। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় দামেশ্‌ক শহর থেকেই।

তাঁর পিতা আব্দুল হালীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সে যুগে হাম্বলী মাজহাবের একজন সুপণ্ডিত। পিতার কাছে তিনি ফিকাহ্, ব্যবহার-শাস্ত্র, উসূলে ফিকাহ্, ব্যবহারিক আইন শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন। তিনি তের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই পবিত্র কুরআন শরীফ হিফ্‌জ করার সাথে আরবী ভাষায়ও পাণ্ডিত্য হাসিল করতে সক্ষম হন। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুই শতকেরও অধিক শিক্ষকের কাছে হাদিস শিক্ষা করেছেন বলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন। তবে তাঁর রচিত 'আরবাউনা হাদীসান' গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত শিক্ষকের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর জীবনকর্মে কোনো উস্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি-না তা বলা কঠিন। কারণ সমসাময়িক কালে মুসলিম সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ উদ্দীপনা দেখান এবং ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও সুফীদের প্রতি যে অসহযোগী মনোভাবের পরিচয় দেন, তাতে তাঁর কোনো শিক্ষক বা পূর্বসূরীদের মতের সাথে আদৌ কোনো মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু ইবনে তাইমীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গ্রন্থাবলী নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করে দেখলে বুঝা যায় তাঁর প্রচেষ্টা নিছক ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে 'সাল্‌ফে সালিহীন' বা আদি যুগের আদর্শবান ধার্মিক মুসলিম

সমাজের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন সমসাময়িক মনীষীর পরিকল্পনা অনুসরণ করেন নাই। আর এজন্য বিশ্বমুসলিম জাহানে তাঁর এ আন্দোলন মুখ্যত 'সালাফী আন্দোলন' নামেই পরিচিত।

তিনি ৭২৮ হিজরীর যিলকদ (২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দ) মাসের ২০ তারিখ সোমবার কারারুদ্ধ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (সূত্র- ইবনে তাইমীয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

বর্তমান লা-মাযহাবীদের স্বরূপ

বর্তমান যুগেও ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সৃষ্ট ফিকাহ্‌র উপর বিরুদ্ধবাদীদের জঘন্য আক্রমন অব্যাহত রয়েছে। এইসব আক্রমন যে, শুধু ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে তা নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপঃ লন্ডন থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'ইসলামী সমাচার' ৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দে ২৯ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে, "ভারত থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আল-মাহমুদ' নামক পত্রিকার জুলাই-আগষ্ট সংখ্যায় একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। চিঠিটি লিখেছেন সৌদী আরব সরকারের 'আল-মুফতি প্রশাসন'-এর ফতোয়া ও অনুবাদ বিভাগের প্রধান ডঃ মোহাম্মদ লোকমান আল সালাফী। চিঠির ভাষায় উপমহাদেশের ইসলামী প্রধান প্রধান দাওয়াতী কর্মকাণ্ডকে যেমন সমালোচনা করা হয়েছে, তেমনি বিশ্বের বৃহত্তম হানাফী ফিকাহ্‌কে 'মহামারী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে একমাত্র 'সালাফী জামাত' ছাড়া আর সকল মাযহাব ও ইসলামী দলকে গোমরাহী ও বাতিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও ফকীহ্‌দের ব্যাপারে কটুক্তি করা হয়েছে। আমরা সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে চিঠিটির বঙ্গানুবাদসহ মূল কপিটিও হবহু প্রকাশ করলাম। - সম্পাদক, ইসলামিক সমাচার

"সম্মানিত মাওলানা মুহাম্মদ আরশাদ সালাফী
ইবনে তাইমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সলার
মদীনাতুস্‌ সালাম, বিহার
ভারত।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্‌,

আশাকরি আপনারা ভাল আছেন। আপনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে যে কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছেন, সত্যিই এটি বিরাট প্রশংসার বিষয়। কিন্তু গত কিছুদিন হতে এ বিরাট বিবর্তন ও সংশোধনী পদক্ষেপে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, তার প্রতিচ্ছবি নিয়ে জনগণের সামনে আসছে না। এতে মনে হচ্ছে যে, আপনি হানাফীদের

DR. [illegible]
[illegible]
Riyadh . 11131

د/ محمد [illegible]
باحث فتاوى ومدير إدارة الترجمة
بمكتب سماحة المفتي العام للمملكة

[illegible]

আগ্রাসী তৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্ত। মনে রাখবেন, বিশ্বাবিদ্যালয় মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সালাফী তৎপরতাকে সাধারণ করে দিয়ে অত্র এলাকা হতে হানাফী মাযহাবের মহামারীকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া। কেননা হানাফী মাযহাবের এ মহামারী ইসলামের আসল রূপকে শেষ করে দিয়েছে। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের পরিবর্তে তারা ইসলামী ফিকহার নামে একটি নতুন শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করে এবং উম্মতে ইসলামীকে শির্‌ক, বিদআত এবং গোমরাহীর পথে ধাবিত করে। অথচ এখানে বিহারের একজন বিচারক ফেকাহ একাডেমী এবং ফেকাহ সেমিনারের নামে অপরদেরকে উল্লু বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বরবাদ করে দিয়েছে। এ মাওলানা একজন প্রতারক। বর্তমানে তিনি তার পা-কে সৌদি আরবে মজবুত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু খোদার শপথ, আমি তা কখনও হতে দেব না। আমি সৌদি সরকারকে এই মর্মে ভালভাবেই জানিয়ে দিয়েছি যে, সালাফী জামাত ছাড়া পাক-ভারত উপমহাদেশের সকল জামাতই গোমরাহী এবং বাতিলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। খোদার শপথ, আমার নিকট একজন অমুসলমানকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, একজন হানাফী মাযহাব অনুসারীকে সঠিক পথে আনয়ন করা। ইবনে তাইমিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য দেশ হতে এবং দেশের জনগণের মধ্য হতে হানাফী মাযহাবের বিষাক্ত এবং অপবিত্র জীবাণু খতম করে দেয়া এবং মুসলমানদেরকে আবু হানীফার ফিকহার অনুসরণের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণ এবং তাঁর হাদীসের উপর আমল করার প্রশিক্ষণ দেয়া। আমার মতে ফিকাহ এমন একটি মাকরূহ্, অনাকাংখিত ও অপবিত্র বিষয় যার উপর প্রস্রাব করলে প্রস্রাবও আরো বেশি অপবিত্র হয়ে পড়ে।

এসবের চেয়ে আরো খারাপ হলো, তাবলীগ জামাতের প্রসার। দাড়ি-টুপী, লম্বা জামা ও পাগড়ীকে আসল সুন্নত মনে করে এই পথভ্রষ্ট জামাত পুরো জাতিকে অকর্মন্য, অলস এবং প্রতিক্রিয়াশীল করায় বদ্ধপরিকর। এদের দৃষ্টিতে তাবলিগী নেছাব কুরআন শরীফ হতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাবলিগী নেছাব হলো, কতকগুলো মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনীর সমাহার। এই তাবলিগী মিশনও হলো, মুসলামনদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্তের একটা অংশবিশেষ। তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে খুবই দ্রুততর পদ্ধতিতে নিজেদের চক্রান্তে নিয়ে আসে। এদের বিরুদ্ধে যদি সঠিক পদ্ধতিতে এবং পুরো শক্তি নিয়ে এদেরকে নিঃশেষ করা না যায় তাহলে ইসলামের আসল রূপ শেষ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় এই কথাই ছিলো যে, এসব বাতিল, মুশরিক এবং অনৈসলামিক জামাতের বিরুদ্ধে বই-পুস্তক লিখে এবং তা প্রচার করে সবাইকে সতর্ক করা এবং সবাইকে আসল ইসলামী তাওহীদের ধারণায় ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করা। কিন্তু আমি দেখছি- একাজ খুবই মন্থর গতিতে সামনে এগুচ্ছে। আমি আপনাদের কেন্দ্রের মিশন নিয়ে আশংকিত। তাবলিগী নেছাবের জবাবে আমরা যে ব্যাপক দলিল সম্বলিত “আল-দেওবন্দিয়া” নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেছি এতেকরে দেওবন্দীদেরকে আমরা বে-নেক্বাব করে দিয়েছি এবং একই সময়ে আমরা মৌলভী আসআদ মাদানীর নিদ্রাও হারাম করে দিয়েছি। সে এখন আরব শেখদের নিকট সাফাই গাওয়ায় ব্যস্ত। নদওয়ার আলেমগণও কবরপুজা এবং ফাতেহা খানির রুছুম-রেওয়াজ হতে মুক্ত নয়। বরং তারা

দেওবন্দীদের চাইতেও একধাপ এগিয়ে আছে। আলী মিয়া [সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] যদিও সর্বসম্মতিক্রমে একজন বড় ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত, তথাপি তিনিও তাঁর পিতৃপুরুষের মানদাত্তা তাছাওফের উপর গালেব থাকার কারণে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে অপারগ। কিন্তু তারপরও তার আশেপাশের কিছু আলিম খুবই মুক্তমনা। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। খুব সম্ভব আমি নিকটবর্তী সময়ে নদওয়ায় সফর করবো। আমার বিশ্বাস, আমাদের সালাফী তৎপরতায় নদওয়াও শামীল হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে সালাফী তৎপরতা চালাতে গিয়ে আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস এখন তা আর হতে হবে না।

ঢাকা জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে আপনারা যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তা নিশ্চয়ই ফলপ্রসু হবে। তিনি ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের বিরোধিতা করার এ বেওকুফী করবেন না। প্রয়োজন হলে তার উপর টাকা খরচ করবেন। সময়ে অসময়ে মাদ্রাসা ও মসজিদের নামে সাহায্য দিতে থাকুন। বর্তমান সময় হলো বস্তুবাদের। টাকা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে অনেক মুকাল্লেদ আলেম [মাযহাবের অনুসারীরা] পাবেন যারা পর্দার আড়ালে সালাফী মুভমেণ্টকে সাহায্য দিয়ে যাবেন। ফলে আপনি খুবই আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যান।

শেখ খুরশীদকে আমার সালাম দিবেন। তিনি যেন সূফী হয়ে ঘরে বসে না থাকেন। বরং পুরো সহযোগিতার ভিত্তিতে যেন তিনি কাজ করে যান।

আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী
মোহাম্মদ লোকমান সালাফী
৫ই জানুয়ারী ২০০০।"

"ঠিকানা-
ডঃ মোহাম্মদ লোকমান আল সালাফী
ফতোয়া এবং অনুবাদ বিভাগের প্রধান
আল-মুফতি প্রশাসন
সৌদি আরব।"

উপরোক্ত চিঠিখানা ইসলামী সমাচারে প্রকাশিত হবার পর পরই বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ, মন্তব্য, চিঠিপত্র ও টেলিফোন আসতে থাকে। ডঃ মোহাম্মদ লোকমান আল সালাফী খোদ ইসলামী সমাচারে প্রকাশিত চিঠিটি পাঠ করেছেন কি-না জানা যায় নি, তবে তাঁর সাক্ষর করা একটি প্রতিবাদ ইসলামী সমাচারে প্রকাশিত হয়। ডঃ লোকমান সালাফীর সে প্রতিবাদও নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

"ইসলামীক সমাচারে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে সৌদী সরকার প্রশাসনের ব্যাখ্যা-

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)সহ অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি মহব্বত রাখা আমার নাজাতের

Dr. Md. Luqman Salafi
Darul Ifta
Riyadh, 11131

د/ محمد لقمان السلفي
باحث فتاوى ومدير إدارة الترجمة
بمكتب سماحة المفتي العام للمملكة

[illegible]

পথ মনে করি -ড: লোকমান আল-সালাফী

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে হাজির নাজির যেনে যার কুদরতী হাতে আমার গোটা উম্মতের সামনে আমি প্রকাশ করছি যে, দুই পৃষ্ঠাব্যাপী যে পত্রটি আমার নামে প্রকাশিত হয়েছে। তা জামেয়া ইবনে তাইমিয়্যাহকে দুর্নাম করার জন্য আমার নামে মিথ্যা, বানোয়াট করা হয়েছে। যা আমার জন্য প্রকাশ্য অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

ইহাই উদ্দেশ্য যে, আমাকে আশ-শায়েখ মোহাম্মদ আরশাদ এবং জামেয়া ইবনে তাইমীয়্যাহ-এর প্রতি দুর্নাম করা।

আমি আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোয়া করছি যে, যারাই আমার এ লেখা পড়বেন আমার সাথে আমিন বলবেন। যদি এ পত্রটি আমার হাতের হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা যেন আমার প্রাণ সংহার করেন। আর যদি ইহা আমার নামে অপবাদ হয় তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাদেরকে ধ্বংস করেন। যারা এ ষড়যন্ত্র করেছে। যাতে উম্মত তাদের এ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে।

(১) যে পত্রটি আমার নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ জাল। সাক্ষরটিও জাল। আমার নামের নিচে যে তারিখ লেখা হয়েছে ১৫ জানুয়ারী, যা হাত চেপে লেখা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ জাল। এ চিঠি আমার নয়। এটা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

(২) আমি যখনই শায়খে মুরশীদকে লেখি তখন “আজিজে গেরামী ক্বদর” লেখি। যেহেতু পত্রটি জাল। সুতরাং লেখা হয়েছে, ফজিলতুস শায়খ মোহাম্মদ আরশাদ সলফী।

(৩) জাল পত্রে মারকাজে আল্লামা ইবনে বাযের নাম মারকাজে আহক্বীম লেখা হয়েছে, যা আরেকটি ভুল ।

(৪) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সহ অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি মহব্বত রাখা আমার নাজাতের পথ মনে করি।

(৫) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়্যাহ (রঃ) লেখা হতে আমরা সে শিক্ষাই পেয়েছি।

(৬) “ইসলামী ফিকাহ” কে আমি কুরআন, সুন্নাহের ব্যাখ্যা মনে করি। সুতরাং ইমামগণকে যেমন ইমাম বোখারী, ইবনে তাইমীয়্যাহ, শাফী, মালিক, আওজায়ী গং রয়েছেন। তাদেরকে নিস্পাপ মনে করি না।

(৭) আমাদের জামেয়া ইবনে তাইমীয়্যার শিক্ষক মহোদয়গণ সব সময় ছাত্রদেরকে সমস্ত উলামাদের সম্মান করা শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

(৮) আল্লাহ্ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে লেখছি, আদ দেওবন্দীয়াহ কেতাবের লেখক পাকিস্তানী-এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(৯) তাবলিগী জামাত তাদের উসুলের উপর রয়েছেন। তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

(১০) মারকাজে আল্লামা ইবনে বাযের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র দাওয়াতী কিতাবের প্রচার প্রসার। কোন ইখতেলাফ বিষয় নিয়ে আমরা বাড়াবাড়িতে নয়।

(১১) আমাদের প্রোগ্রামগুলোর দারুল উলূম দেওবন্দ এবং নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌর

শিক্ষক মহোদয়গণও উপস্থিত থাকেন।

(১২) ঢাকা জামে মসজিদের ইমামও আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তার ভারসাম্য জীবন আমার কাছে ভাল লাগে।

মোট কথা গোটা চিঠি জাল বা বানোয়াট। এর সাথে আমার বা আমার জামেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছি আল্লাহ্ তায়ালা যেন জামেয়া ইবনে তাইমীয়্যাহকে হেফাজত করেন। এবং তার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে কুরআন তথা সুন্নাহর চেরাগ জ্বালিয়ে দিন।

আমি আশাবাদী যে, আমার এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ইসলামের মহান বৃক্ষ জামেয়া ইবনে তাইমীয়্যাহ উন্নতিকল্পে সর্বস্তরের মুসলমানগণ আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন

মুহাম্মদ লুকমান সলফী

প্রতিষ্ঠাতা জামেয়া ইবনে তাইমীয়্যাহ

মারকাজ আল্লামা ইবনে বাজ মদীনাতুস্ সালাম

৯ রবিউস সানী, ১৪২১ হিজরী।

(বিঃদ্রঃ জনাব ড: মুহাম্মদ লোকমান সলফী সাহেবের উক্ত প্রতিবাদ লীপিটি আমাদের হাতে এসেছে গত রমজান মাসে। উর্দুভাষায় লেখা তাঁর ব্যাখ্যাটি আমরা বাংলায় তরজমা করে ছাপালাম। - সম্পাদক)

মওদুদীবাদী লা-মাযহাবীদের কৌশলী তৎপরতা

একইভাবে নব্য 'সালাফী মুভমেন্ট' ও 'আহলে হাদীস'-পন্থীদের নতুনধারার আক্রমণ আরো বিজ্ঞতাপূর্ণ ও কৌশলী। তিনটি দল একত্রিত হয়ে তারা যে ইসলামের মূল অবকাঠামোর উপর হিংস্র ছোবল ও সূদুরপ্রসারী আক্রমণ চালিয়েছেন, তা আজকের এই আধুনিক যুগে অধিক পরিলক্ষিত ও সাধারণ সমাজে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। একশ্রেণীর একাডেমিক শিক্ষিত সাধারণ পাঠক এইসব লেখালেখি, আলোচনা, পর্যালোচনা ও যুক্তিপ্রমাণ অনুধাবন করে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। যেমন, লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি দলীয় মাসিক ম্যাগাজিনের একটি প্রশ্নোত্তরকে কেন্দ্রকরে একটি পুস্তিকা রচিত হয়েছে।

উক্ত দলীয় ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রশ্ন ও উত্তর হচ্ছেঃ- "প্রশ্নঃ কিছু মুসলমান ভাইয়েরা প্রকাশ্যে বলেন যে, ইমাম আবু হানিফা মুজতাহিদ, মুহাদ্দেছ ছিলেন না। তিনি একজন যুক্তিবাদী ছিলেন মাত্র। সে যুগে হাদিস চর্চার অভাবেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হয়, তাহলে কোটি কোটি হানাফী মাযহাবের অনুসরারীরা যারা মারা গেছেন এবং জীবিত আছেন, তারা সুন্নি না বেদাতী এবং নাজাত-এর উপায় কী? যারা চার মাযহাবের অনুসারী মুলত রাসুলের (সাঃ) এবং সালফে সালিহীনদের অনুসারী বলে দাবি করা হয়-এ ব্যাপারে বিস্তারিত

বক্তব্য অনুগ্রহ করে জানাবেন।”

“জবাবঃ একটি পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে বিস্তারিত জবাব দেয়ার সুযোগ কতুটুকু রয়েছে তা নিশ্চয় আপনার জানা; তারপরও আপনার প্রশ্নটি বড়ই বিতর্কিত। এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ হেফাজতের স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদিসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এ ক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়। অন্যথায় ফিতনায় পড়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে বলে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন, “কেহ যদি অন্ধভাবে কেবল আমার মত জেনেই অনুসরণ করা শুরু করে দেয় বিনা তাহকিকে, তাহলে সে বিভ্রান্ত এবং পদদলিত হবে”। তিনি আরো বলেছেন, “যখন কোন ছহীহ হাদীস আমার রায়ের বিপক্ষে পাওয়া যাবে তখন হাদীসের বক্তব্যই আমার মাযহাব, এক্ষেত্রে আমার রায়কে অনুসরণ করা গুনাহের কারণ হবে”।

এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনা করলে আসল কথা পাওয়া যাবে। আর তাহলো, তাঁর সময়ে হাদীসের উৎকর্ষ ততটা সাধিত হয়নি তা যেমন সঠিক, তেমনিভাবে কেবল তাঁর উপর ভিত্তি করে চলাও নিরাপদ নয়। অতএব, আজকাল সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুস্কর মোটেও নয়। তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরন করতে যাবেন। আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে কোন ইমামের অনুসরণ থেকে তো নবীর হাদীসের অনুসরণ উম্মতের ঈমানের দাবী। যারা মারা গেছেন তাদের বেলায় মন্তব্য করা জায়েয নেই বরং দোয়া করা দরকার এবং জীবিতদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আমল শুরু করা দরকার।”

উল্লিখিত প্রশ্ন এবং উত্তরকে কেন্দ্রকরে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটির নাম, “মাযহাব নিয়ে বিভ্রান্তি- একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠার মুখোশ উন্মোচন”

পুস্তিকাখানি বৃটেনে অবস্থানরত দু’জন তরুণ আলিম সম্মিলিতভাবে রচনা করেছেন। অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলিল ভাষায় রচিত পুস্তিকাখানি অধিক তথ্য এবং তত্ত্ব নির্ভর এতে সন্দেহ নেই।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে তারা লিখেছেন, বর্ণিত ম্যাগাজিনে দেয়া এ উত্তরটি সকল মাযহাবপন্থীদের কাছে একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে ঈমানের দাবিদার প্রত্যেক মুমিনের জন্য ইসলাম বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব রয়েছে। আর এ প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। তাই বর্ণিত প্রশ্নের জবাবে যেসব কথাগুলো মাযহাব প্রসংগে ‘ইসলামী শরীয়তের’ দৃষ্টিতে আপত্তিকর বলে মনে করেছি, তা সর্বমোট ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন-

১) এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদীসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এ ক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়।

২) এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনা করলে আসল কথা পাওয়া যাবে। আর তা হলো, তাঁর সময়ে (অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার সময়ে) হাদীসের উৎকর্ষ ততটা সাধিত হয়নি তা যেমন সঠিক, তেমনিভাবে কেবল তাঁর উপর ভিত্তি করে চলাও নিরাপদ নয়।

৩) অতএব, আজকাল সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুষ্কর মোটেও নয়। তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরণ করতে যাবেন।

৪) আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে কোন ইমামের অনুসরণ থেকে তো নবীর হাদীসের অনুসরণ উম্মতের ঈমানের দাবি।

৫) যারা মারা গেছেন তাদের বেলায় মন্তব্য করা জায়েয নেই বরং দোয়া করা দরকার এবং জীবিতদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আমল শুরু করা দরকার।

সুতরাং বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর উক্ত পাঁচটি অংশের ধারাবাহিক জবাব পেশ করছি।

জবাব নং-১

ক. (মাওলানা সাহেবের কথা)

এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদীসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়।

খ. (আমাদের বক্তব্য)

মাওলানা সাহেবের দেয়া জবাবের আপত্তিকর প্রথম অংশে অতি পরিস্কার করেই বলা হয়েছে যে ঈমান ও ইবাদতের স্বার্থে কেবলমাত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফই মানা যায় এবং কার কথাটি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সেটাই গ্রহণযোগ্য। এতে অন্য কোন অনুসরণীয় বিষয় তাঁর জানা থাকলেও সেটা বলেন নাই, এমনকি এর পক্ষে কোন কিতাবের রেফারেন্সও উল্লেখ করেন নাই। অতএব, এখানে বাদ পড়ে গেল দু'টি বিষয়। আর ইহা হচ্ছে আল্ ইজমা' এবং আল্ কিয়াস। তাহলে বুঝা গেল ইচ্ছে করেই প্রথম দু'টি (আল কুরআন ও আল হাদীস) রেখে ওপর দু'টি (আল ইজমা' ও আল কিয়াস) পরিত্যাগ করলেন?

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- মুমিনের জন্য অনুসরণীয় 'পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থার' নামই 'পূর্ণাংগ ইসলামী শরীয়'ত'। কেউ যদি শেষ দু'টি ছাড়া প্রথম দু'টিকে অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁকে 'পূর্ণাঙ্গ শরীয়'তপন্থী' বলা যাবে না। বাংলাদেশের কওমী এবং সরকারী মাদ্রাসার সিলেবাসে যারাই ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেছেন অর্থাৎ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে আলিম হয়েছেন, তারা আবশ্যিকভাবে ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। আর ফিকাহ শাস্ত্র কখনই 'উছূলে ফিক্বাহ্' ছাড়া বুঝা সম্ভব হয় না। সরকারী মাদ্রাসার সিলেবাসে 'আলিম ও ফাযিল জামাতে' যে উছূলেফিক্বাহ্-এর কিতাব পড়া হয় সেটার নাম 'নূরুল আন্ওয়ার'। উক্ত কিতাবে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, ফক্বীহ্ ও মুজতাহিদ, শাইখ আহমাদ ইবনে আবু সাঈদ উর্ফে হযরত মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইসলামী শরীয়'তের মূল ভিত্তি' সম্পর্কে তাঁর লেখা উছূলের কিতাবে বলেন- "মূলতঃ ইসলামী শরীয়'তের মূল ভিত্তি হলো চারটি। এগুলো হচ্ছে-আল কুরআন, আল

হাদীস, আল ইজমা এবং আল কিয়াস।”

তাছাড়া “উছূলুশ্ শা-শী-মাআ’ আহ্সানুল হাওয়া-শি” মূল কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, শরীয়’তের উছূল চারটি। ১ম. আল কুরআন, ২য়. আল হাদীস, ৩য়. আল ইজমা, ও ৪র্থ. আল কিয়াস। উক্ত কিতাবের মধ্যে ৮৩/৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে- শরীয়’তের দলীলের মধ্যে কিয়াস হচ্ছে একটি আবশ্যিক ও অন্যতম দলীল। যখন বাকী তিনটির মধ্যে ইসলামী আইনের কোন সমাধান না পাওয়া যায়, তখন কিয়াছের উপর আমল করা ওয়াজিব।

এখানে বলা যাবে, যদি ‘পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরীয়তের’ দলীল কেবলমাত্র দু’টি অনুসরণীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে উছূলেফিকাহ্ এর কিতাবে তা উল্লেখ থাকতো। এ ছাড়া অন্যান্য উছূলের কিতাবেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরীয়’তের মূল ভিত্তি চারটি বলে উল্লেখ আছে।

অতএব, ম্যাগাজিনে দেয়া মাওলানার জবাব অনুসরণ করবো, না উছূলের কিতাবের ভাষ্য অনুসরণ করবো, সেটা বিজ্ঞ মহলের কাছে জিজ্ঞাসা। আমাদের জানা মতে ‘উছূলেফিক্বাহ্ এর ভাষ্য ভুল’ এমন কথা কোন আলিমের মুখে কখনও শুনিনি, আর কারো পক্ষে এমনটা বলা সম্ভবও নয়।

সুতরাং আমাদের ধর্মীয় সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ‘আদিল্লায়ে আর্‌বাআ’ (আল কুরআন, আল হাদীস, আল ইজমা’ এবং আল কিয়াস)-কেই অনুসরণ করতে হবে। আর আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআ’তের দাবিদার কেউ-ই উছূলেফিক্বাহ্‌র ভাষ্য অস্বীকার করতে পারেন না।

জবাব নং-২

ক. (মাওলানা সাহেবের কথা)

এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনা করলে আসল কথা পাওয়া যাবে। আর তা হলো, তাঁর সময়ে (অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার সময়ে) হাদীসের উৎকর্ষ ততটা সাধিত হয়নি তা যেমন সঠিক, তেমনিভাবে কেবল তাঁর উপর ভিত্তি করে চলাও নিরাপদ নয়।

খ.(আমাদের বক্তব্য)

মাওলানা সাহেব তাঁর জবাবের আপত্তিকর ২য় অংশে বলেছেন যে, এসব মূলনীতিকে (কুরআন ও হাদীসকে) সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনা করলে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্নানুসারে মুজতাহিদ, মুহাদ্দিছ অর্থাৎ ইসলামী শরীয়’তের অনুসরণীয় প্রধান দুই মূলনীতির (কুরআন ও হাদীসের) ফক্বিহ তথা চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে আসল কথা পাওয়া যাবে। আর সেই আসল কথা হলো, মাওলানা সাহেবের ধারণা যেহেতু ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সময়ে হাদীসের উৎকর্ষ ততটা সাধিত হয়নি, অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রের উপর কেউই উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি বা হাদীস শরীফের উপর শিক্ষা লাভ তেমন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেনি তা যেমন সঠিক, তেমনিভাবে এই অনুপযুক্ত আলিম, মুহাদ্দিছ, ফকিহ ও মুজতাহিদের জ্ঞান-গবেষণাকে অনুসরণের মাধ্যমে কেবল তার উপর ভিত্তি করে চলাও নিরাপদ নয়। (নাঊযু বিল্লা-হি মিন যা-লিক)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ মাওলানা সাহেবের লেখা এ অংশে অতি স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, (তাঁর কথামতো) কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের বিবেচনায় ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে হাদীস শরীফের যেহেতু তেমন উল্লেখযোগ্য জ্ঞান চর্চা হয়নি বা হাদীসের উপর তৎকালে আলিম-উলামাদের খুব ভালো একটা অধ্যাপনা ছিলনা, তাঁর মতে এটা সত্য। সেজন্য অল্পমাত্রার জ্ঞান চর্চার অধিকারী ব্যক্তি (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা তাঁর মতে নিরাপদ নয়, কারণ স্বল্প শিক্ষিত কারো চিন্তাধারা ও আবিস্কৃত মাসআলা-মাসাইলের উপর আমল করা নিরাপদ হওয়ার কথা নয়। যাক, উক্ত জবাবের প্রতিবাদে আমার জন্য এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে তিনি (ইমামে আযম) অথবা অন্য কোন আলিম, ফক্বীহ বা মুজতাহিদের মাধ্যমে হাদীস শরীফের উপর যুগোপযোগী জ্ঞানচর্চা, অধ্যাপনা ইত্যাদি হয়েছে কি না। তাছাড়া মাওলানা সাহেবের কলমে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো বিশ্ব বরেণ্য মুজতাহিদকেও একজন মুহাদ্দিছ, মুজতাহিদ বলে গণ্য করা হলো না। কাজেই, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে হাদীস শরীফের উৎকর্ষ সাধনের বা হাদীস শরীফের ব্যাপক চর্চা ও অধ্যাপনার বর্ণনা পেশ করার আগে বিশেষ প্রয়োজনে কুরূনে ছালা-ছার আলোচনা পেশ করা প্রয়োজন। ।

এক নযরে ‘খাইরুল কুরূন’ বা (তিন) সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, মুজতাহিদ জগতের নয়নমণি, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ, মুসলিম বিশ্বের এক অনুপম নিয়া’মত, ইজতিহাদ জগতের আলোকবর্তিকা, উস্তাযুল ফুক্বাহা- ওয়ালমুজতাহিদীন, সৃষ্টিকুলের মহামানব, হযরত (নু’মান বিন ছাবিত) ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাদীস শাস্ত্রের উপর অধ্যাপনা এবং তাঁর যুগে উলামায়ে কেরামের হাদীস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন সেই ঐতিহাসিক সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগের কথা। যে তিন যুগকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘খাইরুল কুরূন’ তথা ‘সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ’ বলে মূল্যায়ণ করেছেন।

এ প্রসংগে একটি মশহুর হাদীস- “হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ’লা আন্‌হু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম (যুগ) হলো আমার ও (সাহাবীগণের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবিঈনদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবি’ তাবিঈন) যুগ।”

সূত্রঃ

১) বুখারী শরীফ ১/ ৩৬২ ও ৫১৫ পৃষ্ঠা। ২) বুখারী শরীফ ২/ ৯৫১ পৃষ্ঠা। ৩) মুসলিম শরীফ / ৩০৯ পৃষ্ঠা। ৪) আবূ দাউদ শরীফ / ২৯২ পৃষ্ঠা। ৫) তিরমিযী শরীফ / ৪৫, ৫৪ ও ২২৬ পৃষ্ঠা। ৬) ইবনে মাজাহ শরীফ / ১৭২ পৃষ্ঠা। ৭) মিশ্‌কাত শরীফ / ৫৫৩ ও ৫৫৪ পৃষ্ঠা।

হিজরী সনসহ ‘খাইরুল কুরূন’ এর বিস্তারিত বিবরণঃ

১ম যুগঃ (শুরু থেকে ১০০ হিজরী পর্যন্ত) ১০০ বছর। [নবী ও সাহাবীদের যুগ]।

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহের মধ্যে ১ম যুগকে দু'টি পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। আর সেটা নিম্নরূপ-

(ক) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের (আনুষ্ঠানিকভাবে নুবুওয়াত লাভ করার) পর থেকে আছহাবে রাসূলের ইন্তিক্বাল পর্যন্ত ১২০ বছর। -বাযলুল মাজহূদ ৬/২০৩ পৃষ্ঠা।

(খ) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিক্বালের পর থেকে আছহাবে রাসূলের ইন্তিক্বাল পর্যন্ত ১০০ বছর। আর ইহাই প্রসিদ্ধ মত। -ফাতহুল বারী ৭/ ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা, আত্‌তা'লিকুছ ছাবীহ (শরহে মিশকাত) ৭/ ২৯০ ও ২৯১ পৃষ্ঠা।

২য় যুগঃ

১০১ হিজরী থেকে ১৭০ হিজরী পর্যন্ত ৭০ বছর। [তা-বিঈনদের যুগ]।

১) বুখারী শরীফ ১/ ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাশিয়া ১।

২) মিরক্বাতুল মাফা-তিহ (শরহে মিশ্‌কাত) ১১/২৭৬ পৃষ্ঠা।

৩ আবু দাউদ শরীফ ২/২৯২ পৃষ্ঠা, হাশিয়া ৬।

৪) বাযলুল মাজহুদ শরহে আবীদাঊদ ৬/২০৩ পৃষ্ঠা।

৩য় যুগঃ

১৭১ থেকে ২২০ হিজরী পর্যন্ত ৫০ বছর। [তাবি তা-বিঈনদের যুগ]।

১) বুখারী শরীফ ১/৩৬২ পৃষ্ঠা, হাশিয়া ১।

২) মিরক্বাতুল মাফা-তিহ (শরহে মিশ্‌কাত) ১১/২৭৬ পৃষ্ঠা।

৩) আবু দাউদ শরীফ ২/২৯২ পৃষ্ঠা, হাশিয়া ৬।

৪) বাযলুল মাজহুদ শরহে আবীদাঊদ ৬/২০৩ পৃষ্ঠা।

অতএব-

১ম যুগঃ (শুরু থেকে ১০০ হিজরী পর্যন্ত) ১০০ বছর। [নবী ও সাহাবীদের যুগ]।

২য় যুগঃ ১০১ হিজরী থেকে ১৭০ হিজরী পর্যন্ত ৭০ বছর। [তা-বিঈনদের যুগ]।

৩য় যুগঃ ১৭১ থেকে ২২০ হিজরী পর্যন্ত ৫০ বছর। [তাবি তা-বিঈনদের যুগ]।

ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগঃ (৮০-১৫০ হিজরী)-

উস্তাযুল মুজতাহিদীন ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান-গবেষণার বিবরণ খুব ব্যাপক। যে তিন যুগকে স্বয়ং নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ'বলে অভিহিত করেছেন, সেই কুরূনে ছালা-ছার ১ম স্তরেই (হিজরী ৮০ সনে) এ মহান বুযুর্গের জন্ম হয়। এবং ইন্তিক্বালও হয়েছে ২য় স্তরে (১৫০ হিজরী সনে)। কাজেই তাঁর এ পূন্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে একাধিক ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন মনে করি। আর সেগুলি হচ্ছে- ১ম ভাগঃ মর্যাদা। ২য় ভাগঃ জ্ঞান আহরণ। ৩য় ভাগঃ তাক্বওয়া বা পরহেযগারী।

বিস্তারিত বিবরণ

১ম ভাগঃ মর্যাদা

১) 'ইমাম' সম্বোধন করে তাঁকে নবীজি কর্তৃক সালামের জবাব প্রদানঃ

ইমামে আ'যম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে 'ইমা-মাল মুসলিমীন' বলে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা নিম্নের একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন এ প্রসংগে "মুহাম্মাদ ইবনে আবুবাকার ইব্রাহীম উর্ফে হযরত শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (জন্ম ৫১৩ হিজরী) এর লেখা মূল 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' নামক কিতাব, মুমতাযুল মুহাদ্দিছীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযীযুল হক সাহেব কর্তৃক (একত্রে প্রকাশিত) বঙ্গানুবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনাটি হলো-

"কথিত আছে, পাক রওযায় উপস্থিত হয়ে তিনি (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, আস্‌সালা-মু আলাইকা ইয়া- সায়্যিদাল মুরসালীন! অর্থাৎ হে রাসূলগণের সর্দার! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রওযা মুবারক থেকে জবাব আসে, ওয়াআলাইকুমুস্ সালা-ম, ইয়া-ইমা-মাল মুসলিমীন! অর্থাৎ হে মুসলিমগণের ইমাম! আপনার উপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক।"

লক্ষণীয় যে- স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে বিশ্ব মুসলিমের ইমাম বলে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, সে মহান ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, চিন্তা করলে আবেগ আপ্লুত হতে হয়। অতএব, আমরা তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে 'বিশ্ব ইমাম' বলে আখ্যা দিতে পারি।

২) স্বপ্নযোগে ফক্বীহ হওয়ার আলামতঃ

উক্ত 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' নামক কিতাবের ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় ক'টি অসাধারণ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে স্বপ্নের তা'বীর হয়েছিল, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইল্‌মে ফিক্বাহ্ এর উপর পান্ডিত্য অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে আজীবন দ্বীনে ইসলামের উপর সহজ-সরল ভাবে চলার ব্যবস্থা করে দিবেন এবং এ যুগের মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের এক অদ্বিতীয় আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন। (বঙ্গানুবাদের আলোকে)

স্বপ্নগুলি হচ্ছে-

"তিনি (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলেন কোন এক রাতে। (যেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রওযা শরীফ থেকে পবিত্র হাড় মুবারক তুলে জমা করছেন এবং একখানা আরেকখানা থেকে পৃথক করছেন। স্বপ্নের এমন অবস্থা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে তিনি জেগে উঠলেন এবং বিখ্যাত স্বপ্নবিশারদ আল্লামা ইবনে

সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক শিষ্যের কাছে গিয়ে বর্ণিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি (স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার) বললেন, এ স্বপ্নের অর্থ আপনি মহানবীর জ্ঞানরাজী, ফিক্বাহ ও হাদীস শাস্ত্রে এরূপ বুৎপত্তি লাভ করবেন যে, এর দ্বারা উক্ত শাস্ত্র-সমূহের ভাষ্যকার হবেন। আর সত্যকে অসত্য থেকে পৃথক করার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দান করবেন। বলাবাহুল্য, এ স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থে ফলবতী হয়।"

তিনি (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো একবার স্বপ্ন দেখেন-"প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু হানীফা! আল্লাহ আপনাকে আমার সুন্নাত ত্বরীক্বা জীবিত রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। নির্জন বাস করবেন না।" তাছাড়া এ মহান বুযুর্গের শানে সরাসরি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিরন্তন ভবিষ্যৎবাণীও বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে।

৩) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীঃ

ইমাম যুরক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম হবে আবু হানীফা। তিনি আমার উম্মতের আলোকবর্তিকা হবেন"।

(৪) বুযুর্গানের স্বপ্নঃ

হযরত আবু আ'লী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি এক রাতে হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্হুর ক্ববরের পার্শে শুয়েছিলাম, সে রাত্রে স্বপ্নে দেখি আমি যেন মক্কায় আছি, আর নবীপাক সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধকে শিশুর মতো কোলে নিয়ে 'বনীশাইবা' দরজা দিয়ে বের হয়ে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে (নবীজীকে) ক্বদমবুছি করলাম। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম নবীজীর কোলে কে এই বৃদ্ধ? নবীজী বললেন- ইনি মুসলিমগণের ইমাম- হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (তাযকিরাতুল আওলিয়া পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

হযরত ইয়াহয়া মাআয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে একবার নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, আমাকে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছেই পাবেন। (তাযকিরাতুল আওলিয়া পৃষ্ঠা ৩৩)

(৫) আছহাবে রাসূলের সাক্ষাত লাভ ও তা-বিঈ হওয়াঃ

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আছহাবে রাসূলের সাথে সাক্ষাত লাভ এবং তিনি তা-বিঈ হওয়ার ব্যাপারে নিম্নের বর্ণনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যেমন-

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সময়ে (৮০ থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত) আছহাবে রাসূলের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা হলেন-

১. হযরত আ'ব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু, ইন্তিক্বাল ৮২ হিজরী অথবা পরে।

২. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু, ইন্তিক্বাল ৯১ হিজরী।

৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্‌হু, ইন্তিক্বাল ৯৩ হিজরী।

৪. আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্‌হু, ইন্তিকাল ১০০ হিজরী।

তা ছাড়া ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে- ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্‌হুকে সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সুবহা-নাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহ্। এছাড়াও উক্ত সময়ে বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরোও অনেক জীবিত ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রঃ-"ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি" পৃষ্ঠা-৫-৬।

২য় ভাগঃ

জ্ঞান আহরণ

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন ও হাদীসের উপর যে কতটুকু জ্ঞান রাখতেন, তা সম্পূর্ণটা আমাদের পক্ষে আলোচনা করে শেষ করার মতো নয়। তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া জ্ঞানভান্ডারের উপর যারাই বক্তব্য রেখেছেন, তারা হচ্ছেন, ওপর তিন মাযহাবের ইমামগণ, তাঁর বিশেষ শাগরিদবৃন্দ, বিশ্বের খ্যাতনামা মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও আলিম-উলামা। এ মহান বুযুর্গের ইল্‌মী যোগ্যতা অর্থাৎ পান্ডিত্য নিয়ে তথ্যপূর্ণ ও বহুল প্রচারিত অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে ক'টি প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এবিষয়ে আলোকপাত হবে। এর আগে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইল্‌মে ফিক্বাহর সিলসিলা (ইলিম অর্জনের ক্ষেত্রে উস্তাদগণের ক্রমধারা) ও আছহাবে রাসূলের সাক্ষাতের বর্ণনা তুলে ধরছি। যেমন-

ইল্‌মে ফিকাহর সিলসিলা

১. হযরত ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির প্রধান উস্তাদ হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

২. হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির প্রধান উস্তাদ হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

৩. হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির প্রধান উস্তাদ হযরত আ'লক্বামা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

৪. হযরত আ'লক্বামা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির প্রধান উস্তাদ হযরত আ'ব্দুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্‌হু। (তিনি একজন বিশিষ্ট ফক্বীহ শ্রেণীর সাহাবী)

৫. হযরত আ'ব্দুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্‌হুর একক উস্তাদ সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্‌নাবিয়্যীন, দু-জাহানের সরদার, বিশ্বনবী, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম।

(এক) প্রামাণ্য গ্রন্থঃ 'সীরাতে নু'মান'

আলোচনা-

এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত, (প্রথম মুদ্রণ ২০০১ ঈসায়ী) আল্লামা শিবলী নু'মানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লেখা মূল উর্দু ভাষায় রচিত কিতাব- 'সীরাতে নু'মান' মাওলানা মুহাম্মাদ রাযী নু'মানী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা' নামক ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থ। এখানে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, মুজতাহিদ ও ফক্বীহদের উক্তি রয়েছে। তাই সর্বাগ্রে ওপর তিন মাযহাবের ইমামগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্য তোলা হচ্ছে। যেমন- উপক্রমণিকার ১, ২ ও ৩ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যথাক্রমে-

ক. "ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৯৩-১৭৯ হিজরী) এর মন্তব্যঃ (উপক্রমণিকা পৃঃ নং ২)

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, আমি এমন এক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, যিনি ঘরের এই স্তম্ভকে (ইল্‌মের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে) যুক্তি দ্বারা স্বর্ণের স্তম্ভে পরিণত করে দিতে পারেন'। (তারীখে বাগদাদঃ খঃ ১৩ঃ পৃষ্ঠা ৩৩৮)"

খ. ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৫০-২০৪ হিজরী) এর মন্তব্যঃ (উপক্রমণিকা পৃষ্ঠা নং ১-২)

তিনি বলেনঃ

"যে ব্যক্তি ফিকাহ্ এর ইলিম হাছিল করতে চায়, সে যেন ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর ছাত্রদের সান্নিধ্য লাভ করে। কারণ, ফিকাহ্ এর ব্যাপারে সকলেই (ইমাম) আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মুখাপেক্ষী।" (তারীখে বাগদাদঃ খন্ড ১২ পৃষ্ঠা ৩৪৬)

"যে ব্যক্তি আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব পড়বে না, ইল্‌মে তার গভীরতা হবে না এবং জ্ঞানও তার অর্জিত হতে পারে না। আবু হানিফার কথা এবং কাজ তাঁর ফিকাহর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (উকূদুল জিমানঃ পৃঃ ১৮৭)

"অন্যান্য যাবতীয় ফক্বীহ আলিমগণ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ।" (তাযকিরাতুল মুহাদ্দিছীন পৃষ্ঠা ৬৬)

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ওয়াকী' ইবনে জার্‌রাহ বলেনঃ

"আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, যিনি আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে অধিক ফকীহ হতে পেরেছেন এবং তাঁর চেয়ে বেশি ভাল করে নামায পড়তে পেরেছেন"।

গ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪-২৪১ হিজরী) এর মন্তব্যঃ (উপক্রমণিকা পৃষ্ঠা নং ২)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "তিনজন এমন ব্যক্তি আছেন, যারা কোন মাস্‌আলায় একমত হয়ে গেলে, সেখানে আর ইখতিলাফ করার কোন সুযোগ থাকে না'। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে সেই তিন ব্যক্তি? তখন তিনি জবাব দিলেন, "আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং (তার দুই বিশেষ ছাত্র) ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। (আল-আনসাব লিস্

সাম্‌আ'নীঃ খন্ডঃ ৮,পৃঃ ২০৪)

ইব্রাহীম হারবী বলেন- "আমি একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সুক্ষ্ম মাসআলাহসমুহ আপনার কাছে কোথা থেকে আসলো? তিনি জবাব দিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (ইমাম আবু হানীফার ছাত্র) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব থেকে।" (তারীখে বাগদাদঃ খন্ড ২ পৃষ্ঠা ১৭৭)

(ঘ) শাইখুল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "ইমাম আযমের ইন্তিকালের কয়েক দিন পর তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বাগদাদ পৌঁছলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন "আবু হানিফা, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিক্বাল করেছেন, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত (ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে) রেখে গেছেন। হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিক্বাল করেছেন, তিনিও একজন স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন, কিন্তু আফসোস; সারা দুনিয়ার কেউ তোমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।" (উকূদুল জিমান)

(দুই) প্রামাণ্য গ্রন্থঃ মাযহাব কি ও কেন?

আলোচনা-

মোহাম্মদী বুক হাউস, বাংলাবাজার ঢাকা-কর্তৃক প্রকাশিত ও আবু তাহের মেসবাহ কর্তৃক বাংলাভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি দু'টি মূল গ্রন্থের সংযোজন। গ্রন্থের ১ম ভাগ হচ্ছে- শরীআ' কোর্ট পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিচারপতি, আল্লামা তাক্বী উছমানীর লেখা 'তাক্বলীদ কি শরয়ী হাইছিয়ত' নামক কিতাব (উর্দু) এবং দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে- বিশিষ্ট ফক্বীহ, মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ সাহেবের লেখা 'ফিক্বাহ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ' নামক কিতাব। উল্লেখ্য যে, তথ্যবহুল এ গ্রন্থখানা রচনা করার কাজে সর্বমোট ৮৮টি গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পাশাপাশি রয়েছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব, তাফসীর, উছূল, ফাতাওয়া, ও আনুসংগিক কিতাবাদীর এক অপূর্ব সমাহার। অতএব, বর্ণিত কিতাব 'মাযহাব কি ও কেন' এর ১৩০-১৩২ নং পৃষ্ঠায় ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির অসাধারণ ইল্‌মী পান্ডিত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি এর বিরুদ্ধে আরেকটি হাস্যকর অভিযোগ এই যে, হাদীসশাস্ত্রে তিনি দুর্বল ছিলেন এবং তার হাদীস সংগ্রহও ছিলো নগণ্য।

বলাবাহুল্য যে, বরাবরের মত এ অভিযোগের উৎসও হচ্ছে অজ্ঞতা কিংবা মনের সংকীর্ণতা। অন্যথায় সকল মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় গবেষক আলিমগণই ফিক্বাহশাস্ত্রের ন্যায় হাদীসশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও শীর্ষ মর্যাদার অকুন্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখানে আমরা বেছে বেছে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরবো।

(১) আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি বলেন- "ইমাম আবু

হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির মৃত্যু সংবাদ শুনে ফিক্বাহ ও হাদীসশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম, শাফিঈ মাযহাবের প্রধানতম সংকলক হযরত ইবনে জরীহ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আহ! ইল্‌মের কি এক অফুরন্ত খনি আজ আমাদের হাতছাড়া হলো"।" (তাহযীবুত্তাহযীব খন্ড ১, পৃঃ ৪৫০)

(২) মক্কী বিন ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি হলেন হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি এর অন্যতম উস্তাদ। 'তিন বর্ণনাকারী' বিশিষ্ট সনদের হাদীসগুলোর অধিকাংশই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এই মক্কী বিন ইব্রাহীম ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি এর কৃতার্থ ছাত্রদের একজন। স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন- "তিনি তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠতম আলিম ছিলেন।" (তাহযীবের টীকা খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৫১)

উল্লেখ্য, মুতাক্বাদ্দিমীন তথা প্রাচীনদের পরিভাষায় 'ইল্‌ম' মানেই হলো 'ইল্‌মুল হাদীস'। সুতরাং উপরোক্ত স্বীকৃতিসমূহ ইল্‌মুল হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৩) সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের প্রথম ইমাম হযরত শু'বা বিন হাজ্জাজকে গোটা ইসলামী উম্মাহ শ্রদ্ধাভরে উপহার দিয়েছেন 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' এর সম্মানজনক উপাধি। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো- "আল্লাহর কসম! অতি উত্তম বোধ ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি"। ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হযরত শু'বা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি যে অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করেছিলেন তা প্রকাশ করেছেন এভাবে– "হায়! ইল্‌মের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা আজ কুফায় নিভি গেল। ইমাম আযমের মতো ব্যক্তির দেখা এরা আর পাবে না।" (আল-খাইরাতুল হিসান, ইবনে হাজার লিখিত, পৃষ্ঠা ৩১)

(৪) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি (২০২-২৭৫ হিজরী) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম "। (তাহযীব, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

(৫) সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি) আস্থাভাজন ছিলেন। পূর্ণ দায়িত্বের সাথেই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন।

তিনি আরো বলেছেন- "হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি) আস্থাভাজন ছিলেন। এছাড়া ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মুঈন, হযরত ইয়াহয়া ইবনে দাউদ আল কাত্তানের এ স্বীকৃতিবাক্য উদ্বৃত করেছেন- "তাঁর অধিকাংশ মতামত আমি অনুসরণ করেছি"। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, যাহাবী কৃত,খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১১০)

আরেকবার হযরত ইয়াহয়া ইবনে মুঈনকে প্রশ্ন করা হলো- হাদীসশাস্ত্রে আবু হানীফা কি আস্থাভাজন ব্যক্তি? সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন সংশয় আঁচ করতে পেরে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন! অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন! (মানাকিবুল ইমামুল আ'যামি লিলমাওয়াফিক- খন্ডঃ ১, পৃষ্ঠা ১৯২)

বস্তুতঃ ইমাম সাহেবের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও শতমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সমসাময়িক ও পরবর্তী

গবেষক আলিমগণের মতামত ও মন্তব্য বিস্তৃত আকারে তুলে ধরতে গেলে এক বৃহৎ সংকলনের প্রয়োজন হবে। এমন কি শুধু হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মহান অবদান প্রসংগে এ পর্যন্ত আরবী ও উর্দুতে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। (ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস, কৃত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দলবী)

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলছি- ইমাম ছাহেব হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার' এমন এক সময় প্রণয়ন করেন, যখন হাদীসশাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোরও (যেমন- মুআত্বা ইমাম মালিক, মুছান্নিফ আ'ব্দুর রায্যাক্ব ও মুছান্নিফ ইবনে আবি শাইবা) অস্তিত্ব ছিলো না। প্রায় ৪০ হাজার সংগৃহীত হাদীস থেকে চয়ন করে এ গ্রন্থটি (কিতাবুল আছার) তিনি সংকলন করেন। (মানাকিবুল ইমামুল আ'যামি লিলমাওয়াফিক- খন্ডঃ ১, পৃষ্ঠা ৯৫)

এ ছাড়া বিশিষ্ট মুহাদ্দীছগণ ইমাম সাহেবের নামে সতেরটি 'মুসনাদ' গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। কলেবরের দিক থেকে এর একেকটি 'সুনানে শাফিঈর' চেয়ে ছোট নয়। ইমাম সাহেবের মুসনাদ সংকলকদের মধ্যে হাফিয ইবনে আ'দ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি এর মতো সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সমালোচকও রয়েছেন। প্রথম দিকে ইমাম সাহেবের প্রতি তাঁর ধারণা খুব একটা প্রসন্ন ছিলো না। কিন্তু পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে অতীত আচরণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইমাম সাহেবের মুসনাদ সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করছিলেন।

অন্যান্য বর্ণনায় আছে-

আল্লামা আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- দুনিয়ার সুবিখ্যাত যাবতীয় মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির ও মুজতাহিদগণ ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে বহু প্রশংসা করেছেন। যেমনঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সুফীয়ান ইবনে ওয়াইনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সুফীয়ান ছাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
আব্দুর রায্যাক্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হাম্মাদ ইবনে জায়েদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ওয়াকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও চার মাযহাবের ইমামগণ।

নিম্নলিখিত মুহাদ্দিছগণ ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ-

আবু সুফিয়ান যুহুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হাম্মাদ ইবনে মুআয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হিশাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
আব্বাস ইবনে খাওয়াব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
জা'ফার ইবনে আওন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- যে সকল বিখ্যাত আল্লামা, মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হাদীস ও দ্বীনের মাসআলাসমূহ শিক্ষা করে লিপিবদ্ধ করেছেন তন্মধ্যে ৪০ জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যথাঃ-

ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম জুফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

দাউদ তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ওয়াকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আছাদ ইবনে উমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইউছুফ ইবনে খালিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইয়াহয়া ইবনে যাকারিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হিশাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

উরওয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ।

অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহগণ ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য অথবা প্রশিষ্য ছিলেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাবাদী অধ্যয়ন করেই এতো গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তন্মধ্যে শুধু ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রণীত কিতাবের সংখ্যা ছিল ৯৯০ খানা, এতে ৬খানা কিতাব সমধিক প্রসিদ্ধ যাকে, যা-হিরুর রিওয়াইয়াত বলা হয়। উক্ত কিতাবগুলির মূল ভিত্তি ছিলেন ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত ইবনে হাজার মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব খাইরাতুল-হিছান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত শাইখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আবু হাফ্ছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে- প্রসিদ্ধ তাবিঈ থেকে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চার হাজার (৪০০০) উস্তাদ ছিলেন ।

সুবিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম যুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তবক্বার দলভূক্ত উল্লেখ করেছেন। আর তবক্বার দলভূক্ত তাঁদেরকেই করা হয়, যাদের লক্ষাধিক হাদীস মুখস্ত থাকে।

আলী ইবনে আছিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "ইমাম আযমের জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, যদি সমগ্র দুনিয়াবাসীর জ্ঞান ওজন করা হয় তবে একমাত্র ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জ্ঞানই অর্ধেকের বেশি হইবে।"

ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে সর্বদাই অন্ততঃ ৪/৫ শত আলিম-মুহাদ্দিছ উপস্থিত থেকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করতেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ আমি ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাদীস ব্যাখ্যাকারী কাউকে দেখি নাই।

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইল্‌ম শিক্ষাদানে এত সুযোগ্য ছিলেন যে, দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যেক নামাযের পর তাঁর জন্য নেক দোয়া করা জরুরী।

আল্লামা ঈসা ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খলীফা মনসুরকে বলেছেন, "ইনি (ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম"।

আল্লামা ছুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, লোক ফিক্বাহ শাস্ত্রে নিদ্রিত ছিল, ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে সকলকে জাগ্রত করেছেন।

৩য় ভাগ

পরহেযগারী

তাঁর শানে ১ম ও ২য় ভাগে যথাক্রমে 'মর্যাদা' ও 'জ্ঞান আহরণ' নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এপর্যায়ে সেই অমর বুযুর্গের জীবন থেকে সামান্য পরহেযগারীর চিত্র পাঠকমহলের খেদমতে উপস্থাপন করতে চাই, যাতে তাঁর পূন্যময় জীবনের একটা বাস্তব উদাহরণ আমাদের হৃদয়পটে ভেসে উঠে। যেমন- উক্ত ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামক গ্রন্থের 'উপক্রমণিকার' ৩-৬ নং পৃষ্ঠায় আছে-

আবু হানীফা (রঃ) এর তাক্বওয়া বা পরহেযগারী

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর তীক্ষ্ম মেধা, গভীর জ্ঞান আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া-পরহেযগারী এবং ইবাদত ও রিয়াযতের কথা না বললেই নয়।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক বলেন- "আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে অনুসরণ করা কর্তব্য। কারণ তিনি ছিলেন পরহেযগার আলিম এবং ফক্বীহ। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান, মেধা, দূরদৃষ্টি এবং খোদা-ভীতির ভিত্তিতে যে ইলমী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং ইল্‌মে ওহীর যে খেদমত ও প্রসার ঘটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে নি"। (কারদারী কৃত মানাকিবে আবু হানীফাঃ পৃষ্ঠা ৪৬)

২. সুফিয়ান ইবনে আইনিয়্যাহ (রঃ) বলেনঃ "আমাদের যামানায় মক্কা শরীফে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে অধিক নামায পড়তেন"। (তারীখে বাগদাদঃ খন্ড-১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৮)

৩. আবু মুতী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "আমি মক্কা শরীফ থাকাকালীন রাত্রে যখনই তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতাম, তখনই আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সুফিয়ান ছাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে

পেতাম।” (তারিখে বাগদাদ,খন্ডঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৮)

৪. আবু আছিম নাবীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ “ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এত বেশি নামাজ পড়তেন যে, লোকেরা তাঁকে মসজিদের খুঁটি হিসাবে অভিহিত করতো।” (তারিখে বাগদাদ, খন্ডঃ ১৩,পৃষ্ঠাঃ ৩৩৮)

৫. বাশার ইবনে ওয়ালিদ কাজী আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সময় আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোথায় যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলছে, ‘এই যে ইনি হলেন ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি রাতে ঘুমান না ’। একথা শুনে আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ‘আমি একথা পছন্দ করিনা যে, আমার সম্পর্কে (প্রশংসা স্বরূপ) এমন কিছু বলা হোক, যা দ্বারা আমার আমলের বিঘ্ন ঘটবে’। এরপর থেকে তিনি আরও অধিক হারে কান্না ও বিলাপ এবং দুআ’ও মুনাজাতের মধ্যে রাত কাটিয়ে দিতেন।

একথাও বর্ণিত আছে যে, আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাত হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করেছেন। (সিয়ারে ই’লামুন্নাবলাঃ খন্ড ৬, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৯)

৬. মক্কী ইবনে ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ‘আমি কুফাবাসীদের সংগে ওঠা-বসা করেছি; কিন্তু আমি আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে অধিক মুত্তাক্বি কাউকে দেখিনি’। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এরূপ বলেছেন। (আল-ক্বামার, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৮)

৭. ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ‘আমি আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সান্নিধ্যে বসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, যখনই আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়েছি, তখনই দেখেছি যে, তিনি আল্লাহর ভয়ে কাতর আছেন। (আল-ক্বামারঃ পৃষ্ঠা ৩৫৯)

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ‘আমি সুফিয়ান ছাউরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললাম, আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গীবত করা থেকে কত দূরে অবস্থান নিয়েছেন, আমি তো তাঁকে তাঁর দুশমনেরও গীবত করতে শুনিনি’। তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহর কসম! তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং এমন মূর্খতা কেন করবেন, যা তাঁর নেক আমলসমূহকে খতম করে দিবে?’ (আল-ক্বামারঃ পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ইবনুল মুবারাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেনঃ ‘এরূপ ব্যক্তির তাক্বওয়া সম্পর্কে কত আর বলা যাবে, যাঁর সামনে দুনিয়ার ধন-সম্পদ পেশ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি সরকারী সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ এর জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাক্বওয়ার প্রয়োজনে তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে জন্য অন্যায়ভাবে তাঁকে দুররা মারা হয়েছে, তাতেও তিনি ছবর করেছেন। (উকূদুল জিমানঃ পৃষ্ঠা ২৩৯)

৯. জুমাক ইবনে ছাকাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সকলের চেয়ে বেশি আমানতদার ছিলেন। যখন

বাদশাহ চাইলেন আবু হানীফা রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের চাবি গ্রহণ করুন নতুবা তাঁর পীঠে দুররা মারা হবে, তখন তিনি মানুষের দেয়া শাস্তির চেয়ে আল্লাহর শাস্তিকে অধিক ভয় পেলেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রত্যাখান করলেন। (উকূদুল জিমানঃ পৃষ্ঠাঃ ২৪৩)

১০. হাসান ইবনে ছালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় মুত্তাক্বী ছিলেন, হারাম থেকে বিরত থাকতেন। এমন কি হারাম হওয়ার সন্দেহে অনেক হালাল কাজকেও পরিত্যাগ করতেন। আমি কখনও কোন ফক্বীহকে এত বেশি নিজের নফ্স এবং ইল্মের হিফাযতকারী হিসাবে দেখিনি। তাঁর সকল প্রস্তুতিই ছিল কবরের জন্য।" (উকূদুল জিমানঃ পৃষ্ঠাঃ ২৩৯)

১১. সাহল ইবনে মাযাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "আমরা আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট যেতাম, কিন্তু তাঁর গৃহে চাটাই ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না।" (উকূদুল জিমানঃ পৃষ্ঠা ৩০৪)

১২. মুজাহিদ বলেনঃ "আমি খলিফা হারুনুর রশিদ এর দরবারে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে প্রবেশ করলেন। হারুনুর রশিদ তাঁকে বললেন, আপনি আমার কাছে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আখলাক বা চরিত্র বয়ান করুন। তিনি বললেন "আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহ পাকের হারাম করা বিষয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। দুনিয়াদার লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকেন। গভীর নীরবতায় তিনি সর্বদা নিমজ্জিত এবং সর্বদা ধ্যান ও চিন্তায় থাকেন। তিনি অনর্থক ও নিস্ফল কোন কথা বলেন না। যখন তাঁকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন জানা থাকলে তিনি জওয়াব দিতেন নতুবা নয়। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, তিনি তাঁর নফ্স এবং দ্বীনকে হিফাযত করেন। মানুষের দোষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। যার আলোচনা করেন, তার ভালো দিকটা আলোচনা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদ বললেনঃ এটাই ছালিহীনের আখলাক।" (হাফিয জাহাবী কৃত মানাকিবে আবু হানীফাঃ পৃষ্ঠা ৯)

১৩. কাজী শরীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অধিকাংশ সময় নীরবে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ফিকাহের মধ্যে তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। ইল্ম ও আমলের আলোচনায় অনেক সূক্ষ্ম দলীলের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ফলাফল গ্রহণ করতেন। যারা তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করতো, তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। যদি কোন ছাত্র গরীব হতো, তবে তিনি তার এবং তার পরিবারের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক খরচ বহন করতেন এবং মাসিক ভাতা বরাদ্দ করতেন, যেন সে একাগ্রচিত্তে ইল্ম হাছিল করতে পারে। অতঃপর যখন সে শিক্ষা সমাপ্ত করতো, তখন তিনি তাকে বলতেন, 'হালাল ও হারামের ইল্ম হাসিল করে তুমি অনেক সম্পদ অর্জন করেছ'। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। মানুষের সাথে কথা-বার্তা ও কম বলতেন।" (উকূদুল জিমান,পৃষ্ঠাঃ ২০৬)

১৪. ইমাম যুফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ "আমি বিশ বৎসরের অধিক আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সান্নিধ্যে থেকেছি, মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ এবং কল্যাণকামী তাঁর

চেয়ে অধিক আর কাউকে দেখিনি। তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে দিয়েছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ইল্‌ম ও মাসাইল নিয়ে মশগুল থাকতেন। নতুন নতুন উদ্ভুত মাসআলা এবং ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার সমাধান দিতেন এবং মানুষের প্রশ্নের জওয়াবে নিয়োজিত থাকতেন। ইল্‌মী মজলিস থেকে যখন উঠে যেতেন, তখন হয় কোন রোগীর পরিচর্যা করার জন্য যেতেন, অথবা ফক্বীর-মিসকিন এর সাহায্য করতে অথবা জানাযার সংগে যেতেন। আবার যখন রাত হতো তখন ইবাদত-বন্দেগী, নামায এবং কুরআন পাকের তিলাওয়াতের জন্যে নির্জনে অবস্থান গ্রহণ করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত দিন-রাত তাঁর এরূপ আমলই অব্যাহত ছিল।" (উকূদুল জিমান,পষ্ঠাঃ ২০৮)

জবাব নং-৩

ক. (মাওলানা সাহেবের কথা)

অতএব আজকাল সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুস্কর মোটেও নয়। তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরণ করতে যাবেন।

খ. (আমাদের বক্তব্য)

মাওলানা সাহেবের জবাবের আপত্তিকর ৩নং অংশের কথাগুলোকে সহজভাবে বুঝানোর জন্য দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমাংশ হলো-

(এক) আজকাল সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুস্কর মোটেও নয়।

এখানে অবশ্যই আমার মতো অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বিশ্বে বর্তমানে ভাষার সংখ্যা কত? আর এখানে 'সকল ভাষা' বলতে তিনি কি বিশ্বের ব্যবহৃত সকল ভাষা বুঝাতে চেয়েছেন, না বিশেষ বিশেষ ক'টি ভাষাকে 'সকল ভাষা' খেতাব দিয়েছেন? যদি এটা স্পস্ট থাকতো তাহলে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তাম না। কারণ, তাঁর বক্তব্যে কথাটা পরিস্কার হয়নি। জ্ঞানীমহলে সকলের জানা আছে যে- পৃথিবীতে বহুসংখ্যক ভাষা প্রচলিত আছে, ইহার সঠিক কোন সংখ্যা নেই। তবুও পাঠকমহলের অবগতির জন্য নিম্নে একটি সূত্র তুলে ধরছি।

বর্তমান পৃথিবীতে কোন ভাষায় কত লোক

পৃথিবীতে প্রায় ছয়শ কোটি মানুষ বসবাস করছে। তাদের মুখের ভাষার সংখ্যা যে আজ কত তা নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দি শেষ হয়ে গেলেও এর সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। অবশ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ও ডায়ালেক্ট এর ধারণা পরিষ্কার নয়। এই জাতীয় দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও একটি হিসেবকে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কয়েকজন ফরাসী ও মার্কিন ভাষাবিদ এই হিসেব প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, "পৃথিবীর প্রান্ত জুড়ে প্রায় (মোট) সাড়ে চার হাজার বৈকারনিক ও সাহিত্যের ভাষা চালু আছে"। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে-

১. প্রায় ১২৫ কেটি লোক চীনা ভাষায় কথা বলে।

২. প্রায় ৬৪ কোটি লোক ইংরেজী ভাষায় কথা বলে।
৩. প্রায় ৪৭ কোটি লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলে।
৪. প্রায় ৩৩ কোটি লোক আরবী ভাষায় কথা বলে।
৫. প্রায় ৩২ কোটি লোক রাশিয়ান (রুশ) ভাষায় কথা বলে।
৬. প্রায় ২০ কোটি লোক বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলে।
৭. প্রায় ৪০ কোটি লোক স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে।
৮. প্রায় ১৭ কোটি লোক উর্দু ভাষায় কথা বলে।
৯. প্রায় ১২ কোটি লোক ফরাসী ভাষায় কথা বলে।
১০. প্রায় ২২ কোটি লোক জাপানী, জার্মানী ও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে।
১১. প্রায় ১৪ কোটি লোক ফার্সী ভাষা কথা বলে।
১২. প্রায় ২০ কোটি লোক সারা বিশ্বে বাংলা ভাষায় কথা বলে।

উল্লেখ্য, আমাদের বাংলা ভাষা রয়েছে অবস্থানের দিক থেকে অষ্টম স্থানে। (তথ্য- ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপেডিয়া ২০০১ ইং)

কাজেই সকল ভাষা বলতে যদি উপরোক্ত সাড়ে চার হাজারটি সংখ্যা ধরে নেয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে মাওলানা সাহেবের দেয়া উক্তিটা "আজকাল সকল ভাষায় (অর্থাৎ সাড়ে চার হাজারটি ভাষায়) সকল ছহীহ হাদীস অনুদিত হয়ে গেছে" একথাটি প্রমাণযোগ্য হলো না।

তাছাড়া তাঁর জবাবের এ অংশে আরো রয়েছে- 'সকল ছহীহ হাদীস অনুদিত হয়ে গেছে'। এখানেও প্রশ্ন জাগে, ছহীহ হাদীসের কিতাব কতটি? তবে আফসুস আমাদের মুসলিম সমাজে একশ্রেণীর আলিমও রয়েছেন, যারা মনে করেন শুধুমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ছয়খানা (ছিহাহ ছিত্তাহ) কিতাবই নাকি ছহীহ হাদীসের কিতাব। আসলে তাও শুদ্ধ কথা নয়, কারণ যারা হাদীসশাস্ত্রের উপর পান্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাদের মতে ছহীহ হাদীসের কিতাব শুধুমাত্র ছয়খানা নয়, বরং আরোও রয়েছে। যেমন- 'মুআত্বা ইমাম মালিক' 'মুছান্নিফে ইমাম আ'ব্দুর রায্যাক্ব' ইত্যাদি। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ কিতাব অনুদিত হলো, আর কোন্ কোন্ ভাষায়ই বা অনূদিত হলো, সেটার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কাজেই "সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে" এ কথাটির সাথে আদৌ বাস্তবতার কোন মিল নেই।

আরোও উল্লেখ্য যে, এ অংশের শেষ পর্যায়ে প্রশ্নকারীকে আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে আহবান করা হয়েছে। যেমন তিনি (উত্তরদাতা) বলেছেন- 'কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুস্কর মোটেও নয়' অর্থাৎ মাওলানা সাহেব প্রশ্নকারীকে লিখিত উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন- যেমন জবাবের একেবারে শুরুর দিকে বলেছেন, "একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ হেফাজতের স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদীসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এ ক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন ভিত্তিক তা দেখার বিষয়।" এখানে তাঁর কথা মেনে নিলে 'ইসলামী জীবন-যাপন' পরিচালনার বিষয়ে বা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞ আলিমতো দূরে থাক, কোন মাযহাবের ইমামকেও অনুসরণ করতে হবে না। বরং সম্পূর্ণটাই একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর এজন্য তথ্য অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার

করা যাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সফল উপহার 'কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট'।

লক্ষনীয় যে-আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ইসলামের অগ্রযাত্রা হয়েছে একথা সকলই একবাক্যে স্বীকার করবেন এবং কুরআন-হাদীসের চর্চার জন্য বিভিন্ন ভাষায় এগুলির অনুবাদও গতিশীল। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী খেদমতের যে এক অনুপম সুযোগ-সুবিধা আমরা পেয়েছি, ইহা নিঃসন্দেহে আগের যুগের তুলনায় আমাদের জন্য একটি বিশেষ নিয়ামততুল্য। কিন্তু সকল ছহীহ হাদীস সকল ভাষায় অনূদিত হয়ে গেছে এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমেই কেবল উহার তথ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা যদি সমস্যা সমাধানের উত্তম পন্থা হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন জাগে-

সাধারণ লোক ইন্টারনেট থেকে ছহীহ হাদীস জেনে শরয়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কি?

যারা ইন্টারনেট ও কম্পিউটার থেকে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম বা যেখানে এগুলোর কোন ব্যবস্থাই নেই, তারা কার কাছ থেকে এবং কিভাবে ইসলামী আইনের সমাধান নিবে?

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-পদ্ধতির দরকারই বা কি?

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কথা-বার্তা শোনা এবং বুঝার প্রয়োজনই বা কি?

পূর্বযুগের মুজতাহিদ-ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সীরগণের সাধনার বদৌলতে রেখে যাওয়া ফিক্বাহ-ফাতাওয়া, হাদীসশাস্ত্র ও তাফসীর ইত্যাদি ধরনের বহুবিষয়ের কিতাবাদী অধ্যয়নের আর প্রয়োজন থাকবে কি?

বিজ্ঞ-অনবিজ্ঞ কোন কিছু না জেনে সাধারণভাবে সকলকে নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তিকরে চলার পরামর্শ প্রদান করা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয় কি? পাঠকমহল তা বিবেচনা করবেন।

অতএব, (আজকাল সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনূদিত হয়ে গেছে) (কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুষ্কর মোটেও নয়) এ কথার দ্বারা মুসলিম মিল্লাতকে আলোর পথের নামে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।

(দুই) "তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরন করতে যাবেন।"

মাওলানা সাহেবের জবাবের আপত্তিকর ৩নং অংশের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে উপরোক্ত কথা। এখানে যিনি উত্তরদাতা, ম্যাগাজিনে দেয়া পরিচয় হিসেবে অবশ্যই বলা যায় তিনি একজন বিজ্ঞ আলিমে-দ্বীন। তিনি একটি উন্নতমানের আধুনিক-ইসলামী সাহিত্য ম্যাগাজিনের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই তাঁকে নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক বলা যায়। পক্ষান্তরে যিনি প্রশ্নকারী, কেবলমাত্র সে ভদ্রলোকের নাম পড়ে তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কাজেই, 'তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরন করতে যাবেন' এ কথাটা এমন একজন ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, যার ধর্মীয় তথা কুরআন-হাদীসের উপর জ্ঞান বা ইল্ম আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। যদি প্রশ্নকারীর ইল্মে-দ্বীন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তবুও এমনিভাবে বলে দেয়া যায় কি না বিজ্ঞ মহলের কাছে এটা বিচার্য বিষয়। আর প্রশ্নকারী যদি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি হয়ে থাকেন, যিনি ইসলামী সাহিত্য ম্যাগাজিনে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জটিল বিষয়ের সমাধান পাওয়ার জন্য জানতে চেয়েছিলেন। তখন

এধরণের জটিল বিষয়ে তথা মাযহাব সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছামতো চলার পরামর্শ প্রদান তথা কুরআন-হাদীসকে নিজের খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝার পরামর্শ প্রদান করা, প্রশ্নকারী বা এ ধরণের কাউকে সাহায্য করা হয়েছে, না সাধারণ মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে তাও পাঠকমহলের কাছে বিচার্য বিষয়। তাছাড়া একজন মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবনে নানা রকমের সমস্যায় পড়ে। মনে করুনঃ

১. একজন তার পিতার ইন্তিক্বালের পর ইচ্ছা করলো ৫জন ভাই-বোনের মধ্যে সে কতটুকু পৈতৃক সম্পদের মালিক হবে?

২. আরেকজন ঘটনাক্রমে তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে পুনরায় তার তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বরণ করতে হলে কি করতে হবে?

৩. আরেকজন মহিলা ইসলামী আ'ইনের বিধানে স্বামী ত্যাগ করতে চায় তার কি করতে হবে?

৪. আরেকজন নামাযী ব্যক্তি দুই রাকাত নামাযের শেষ বৈঠকে, বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়েছে এখন তার কি করতে হবে?

৫. আরেকজন রোযাদার ব্যক্তির ভুলক্রমে গড়গড়া করার সময় অসাবধানতাবশতঃ পেটে পানি ঢুকে গেছে, এখন তার রোযার অবস্থা কি হবে?

৬. আরেকজন কোন মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে তার গায়ে হাত দিয়েছে, এখন উক্ত মহিলাকে সে চাইলে বিবাহ করতে পারবে কি না? ইত্যাদি ধরণের জটিল মাসআলাহ সমূহের সমস্যার সমাধানের জন্য একজন সাধারণ শিক্ষিত বা আলিম শ্রেণীর মুসলমানও যদি ইচ্ছা করে তাহলে মাওলানা আবুল হোসাইন খান সাহেবের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কুরআন শরীফের কোন্ কোন্ আয়াত এবং কোন্ কোন্ ছহীহ হাদীসের অনূদিত কিতাবগুলি দেখবেন? বা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট এর সেট করা কোন্ সূত্রে এগুলি রাখা আছে? তাছাড়া কয়জনের কুরআন-হাদীসের উপর জ্ঞান আছে? নিঃসন্দেহে সব ক্ষেত্রেই কোন আলিমকে জিজ্ঞাসা করবেন বা নিজে মাযহাবের অনুসরণে লিখিত কোন ফক্বীহ এর কিতাব খুঁজবেন। আর আ'লিম সাহেবও নিজের নয় বরং কোন ফক্বীহ বা মুজতাহিদের লেখা কিতাবকে অনুসরণ করবেন এবং সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। তাহলে বুঝা গেল সাধারণভাবে কুরআন-হাদীস বুঝা সকলের জন্য সম্ভব নয়। আর যদি কেউ তার নিজের জ্ঞানদ্বারা বুঝতে পারে, তাহলে একেবারে হাতেগুণা কয়জন। জনাব মাওলানার যদি কুরআন-হাদীসের উপর উপযুক্ত জ্ঞান থাকে, তাহলে প্রশ্নকারীর মতো লোকজনের কি উপায় হবে, সেটা না বলে অতি সহজভাবে লোকজন ভ্রান্ত হবার একটা পথ বের করে দিলেন।

অতএব, মাযহাবের ইমামগণকে যাচাই করার জ্ঞান যার আছে, তিনি আবশ্যই ফিক্বাহশাস্ত্রের একজন ইমাম স্তরের আলিম হওয়া চাই। পক্ষান্তরে , যার এ ধরণের জ্ঞান নেই যে, তিনি কোন মাযহাব বা মাযহাবের ইমামগণকে যাচাই করার মতো জ্ঞান রাখেন, সে ব্যক্তির জন্য মাযহাব যাচাই বা মাযহাবের ইমাম যাচাই করার ইচ্ছা করা, নিজে অন্ধ হয়ে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে যাচাই করার সমতূল্য। সুতরাং ইসলামী সাহিত্য ম্যাগাজিন 'আলোর পথ' এর উক্তি 'অতএব আজকাল

সকল ভাষায় সকল ছহীহ হাদীস অনুদিত হয়ে গেছে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে সেট করে রাখা আছে তা পাওয়াও দুস্কর মোটেও নয়। তাহলে কেন অন্ধভাবে অনুসরন করতে যাবেন' কথাগুলি ঈমানের যথাযথ স্বার্থে অনুসরণ করা মোটেই ঠিক নয়।

জবাব নং-৪

ক. (মাওলানা সাহেবের কথা)

আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে কোন ইমামের অনুসরণ থেকে তো নবীর হাদীসের অনুসরণ উম্মতের ঈমানের দাবি।

খ. (আমাদের বক্তব্য)

মাওলানা সাহেবের দেয়া জবাবের আপত্তিকর ৪নং অংশে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি কেন, যেকোন এক মাযহাব অর্থাৎ ইমামের অনুসরণ করা যাবেনা। এখানে তাঁর দৃষ্টিতে মাযহাব মানা অর্থাৎ ইমাম মেনে চলার আবশ্যকতা নেই। এমনকি দুর্বল সবল কেউই মাযহাব বা ইমাম মানতে চাইলে পারেন কি না তারও কোন সুযোগ তিনি রাখেননি। যেহেতু তাঁর দেয়া বক্তব্যটা হচ্ছে- 'আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে কোন ইমামের অনুসরণ থেকে তো নবীর হাদীসের অনুসরণ উম্মতের ঈমানের দাবি'।

কিছু কথাঃ-

উম্মতের জন্য যেকোন ইমামকে অনুসরণ না করে নবীর হাদীসের অনুসরণ করাকে তিনি ঈমানের দাবি বলে ব্যক্ত করেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, প্রশ্নকারীর জবাব দিতে তিনি একেবারে প্রথম দিকেই বলেছেন- "এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ হেফাজতের স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদীসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়"।

আবার শেষপর্বে বললেন- 'আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে কোন ইমামের অনুসরণ থেকে তো নবীর হাদীসের অনুসরণ উম্মতের ঈমানের দাবি'।

লক্ষণীয় বিষয়ঃ

প্রথমদিকে উপদেশ দেয়া হলো, কুরআন-হাদীসের অনুসরণ আর শেষদিকে উপদেশ দেয়া হলো, কেবল হাদীসের অনুসরণ। এখন প্রশ্ন হলো-ঈমানের যথাযথ হেফাযতের স্বার্থে কুরআন-হাদীস, না শুধু হাদীস, কোনটি মানবো? তার সহজ উত্তর এখানে অনুপস্থিত। কাজেই আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর প্রথম কথাকে উপলক্ষ্য করে ধারাবাহিক আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি।

জানা প্রয়োজনঃ-

জানা প্রয়োজন যে-কেবল কুরআন-হাদীসের সকল অংশের সরাসরি বাহ্যিক অনুসরণ করাকে মাযহাব বলা হয়নি, বরং কুরআন-হাদীসের নির্দিষ্ট আয়াত ও ভাষ্যের উপর কারো

গবেষণালব্ধ মাসআলা-মাসাইলের আলোকে জীবন যাপনের ব্যবস্থাটাই হচ্ছে মাযহাব। আর এভাবে জীবন পরিচালনার জন্য যিনি ব্যবস্থা করে দেবেন সহজ কথায় তিনিই হলেন মাযহাবের ইমাম। সুতরাং ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু হলো- মাযহাব আর ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকারী হলেন ইমাম। তাই যিনি মাযহাব মানবেন, তিনি এমনিতেই ইমাম মানলেন। পক্ষান্তরে- যিনি মাযহাব মানেন না, তার দ্বারা এমনিতেই ইমাম মানা হয় না। বস্তুতঃ মাযহাব মানা ওয়াজিব অর্থাৎ আবশ্যক। অতএব, মাযহাবের আবশ্যকতা তথা গুরুত্বের উপর দৃষ্টান্তমূলক আলোচনা করা নিত্তান্ত প্রয়োজন।

আমরা শুরুর দিকে তাঁর দেয়া জবাবের আপত্তিকর ১নং অংশের আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি যে- "মুমিনের জন্য অনুসরণীয় 'পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থার' নামই হলো 'পূর্ণাংগ ইসলামী শরীয়ত'। কেউ যদি শেষ দু'টি ছাড়া প্রথম দু'টিকে অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁকে 'পূর্ণাংগ শরীয়'তপন্থী' বলা যাবে না। এতে প্রমাণের জন্য ফিক্বাহশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক অনুস্মরণীয় 'নূরুল আন্ওয়ার' ও 'উছূলুশ্শা-শী' নামক বিশেষ দু'টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছিলাম। তাছাড়া আরোও উল্লেখ করেছিলাম "যদি পূর্ণাংগ ইসলামী শরীয়তের" দলীল কেবলমাত্র দু'টি অনুসরণীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে উছূলে ফিকাহ্ এর কিতাবে তা উল্লেখ থাকতো"। এখানে উছূলে ফিক্বাহ এর আলোচনা একারণেই আগে আনা হলো যে, উছূলবিদগণ কুরআন-হাদীসের উপর সাধারণ শিক্ষিত এবং স্বল্প ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখেন। জনাব মাওলানা- যেহেতু শুরুতে বলেছেন- "এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ হেফাজতের স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদীসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা না দেখে কার কথাটি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়"। এতে তাঁর দেয়া সূত্র ধরেই অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব মানার আবশ্যকতা পেশ করতে যাচ্ছি। তবে তার আগে ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাব পরিচিতি

ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাব এ শব্দগুলো মুসলিম সমাজের তথা ইসলামী আ'ইনের বহুল পরিচিত ও আলোচিত শব্দ। এই শব্দগুলো যদিও পৃথক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা আরেকটার পরিপূরক ও সহায়ক। উল্লেখ্য, এগুলির আলোচনা যেহেতু ব্যাপক এবং ইহা স্বতন্ত্র একেকটি বিষয়, কাজেই এ পরিসরে বিস্তারিত না লিখে সংক্ষিপ্তভাবে ইহার পরিচিতি পেশ করা যথেষ্ট মনে করি।

ক. ইজতিহাদ

ইসলামী আ'ইন তথা ইসলামী শরীয়'তের পূর্ণাংগ দলীলের সর্বমোট উৎস চারটি। আর ইহা হলো আল কুরআন, আল হাদীস, আল ইজমা' ও আল কিয়াস। এতে প্রধান দু'টি বিষয় অর্থাৎ

কুরআন ও হাদীছে রয়েছে কতিপয় সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট হুকুম-আহকাম। যা সকলের জন্য সহজভাবে বুঝে আ'মল করা মুশকিল। উল্লেখ্য যে, উক্ত উৎসদ্বয়ের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিষয়ের উপর যারা গবেষণা চালিয়েছেন, তাঁদের সেই গবেষণাটাই হচ্ছে শরীয়'তের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ। সুতরাং যিনি ইজতিহাদের এ কাজে নিয়োজিত থাকেন তিনিই হলেন গবেষক বা মুজতাহিদ।

খ. তাক্বলীদ

একথা প্রামাণ্য যে, ইসলামী শরীয়'ত তথা ইসলামী আ'ইনের প্রধান দু'ই উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদীস। আর এ উৎসদ্বয়ে আলোচিত সকল হুকুম-আহকামের ভাষ্যগুলিও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়'তের যেসব হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য বুঝা কষ্টসাধ্য ও অস্পষ্ট। তাই কেবলমাত্র এধরণের বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীস শরীফ নিয়ে মুজতাহিদীন তথা সুপন্ডিত উলামায়ে কেরাম উহার নিগুঢ় তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য কুরআন-হাদীসের আলোকে ব্যাপক গবেষণা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, আর এ গবেষণার সারমর্ম তথা উদঘাটিত সিদ্ধান্তকেই শরীয়'তের দৃষ্টিতে তাক্বলীদ বলা হয়। সুতরাং যাঁরা উক্ত তাক্বলীদ তথা মুজতাহিদগণের পূর্ণ সিদ্ধান্তকে মেনে নিবেন তাঁদেরকে মুক্বাল্লিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যিনি মুক্বাল্লিদগণের মতো মুজতাহিদীনে কেরামের আ'ইনী তথা বিধানগত সিদ্ধান্ত না মেনে নিজের পছন্দমতো চলার ইচ্ছাপোষণ করেন, ইসলামী শরীয়'তের দৃষ্টিতে তাকে গাইর-মুক্বাল্লিদ বলে। (মাযহাব কি ও কেন? ১১-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাক্বলীদের প্রকার

প্রধানতঃ তাক্বলীদ দুই প্রকার।

১. (তাক্বলীদুন মুত্বলাকুন) মুক্ত তাক্বলীদ। ইহা হলো- 'শরীয়'তের পরিভাষায় সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মুজতাহিদের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা'।

২. (তাক্বলীদুন শাখছিয়্যুন) ব্যক্তি তাক্বলীদ। ইহা হলো- 'সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা'।

অবশ্য উভয় তাক্বলীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নিজস্ব যোগ্যতার অভাবহেতু সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহিদের পরিবেশিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর উপর আ'মল করে যাওয়া। বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত অর্থে তাক্বলীদের বৈধতা ও অপরিহার্যতা কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

(মাযহাব কি ও কেন? পৃষ্ঠা নং ১৯)

গ. মাযহাব

মাযহাব মানে চলার পথ। ইসলামী ফিক্বাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় কুরআন-হাদীসের বিধান সম্বলিত আহকামের উপর নির্ধারিত গবেষক তথা মুজতাহিদীনে কেরামের ধর্মীয় আইনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জীবন-যাপন পরিচালনা করার মাধ্যমকে মাযহাব বলা হয়। যারা এ ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করেন, তদেরকে মাযহাবী বলে, আর যারা উক্ত ব্যবস্থাপনার বিপরিতে

নিজস্ব চিন্তা ধারার উপর চলেন তাদেরকে লা-মাযহাবী বলে।

পাঠকমহলের খেদমতে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণিত অংশে ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাবের আবশ্যকতা অর্থাৎ উহার গুরুত্বের উপর ধারাবাহিকভাবে কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি ৩য় আরেকটি সূত্র থাকবে। যেমনঃ ১ম অংশ কুরআন শরীফের দলীল, ২য় অংশ হাদীস শরীফের দলীল এবং ৩য় অংশ মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফক্বীহ ও মুজতাহিদ শ্রেণীর আলিম-উলামাদের গবেষণামূলক বক্তব্য।

(১) আল কুরআনের আলোকে- ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাবঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা হচ্ছে- ৬৬৬৬ (মতান্তরে)। এতে শুধুমাত্র ৫০০ (পাঁচশত) আয়াতের সূত্র ধরেই মুজ্তাহিদীনে কেরাম ইসলামী আইনের বিধি-বিধান বা ফিক্বাহ তৈরী করেছেন। আর বাকী ৬১৬৬ আয়াত আল্লাহপাক অন্যান্ন বিষয়ের উপর নাযিল করেছেন। (নূরুল আন্ওয়ার দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াতগুলো বুঝার জন্য ১ম পর্ব হচ্ছে- অনুবাদ বা অর্থ বুঝা এবং ২য় পর্ব হচ্ছে ব্যাখ্যা বা তাফসীর বুঝা। আর তাফসীরশাস্ত্রের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে 'হাদীস শরীফ'। কারণ, যে মহামানবের উপর আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল করেছেন, সে নাযিলকৃত কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনিই উত্তমভাবে দিতে পারবেন, আর এটা অতি সহজ কথা। কাজেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যেসব আয়াতকে মাযহাব তথা তাক্বলীদের সূত্র হিসেবে পেশ করবো সেখানে প্রত্যেকটা আয়াতের অনুবাদের সাথে একাধিক তাফসীর শাস্ত্রবিদ বা মুফাস্সিরগণের উক্তিই আমাদের জন্য দলীল বলে গণ্য হবে।

১ম আয়াতঃ

ক. অনুবাদ-

(আল্লাহপাক ইরশাদ করেন) "হে ইমানদারগণ! আল্লাহর অনুগত হও এবং তাঁর (আল্লাহর) রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদেরও অনুগত হও। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমীপেই পেশ করো, যদি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর তোমরা ঈমান এনে থাকো।" (সূরাহ নিসাহ আয়াত নং ৫৯)

খ. তাফসীর-

প্রায় সকল তাফসীরবিদগণের মতে আলোচ্য আয়াতে 'উলিল আমর' শব্দটি দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর ইল্মের অধিকারী ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন-

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু।

হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

হযরত আতা বিন আবি বারাহ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

হযরত আতা বিন ছাইব রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

হযরত হাসান বছরী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি।

ও হযরত আলিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহিসহ জগতবরেণ্য আরো অনেক তাফসীরকার। দু' একজনের মতে অবশ্য আলোচ্য 'উলিল আমর' এর অর্থ হলো মুসলিম শাসকগণ। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামাহ ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি প্রথম তাফসীরের সমর্থনে বিভিন্ন সারগর্ভ যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করে শেষে বলেছেন "বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতের 'উলিল আমর' ও উলামা শব্দ দুটি সমার্থক"।

অন্যদিকে আল্লামা ইবনুল ক্বায়্যিম রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহির মতে 'উলিল আমর' এর অর্থ 'মুসলিম শাসকবর্গ' ধরে নিলে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। কেননা আহকাম ও মাসাইলের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ আলিমগণের অনুগত হতে বাধ্য। সুতরাং শাসকবর্গের অনুগত হওয়া আলিমগণের অনুগত হওয়ার নামান্তর।

সূত্র-

১. আহকামুল কুরআন (প্রণেতা আল্লামা আবু বাকার জাস্‌সাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) খন্ডঃ ২ পৃষ্ঠাঃ ২৫৬।

২. তাফসীরে কাবীর (প্রণেতা ইমাম ফখর উদ্দীন রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) খন্ডঃ ৩ পৃষ্ঠাঃ ৩৩৪।

৩. আলামুল মুআক্কায়ীন খন্ডঃ ১ পৃষ্ঠা ৭।

মোটকথাঃ আলোচ্য আয়াতের আলোকে আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হওয়া যেমন ফরয, তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে আলিম ও মুজতাহিদগণেরও অনুগত হওয়া ফরয। আর এরই পারিভাষিক নাম হলো তাক্বলীদ।

২য় আয়াতঃ

ক. অনুবাদ-(আল্লাহপাক ইরশাদ করেন) "তাঁদের (সাধারণ মুসলমানদের) কাছে শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌঁছলে তারা ইহার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি যদি রাসূল এবং 'উলিল আমরগণের' কাছে পেশ করতো, তাহলে মূলোৎঘাটন ও সুক্ষ্ণ বিচারশক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারতো।" (সূরাহ নিসা- আয়াত ৮৩)

লক্ষণীয়- এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উছূলে তাফসীর ও উছূলে ফিক্বাহ এর সর্বসম্মত মূলনীতি অনুযায়ী আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে আয়াতের বিশেষ প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে শব্দের স্বাভাবিক ব্যাপকতার বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। সুতরাং আলোচ্য আয়াত থেকে এ মৌলিক নির্দেশ আমরা পাই যে, কোন জটিল বিষয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে সর্বসাধারণের কর্তব্য হলো, প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হওয়া এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁদের নির্ধারিত পথ ও পন্থা অম্লান বদনে মেনে নেয়া। ইসলামী শরীয়'তের ভাষায় এরই নাম তাক্বলীদ।

খ. তাফসীর-

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিম্বাত (মূলোদঘাটন) ও ইজতিহাদ (গবেষণা) শরীয়'তস্বীকৃত একটি হুজ্জাত বা দলীল। আর কিয়াসের প্রক্রিয়াটি ইজতিহাদের সমার্থক কিংবা অন্তর্ভূক্ত বিধায় সেটাও শরীয়'তস্বীকৃত হুজ্জাত।" মোটকথা, এ আয়াত থেকে তিনটি বিষয় স্থির হলো-

প্রথমতঃ- কুরআন-হাদীসের প্রত্যক্ষ নির্দেশের অবর্তমানে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ- ইজতিহাদ (গবেষণা) ও ইস্তিম্বাত (মূলোদঘাটন) শরীয়'তস্বীকৃত হুজ্জাত বা দলীল।

তৃতীয়তঃ- উদ্ভুত সমস্যা ও মাসাইলের ক্ষেত্রে আ'ম (সাধারণ) লোকের পক্ষে আলিমগণের তাক্বলীদ করা (সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া) ওয়াজিব (অপরিহার্য) ।

৩য় আয়াতঃ

অনুবাদ- (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন) "ধর্মজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়ে না, যেন ফিরে এসে স্বজাতিকে তারা সতর্ক করতে পারে?" (সূরাহ তাওবাহঃ আয়াত নং ১২২)

লক্ষণীয়-আয়াতের মূল বক্তব্য অনুযায়ী উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল বিদ্যমান থাকা একান্তই জরুরী যারা দিবা-রাত্র কুরআন হাদীসের ইল্‌ম অর্জনে নিমগ্ন থাকবে এবং ইল্‌ম অর্জনের সুযোগ বঞ্চিত মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে। আরো পরিস্কার ভাষায় একটি নির্বাচিত জামাআ'তের প্রতি নির্দেশ হলো, কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের এবং সর্বসাধারণের প্রতি নির্দেশ হলো তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। তাক্বলীদ এর বেশি কিছু নয়।

তাফসীর-

আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম আবু বকর জাছ্ছাছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন- এ আয়াতে আল্লাহপাক আলিমগণকে সর্তক করার এবং সর্বসাধারণকে সে সর্তকবাণী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪র্থ আয়াতঃ

অনুবাদ-

(আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন) "তোমাদের (ধর্মীয়) জ্ঞান না থাকলে আহলে ইল্‌মকে (জ্ঞানী সম্প্রদায়কে) জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।" (সূরাহ নহল আয়াত ৪৩ ও সূরাহ আম্বিয়া আয়াত ৭)

লক্ষণীয়- আলোচ্য আয়াতও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাক্বলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছে। কেননা এখান থেকে এ মৌলিক নির্দেশ আমরা পাই যে, অনভিজ্ঞ ও অপরিপক্ষদেরকে অভিজ্ঞ ও

পরিপক্ষ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নিদের্শ ও সিদ্বান্ত মুতাবিক আমল করতে হবে। তাক্বলীদের খোলাসা কথাও এই।

তাফসীর-

তাফসীরে রহুল মাআ'নীতে আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন- আলোচ্য আয়াতে (শরীয়তের) জটিল বিষয়ে আলিমগণের সিদ্বান্ত মেনে চলার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। ইমাম ছুয়ূতীর মতেও এ আয়াত মাসাইলের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের জন্য তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করেছে।

আল্লামা খতীবে বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-শরীয়'তের আহকাম থেকে বঞ্চিত সাধারণ লোকদের উচিত কোন বিজ্ঞ আলিমের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর তাক্বলীদ করে যাওয়া। কেননা আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ইল্ম না থাকলে আহলে ইল্মদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। অতপর আল্লামা বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজস্ব সনদ ও সূত্রযোগে সাহাবী হযরত আমর বিন কাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আ'ন্হুর মতামত উল্লেখ করে লিখেছেন: আহলে যিকির এর অর্থ "আহলে ইলিম" ছাড়া অন্য কিছু নয়।

২য় অংশ

আল হাদীসের আলোকে- ইজতিহাদ, তাক্বলীদ ও মাযহাব

হাদীছে রাসূলের পরিচয়ঃ- যেসব কথা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অর্থাৎ ইরশাদ করেছেন, যেসব কাজ তিনি নিজে আমলের মাধ্যমে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে গেছেন এবং যেসব আমল তিনি নিজে করেননি কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে করতে সমর্থন দিয়েছেন সহজ কথায় সেগুলিই হাদীস শরীফ। সংক্ষেপে- নবীজির কথা, কাজ ও সমর্থনই হাদীছে রাসূল।

নবীপাক সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা আমাদের জানা নেই। কারণ, হাদীসশাস্ত্রের উপর ছিহাহছিত্তাহ ছাড়াও বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। কুরআন শরীফের সকল আয়াত যেমনিভাবে মাযহাবের আলোচ্যসূচী নয়, ঠিক তেমনিভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীসও মাযহাবের আলোচ্যসূচী নয়। তবে শুধুমাত্র ৩০০০ (তিন হাজার) হাদীস হচ্ছে মাযহাবের আলোচ্যসূচী। আর এগুলোর সূত্র ধরেই মুজ্তাহিদীনে কেরাম ইসলামের বিধি-বিধান তৈরী করেছেন। (নূরুল আন্ওয়ার দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, হাদীস শরীফের কথা-বার্তা বুঝার জন্য ১ম পর্ব হচ্ছে অনুবাদ বুঝা এবং ২য় পর্ব হচ্ছে ব্যাখ্যা বা খুঁটিনাটি ফাঁক বুঝা। আর হাদীসশাস্ত্রের খুঁটিনাটি তথা সুক্ষ্ণ বিষয়াদি বুঝার জন্য একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে- হাদীস শাস্ত্রবিদগণের 'কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণামূলক বক্তব্য'। কারণ, যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র হাদীস শরীফ বুঝার যোগ্যতা দান করেছেন, কেবলমাত্র তারাই এ ব্যাপারে পারদর্শী। কাজেই হাদীস শরীফের যেসব ভাষ্যকে মাযহাব তথা তাক্বলীদের সূত্র হিসেবে পেশ করবো, সেখানে প্রত্যেকটা হাদীসের অনুবাদের

সাথে একাধিক হাদীস শাস্ত্রবিদ অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণের উক্তিই আমাদের জন্য দলীল বলে গণ্য হবে।

১ম হাদীসঃ

অনুবাদ-

হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'জানি না, আর কতদিন তোমাদের মাঝে আমি বেঁচে থাকবো। তবে আমার পরে তোমরা আবু বাকার (ছিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্হু) ও উমার (ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু) এ দু'জনের ইক্বতিদা করে যাবে।' (সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ ও মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা-

এখানে ইক্বতিদা শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ধর্মীয় আনুগত্যের অর্থেই শুধু এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রশাসনিক আনুগত্যের অর্থে নয়। বর্ণিত হাদীস শরীফে 'ইক্বতিদা' শব্দটি একটি আয়াত ও হাদীছে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরাহ আন্আ'মের ৯০নং আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন 'এরাই হলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত সুতরাং তোমরা এদেরই ইক্বতিদা করো।

'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে হযরত আবু ওয়াইলের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- 'আমি শাইবা বিন উছমানের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হযরত উমার ঠিক তোমার জায়গাটাতে বসেই বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা-ঘরে গচ্ছিত সমুদয় সোনা চাঁদি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেই। শাইবা বলেন, আমি বললাম, সে অধিকারতো আপনার নেই। কেননা আপনার আগের দু'জন তা করেননি, শুনে তিনি বললেন, এ দু'জনের ইক্বতিদা অবশ্যই করা উচিত।

আরো অসংখ্য হাদীছে এই অর্থে 'ইক্বতিদা' শব্দটির ব্যবহার এসেছে। বলাবাহুল্য যে, দ্বীনি বিষয়ে কারো ইক্বতিদা করার নামই হলো তাক্বলীদ।

২য় হাদীসঃ

অনুবাদ-

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্হু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'পরিপক্ক ইল্ম ছাড়া কোন বিষয়ে ফতোয়া দিলে সে পাপ ফতোয়াদাতার ঘাড়েই চাপবে'। (সূত্রঃ আবু দাউদ শরীফ)

ব্যাখ্যা-

এ হাদীসও তাক্বলীদের সপক্ষে এক মজবুত দলীল। কেননা তাক্বলীদ শরীয়'ত অনুমোদিত না হলে অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়ার সকল দায়দায়িত্ব মুফতী ছাহেবের একার ঘাড়ে না চাপিয়ে উভয়ের ঘাড়ে সমানভাবে চাপানোটাই বরং যুক্তিযুক্ত হতো। অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়াদানকারী মুফতী ছাহেব এবং চোখ বুজে সে ফতোয়া অনুসরণকারী মুক্বাল্লিদ উভয়েই যেখানে সমান অপরাধী, সেখানে একজন বেকসুর খালাস পাবে কোন সুবাদে?

মোটকথা, আলোচ্য হাদীসের আলোকে সাধারণ লোকের কর্তব্য শুধু যোগ্য ও বিজ্ঞ কোন আলিমের কাছে মাসাইল জেনে নেয়া। এর পরের সব দায়িত্ব উক্ত আলিমের উপরেই বর্তাবে।

প্রশ্নকারীর উপর নয়। আর এটাই হলো তাক্বলীদের খোলাসা কথা।

৩য় হাদীসঃ

অনুবাদ-

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আ'ব্দুর রাহমান আল আযায়ী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'সুযোগ্য উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এই ইল্‌ম গ্রহণ করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এর হিফাযত করবে। (মিশকাত শরীফ কিতাবুল ইল্‌ম, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৮)

ব্যাখ্যা-

শরীয়'তের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মূর্খ জাহিলদের তা'বীল ও ভুল ব্যাখ্যা দানের কঠোর নিন্দা করে এখানে বলা হয়েছে যে, মূর্খদের হাত থেকে ইল্‌মের হিফাযত হচ্ছে প্রত্যেক যুগের হক্কানী আলিমগণের পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং কুরআন-হাদীসের নির্ভুল অনুসরণের জন্য তাঁদেরই শরণাপন্ন হতে হবে। এই সরল পথ ছেড়ে তথাকথিত ইজতিহাদের নামে যারা কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যাদানের অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনই হবে শেষ ঠিকানা।

বলাবাহুল্য যে, কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অল্প বিস্তর বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে। কিন্তু হাদীস শরীফে তাদেরকেও জাহিল আখ্যায়িত করায় প্রমাণ হলো যে, কুরআন-হাদীস থেকে আহকাম ও মাসাইল আবিষ্কার করার জন্য আরবী ভাষা-জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং ইজতিহাদী প্রজ্ঞারও বিশেষ প্রয়োজন।

৪র্থ হাদীসঃ

অনুবাদ-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্‌হু থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'একজন বিশিষ্ট সাহাবী জামাআ'তবদ্ধ নামাযের পেছনে এসে শরীক হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে যথাসময়ে মসজিদে এসে প্রথম কাতারে 'নামায আদায়ের তাকিদ দিয়ে ইরশাদ করলেন- "তোমরা (আমাকে দেখে) আমার ইক্বতিদা করো, আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের দেখে ইক্বতিদা করবে।" (সূত্রঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ব্যাখ্যা-

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখ আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে আ'লী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আল্লামাহ হাফিয ইবনে হাজার আ'সক্বালানী মিশরী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি (৭৭৪-৮৫২ হিজরী) লেখেছেন- অনেকের মতে হাদীসের মর্ম এই যে, (নবীজির ভাষ্য হবে) তোমরা আমার কাছ থেকে শরীয়'তের আহকাম শিখে রাখো। কেননা পরবর্তীরা তোমাদের কাছ থেকে শিখবে। আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি সহ কারো কারো মতে হাদীসের অর্থ এই যে, নামাযে প্রথম কাতারের বিশিষ্ট সাহাবাগণ রাসূলের ইক্বতিদা করবেন আর পরবর্তী কাতারের সাধারণ সাহাবাগণ তাঁদের (প্রথম কাতারের সাহাবাগণের) ইক্বতিদা করবেন। যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ

করা হোক, তাক্বলীদ যে শরীয়'তস্বীকৃত একটি চিরন্তন প্রয়োজন তাতে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। (সূত্রঃ মাযহাব কি ও কেন? ১৯-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩য় অংশ

বিজ্ঞ উলামার গবেষণামূলক বক্তব্য

মাযহাব অনুসরণের গুরুত্বের উপর বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো-

১) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- "শরীয়তের নতুন বিষয়সমূহে সাধারণদের জন্য আলিমগণকে অনুসরণ করা ওয়াজিব"। (তাফসীরে কাবীর)

২) "যে ব্যক্তি মুজতাহিদে মুত্বলাক নয় যদিও সে আলিম, তথাপি তার জন্য তাক্বলীদ অর্থাৎ কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করা ফরয"। (মুসাল্লাম)

৩) হযরত মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "সাধারণদের জন্য আলিমগণকে এবং আলিমদের জন্য মুজতাহিদগণকে অনুসরণ করা ওয়াজিব"। (তাফসীরে আহমাদিয়া)

৪) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "যারা ইজতিহাদে মুত্বলাক্বের ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্য কোন একজন ইমামের মাযহাবকে অনুসরণ করা ওয়াজিব"। (জাম্উল জাওয়াম)

৫) হযরত ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব"। (ইহয়া-উ উলূমিদ্দীন এবং কিমিয়ায়ে সাআদাত)

৬) সাফরুস্ সাআ'দাত কিতাবে, ফয়যুল হারামাইন কিতাবে এবং তাফসীরে আযীযীতে বর্ণিত আছে যে- "মাযহাব অনুসারে চলা ওয়াজিব অন্যথায় গুনাহ হবে।"

তা ছাড়া আরোও যারা এ বিষয়ে উক্তি পেশ করেছেন সেসব লেখক এবং কিতাবের নাম প্রকাশ করা হলো-

মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আল মা'লুমা'।

হযরত আল্লামা বাহরুল উলূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তাহরীর'।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'ইক্বদুল জীদ ও ইনসাফ'।

জবাব নং-৫

ক. (মাওলানা সাহেবের কথা)

যারা মারা গেছেন তাদের বেলায় মন্তব্য করা জায়েয নেই বরং দোয়া করা দরকার এবং জীবিতদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আমল শুরু করা দরকার।

খ. (আমাদের বক্তব্য)

মাওলানা সাহেবের দেয়া জবাবের আপত্তিকর ৫ম অংশে অর্থাৎ শেষলগ্নে যা বলেছেন তাতে

আমরা দেখতে পাই যে, যারা ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেছেন তাঁদের উপর কোন মন্তব্য না করার নছীহত করেছেন। সাথে সাথে তাদের জন্য নেক দুআ'র পরামর্শ প্রদান নিশ্চয় এক ভালো কাজ। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দোয়া দুই প্রকারের হতে পারে- এক, ভালো নিয়তে। দুই, খারাপ বা মন্দ নিয়তে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য ভালো করে গেছেন বলে ভালো দোয়া। আর মন্দ করে গেছেন বলে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমাদের বিচারে মাওলানা সাহেবের উক্তিতে দ্বিতীয়টাই স্পষ্ট।

অন্য কথা হচ্ছে, তাঁর এ নছীহতমূলক কথাবার্তা অবশ্যই আনন্দদায়ক। তবে আফসুস থেকে গেল তাঁর শেষ কথায়। অর্থাৎ দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গানে দ্বীনের জন্য নেক দুআ'র নছীহত করার পাশাপাশি আরতো বলেই ফেললেন "এবং জীবিতদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আমল শুরু করা দরকার"। এতে আমাদের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, তাঁর জবাবের মূল উদ্দেশ্য কি! অর্থাৎ মাযহাব মানা বা তাক্বলীদের অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, জবাবদাতা যিনি নিজে কোন মাযহাব মানার পক্ষে নন, তাই ওপরকে মাযহাব মানার আবশ্যকতা দেখাবেন কেমন করে? অতএব, আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে জ্ঞানীগণ বলেন- 'কুল্লু শায়্যিন ইয়ারজিউ ইলা-আছলিহি' অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে- জনাব মাওলানার দেয়া জবাব তাঁর দৃষ্টিতে তাদের কাছেই সঠিক হয়েছে। অন্যদিকে, যারা ইসলামী জীবন-যাপনের জন্য মাযহাবকে ফরয-ওয়াজিবের মতো মনে করেন, কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই আলোর পথের দেয়া জবাব মোটেই গ্রহণীয় নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।

সংযোজন

একঃ- ভুল বুঝাবুঝির অবসানঃ

মাওলানা সাহেব তাঁর জবাবের এক পর্যায়ে বিশ্ববরেণ্য মুজতাহিদ ও ফক্বীহ, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তিকে উপলক্ষ্য করে আশ্চর্য রকমের জ্ঞানগর্ভ একটি মন্তব্যও পেশ করেছেন। এতে করেও বিভ্রান্তির আরেক দিক প্রকাশ পেলো। অর্থাৎ ইমাম আযমের ইজতিহাদ বিষয়ের কোন এক বিশেষ সতর্কতামূলক বাক্যকে জবাবদানের হাতিয়ার হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন, যা আমরা মুক্বাল্লিদগণের জন্য অনুসন্ধানের কারণ নয় বরং ইহা মুজতাহিদগণের জন্য প্রযোজ্য। একটি বাস্তব সত্য যে, যখন কোন মুজতাহিদ কুরআন-হাদীসের আইন বিষয়ক উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবেন, তখন তাঁর গবেষণার দু'টি দিক ফুটে উঠে।

১. হয়তো মুজতাহিদ চিন্তা-গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা-গবেষণা থেকে কোন মাসআলাহ বা ইসলামী শরীয়'তের আইন আবিস্কার করা হয়েছে। অথবা-

২. হয়তো মুজতাহিদের চিন্তা-গবেষণা থেকে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ ব্যাপক গবেষণা থেকে কোন মাসআলাহ বের করা যায়নি বা যে মাসআলাহ তৈরী করা হয়েছে, তাতে অন্য কোন মুজতাহিদের কাছে ভুল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, বা নিজের কাছেও পরে সংশোধনী এসেছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারেও (উভয়শ্রেণীর গবেষণার

উপর) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কাজেই ইজতিহাদের ব্যর্থতা কিংবা সফলতার উপর নিম্নের হাদীসটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ দলীল।

ইজতিহাদ বিষয়ক হাদীস

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যখন কোন ফায়ছালাকারী ফায়ছালা করবে, সে যদি কামিয়াব হয়, দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি সে ভুল করে, তাহলে একগুণ সওয়াব পাবে"। (বুখারী শরীফ)

লক্ষণীয়ঃ মাওলানা সাহেব তাঁর জবাবের একেবারে শুরুতেই প্রশ্নকারীকে বুঝাতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সতর্কতামূলক ভাষ্যকে দূর্বলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'আলোরপথ ম্যাগাজিনে' প্রশ্নের উত্তরটা শুরু হয়েছে এভাবে- জবাবঃ একটি পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে বিস্তারিত জবাব দেয়ার সুযোগ কতুটুকু রয়েছে তা নিশ্চয় আপনার (প্রশ্নকারীর) জানা; তারপরও আপনার প্রশ্নটি বড়ই বিতর্কিত। এ ব্যাপারে মূলনীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মুমিন তার ঈমানের যথাযথ হেফাজতের স্বার্থে সর্বদা কুরআন-হাদিসকেই ইবাদতের ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এ ক্ষেত্রে কে কি বলেছেন (অর্থাৎ কুরআন-হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ হোক বা নাই হোক) তা না দেখে কার কথাটি কুরআন হাদীস ভিত্তিক তাই দেখার বিষয়। অন্যথায় ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে বলে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন, "কেহ যদি অন্ধভাবে কেবল আমার মত জেনেই অনুসরণ করা শুরু করে দেয় বিনা তাহকিকে, তাহলে সে বিভ্রান্ত এবং পদদলিত হবে"। তিনি (ইমাম আযম) আরো বলেছেন, "যখন কোন ছহীহ হাদীস আমার রায়ের বিপক্ষে পাওয়া যাবে তখন হাদীসের বক্তব্যই আমার মাযহাব, এক্ষেত্রে আমার রায়কে অনুসরণ করা গুনাহের কারণ হবে"।

ইমাম আযমের উক্তি

১. "কেহ যদি অন্ধভাবে কেবল আমার মত জেনেই অনুসরণ করা শুরু করে দেয় বিনা তাহকিকে, তাহলে সে বিভ্রান্ত এবং পদদলিত হবে"।

২. "যখন কোন ছহীহ হাদীস আমার রায়ের বিপক্ষে পাওয়া যাবে তখন হাদীসের বক্তব্যই আমার মাযহাব, এক্ষেত্রে আমার রায়কে অনুসরণ করা গুনাহের কারণ হবে"।

অপব্যাখ্যার জবাব

উক্ত বক্তব্যগুলো বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন বলে মনে করি। একথা জানা জরুরী যে, মাযহাবের ইমামগণ বা মুজতাহিদগণ কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীসের কোন কথা তৈরী করেন না, বরং কুরআন-হাদীছে সংরক্ষিত আইন বিষয়ক জটিল ও অস্পষ্ট বাণীগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মাসআলাহ আবিষ্কার করে থাকেন। একজন মুজতাহিদ যদি কোন বিষয়ে একটি মাসআলাহ তৈরী করার পর এ ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীসের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তাহলে ছহীহ হাদীসের বিপরীতে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত

গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথাই আসে না।

মুজতাহিদগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, মানুষের কল্যাণের তরে অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন। এমনিভাবে ইমাম আযম যে উক্তিগুলো পেশ করেছেন, এতে করে তাঁর ইল্‌মের দূর্বলতা ব্যক্তি বিশেষে তাঁর নিজের কাছে থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর দূর্বলতা বের করা একটি সীমাতিরিক্ত ও অন্যায় ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যেকোন ব্যক্তি সে নিজে নিজে তাঁকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে পারে না। আমরা জানি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগ ছিল ৮০ থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ৭০ বছর। তখন কুরআন-হাদীসের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু হয়। ইজতিহাদকৃত মাসআলাহ-মাসাইলের আনুগত্যতা এমনও ছিল যে, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি নিজের মতামতের চেয়ে স্বীয় ছাত্রগণের, (যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং অন্যান্য ফক্বীহ-মুজতাহিদের গবেষণাকেও কখনও নিজের মতামতের উপর প্রাধান্য দিতেন। যেহেতু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে ইজতিহাদ বিষয়ে ভুল হলেও একগুণ ছোওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহর পাক কালাম এবং নবীর হাদীস নিয়ে অলোচনা-গবেষণা করে আইন প্রণয়ন করা যে কত বড় আমানতের কাজ বা কত সতর্কতার বিষয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এসব দিক চিন্তা করেই ইমাম আযম উপরোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। এখন ইমাম আযমের দেয়া উক্তি যদি মাওলানা সাহেব তাঁর দুর্বলতার কারণ বলে ধরে নেন, তাহলে বুঝা যাবে- এ যুগেই নাকি কোনো আলিমের কাছে এ মহান ব্যক্তিত্বের ইজতিহাদকৃত মাসআলায় ভুল পাওয়া গেল? নাঊযু বিল্লা-হি মিন যা-লিক। আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন।

একটি উদাহরণ

খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকার ছিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু খিলাফতের আমানত পেয়ে মুসলিম উম্মাহর সামনে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখছিলেন, সে বক্তব্য যুগে যুগে এধরণের খালিছ-মুখলিছ মহান দায়িত্বশীলদেরকে বার বার স্মরণ করে দেয় এবং শিক্ষা নেয়ার আহবান জানায়।

প্রথম খলীফার বক্তব্য ছিলঃ (খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর)

"হে মুসলিম উম্মাহ! আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমানত দেয়া হয়েছে, তাই এ আমানতের দায়িত্ব পুরোপুরি যদি ঠিকমতো আদায় করতে পারি, তাহলে আপনারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করবেন, অর্থাৎ দায়িত্বশীল হিসেবে মেনে নিবেন। আর যদি আমার ব্যক্তিগত দূর্বলতার কারণে ভুল করে থাকি, তাহলে আপনারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভুল থেকে বাঁচার জন্য আন্তরিক পরামর্শ প্রদান করবেন"। এখানে বলা যাবে আবু বাকার ছিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর বক্তব্য সেটা তার জন্য ঠিক, কিন্তু উম্মাহর কেউ তাঁর শানে অপবাদ লেপন করা বা সে বক্তব্য তার দূর্বলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা অন্যায় হবে। কাজেই ভিন্ন স্বার্থে ইমাম আযমের উপরোক্ত বক্তব্যগুলোকে তাঁর দূর্বলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা

মারাত্মক অন্যায় ও বিভ্রান্তির একটি কারণ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, এ ধরণের ভুলবুঝাবুঝির অবসান হওয়া চাই।

অন্যরকম জবাব-

উপরোক্ত কথার জবাব এই যে, ইনসাফ ও বাস্তবতার বিচারে এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মুজতাহিদের এ ধরণের উক্তি তাঁর নিজের জন্য নয়, বরং যারা ইজতিহাদের ন্যূনতম যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত এবং ইজতিহাদ ও বিচার বিশ্লেষণের সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্নদের লক্ষ্য করেই মুজতাহিদগণ এসব কথা বলে থাকেন। তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহ্লবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেছেন "এ ধরণের উক্তি তাদের জন্যই শুধু প্রযোজ্য, যারা একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী, রাসূলের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত এবং এ সম্পর্কেও অবগত যে, রাসূলের অমুক আদেশ বা নিষেধ রহিত হয়ে যায়নি, (এ অবগতি তারা অর্জন করেছেন) হয় সংশ্লিষ্ট হাদীস ও বিপক্ষের যাবতীয় বক্তব্য বিচার পর্যালোচনা করে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে উক্ত হাদীস মুতাবিক আমল করতে দেখে, অন্য দিকে হাদীসের বিপরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইমামের কাছে কিয়াস ছাড়া কোন দলিল নেই। এমতাবস্থায় রাসূলের হাদীস তরক করার অর্থ গুপ্ত কপটতা কিংবা নিরেট মূর্খতা (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খঃ ১) হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাফিয়া'র' ভাষায়ঃ- ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন মুফতি সাহেব সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করলেও লোকের জন্য তাক্বলীদ করা অপরিহার্য, এর কোন বিকল্প নেই। ইমাম হাসান ইবনে রোস্তম ও বশীর বিন ওয়ালীদ যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বক্তব্য রেওয়ায়েত করেছেন।

আল্লামা সাইফুদ্দীন সামুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামুল আহকামে' ৪র্থ খন্ডে লেখেছেনঃ- (ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কতিপয় ইল্ম অর্জন করা সত্ত্বেও) সামগ্রিক ইজতিহাদী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত আলিমগণের কর্তব্য হলো- নিষ্ঠার সাথে মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া অনুসরণ করে যাওয়া।

আল্লামা খতীব বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেনঃ কতিপয় মুতাজিলীর কথা- সাধারণ লোকের পক্ষে দলীল না জেনে কোন আলিমের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া মেনে নেয়া যায় না, এটা ভুল। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সম্ভব হওয়ার একমাত্র উপায় হলো-

বছরের পর বছর বিজ্ঞ ফক্বীহগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইল্মে ফিক্বাহ অধ্যয়ন করা।

কিয়াস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিপক্ষতা অর্জন করা বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত কিয়াসের যোগ্যতা লাভ করা।

দুই দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার প্রদানের প্রজ্ঞা অর্জন করা। বলাবাহুল্য যে, সাধারণ লোকের এ কাজ করার মানেই হলো অসাধ্য সাধনে বাধ্য করা। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খঃ ২)

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তির ব্যাপারে আরো একটু ব্যাখ্যা দিলে বলা

যাবেঃ-

ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াতে রয়েছে "আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার মতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- সাধারণ লোকদেরকে ইসহাক, আবু উবাইদা, আবু সাওর ও আবু মুসআব প্রমুখ ইমামের তাক্বলীদ করার নির্দেশ দিতেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু দাউদ উসমান বিন সাঈদ ইব্রাহীম আল হারবী, আবু বাকার আল-আসরম, আবু যর'আ, আবু হাতিম সিজিস্তানী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্রদেরকে কারো তাক্বলীদের ব্যাপারে নিষেধ করে বলতেন- তোমাদের জন্য শরীয়তের উৎস আকড়ে ধরাই ওয়াজিব।'

আসল বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট, তা যুক্তি প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না, কেননা মুজতাহিদের মতে- তাক্বলীদ অবৈধ হলে মানুষকে তারা হাজার হাজার ফতোয়া বা জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে গেছেন কোন্ যুক্তিতে?

আরো মজার ব্যাপার এই যে, প্রায় সকল মুজতাহিদই তাঁদের ভাষায় সাধারণ লোকের জন্য তাক্বলীদের অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তাক্বলীদের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের নিষেধবাণী ছিলো তাদের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের (ছাত্রের) প্রতি। কারণ, এরূপ না বললে ছাত্ররা তাহকিক করা বন্ধ করে দিবে। বর্তমান সময়ের জন্য নয়, কেননা হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকই ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একেকজন ইমাম ।

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের কঠোর নির্দেশ ছিল নির্ভেজাল তাকলীদের। বস্তুতঃ কতিপয় স্থুলদর্শী মুতাজিলী ছাড়া ইসলামী উম্মাহর নেতৃস্থানীয় সকলেই তাক্বলীদের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে গেছেন।

সারকথা- মুজতাহিদ কর্তৃক মুজতাহিদদের তাক্বলীদ সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও যারা মুজতাহিদ নন, তাদের জন্য তাক্বলীদের (মাযহাব) অপরিহার্যতা সম্পর্কে সকল ইমাম জোরালোভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

কুরআন-হাদীসের আলোকে ইজমা' ও কিয়াস

আল ইজ্মা'-

শাইখ আহমাদ ইবনে আবূ সাঈদ মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি বলেন- ইজ্মা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঐক্যমত। আর শরীয়'তে ইজ্মা বলা হয়, এক যামানায় উম্মতে মুহাম্মাদির সকল নেককার মুজতাহিদগণের কোন কথা অথবা কাজের উপর ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজ্মা' বলা হতো।

ইজমা' দুই প্রকারঃ

(১) ইজমায়ে আযীমত

সকল মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করা যদ্বারা ঐক্যমত প্রমাণিত হয়। যেমন সকলেই বললেন 'আজমা'না- হা-যা-' অর্থাৎ আমরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত। এরূপ

ইজ্‌মা’ ক্বাউলী বিষয়ের অর্থাৎ বক্তব্যমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অথবা উক্ত বিষয়টি যদি ফি’লী অর্থাৎ কার্যমূলক হয়। আর সকলেই তা আ’মল করা শুরু করে দেয়, তবে এরূপ ইজমা’কে ইজমায়ে আ’যীমত বলে।

(২) ইজমায়ে রুখসৎ

ইজতিহাদকৃত কথা বা কাজের উপর কেউ কেউ ঐক্যমত পোষণ করা আর কেউ কেউ পোষণ না করা। অর্থাৎ ইজতিহাদকৃত বিষয়ে কেউ কেউ ঐক্যমত পোষণ করেছেন আর বাকী সকল নিশ্চুপ রয়েছেন। সংবাদ পৌছার তিন দিনের মধ্যে প্রতিবাদ করেননি। এরূপ ইজমাকেই ‘ইজমায়ে রুখসত’ বলা হয়। আর একেই ইজমায়ে সুকূতীও বলা হয়। (নূরুল আন্‌ওয়ার মাআ’ আযহারিল আযহার- ৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইজমা’ প্রসঙ্গে দলীল

ক. আল কুরআন থেকে-

১. (সূরাহ/২ আয়াত- ১৪৩) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

অনুবাদ- “একইভাবে তোমাদেরকে আমি ন্যায়পরায়ণ (মধ্যস্থতাকারী) উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা (ক্বিয়ামত দিবসে) অন্যান্য উম্মতের সাক্ষী হতে পারো”।

তাফসীর- ইমাম ইবনে সালাহ রাহমাতুল্লাহি আ’লাইহি “মুক্বাদ্দিমায়ে ইবনুস্‌ সালাহ” কিতাবে এবং মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আ’লাইহি “নুরুল আন্‌ওয়ার” কিতাবে উক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুমের ইজমা’ ছাবিত করেছেন।

২. (সূরাহ/৩ আয়াত-১১০) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- অনুবাদ-“তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের মধ্যথেকে বের করা হয়েছে”।

তাফসীর- ইমাম ইবনে সালাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন- “মুফাস্‌সিরগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াত শরীফে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ’লা আ’লাইহিম আজমাঈনগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৩. (সূরাহ/৪ আয়াত-১১৫) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- অনুবাদ-“কারো কাছে হেদায়ত বিকশিত হওয়ার পরও যদি সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধাচরণ করে, আর মুমিনগণের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সে দিকেই ফিরাবো, যেদিকে সে ফিরেছে”।

তাফসীর- মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আ’লাইহি বলেন- “উপরোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা এটাই সাব্যস্থ হলো যে, মুমিনগণের বিরোধিতা করা মূলতঃ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা করারই নামান্তর। তাই রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস শরীফের ন্যায় ইজমা’ও অকাট্য ও প্রামাণ্য দলীল বলে গণ্য হবে”। (নুরুল আন্‌ওয়ার)

৪. (সূরাহ/৪৮ আয়াত-২৯) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- অনুবাদ-“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহপাকের এক রাসূল। আর তাঁর (নবীজীর) সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু

আন্হু)-গণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে ওপরের প্রতি সহনুভূতিশীল"।

৫.(সূরাহ/৫৯ আয়াত-২)

আল্লাহপাক বলেন- অনুবাদ- "হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা করো"।

আল-ক্বিয়াস

যে সকল ইজতিহাদকৃত মাসআলা এককভাবে রয়েছে তা-ই কিয়াস।

ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি সম্পর্কে উছূলের কিতাবে বলা হয়েছে নিম্নরূপ।

"উছূলুশ্শারয়ি' ছালা-ছাহ। আলকুরআনু, আলহাদীসু, আল ইজমায়ূ ওয়া রাবিয়ুহা আল কিয়াস।"

অনুবাদ-

মূলতঃ শরীয়তের ভিত্তি হলো তিনটি। আল কুরআন, আল হাদীস, আল ইজমা এবং চতুর্থ হলো আল কিয়াস। (নুরুল আন্ওয়ার)

(ক) আল কুরআন থেকে-

"ফা'তাবিরূ ইয়া- উলিল আবছোয়া-র।"

অনুবাদঃ সুতরাং হে চাক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা করো। [সূরাহ হাশর/২]

(খ) আল হাদীস থেকে- (অনুবাদ)

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বোন হজ্জ করার মান্নত করে আদায় করার আগে ইন্তিক্বাল করেছেন। তখন হুযুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন "তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি তা আদায় করতে কি? তখন আগন্তুক ব্যক্তি বললেন 'হ্যাঁ' তখন হুযুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, "তাহলে আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করো, কেননা এটা আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (বুখারী ও মুসলিম)

(২) কিয়াসের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিম্নে তার প্রমাণঃ

"হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন "যখন কোন ফায়ছালাকারী ফায়ছালা করবে, সে যদি কামিয়াব হয়, দ্বিগুণ ছোয়াব পাবে। আর যদি সে ভুল করে, তাহলে একগুণ ছোয়াব পাবে।" (বুখারী শরীফ)

(৩) হুযুরপাক সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআ'য বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্হুকে ইয়ামানের গভর্ণর করে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেছিলেন- "হে মুআ'য! তোমার কাছে কোন মোকদ্দমা আসলে কিভাবে তা ফায়ছালা করবে? তখন হযরত মুআ'য বিন জাবাল বললেন, আল্লাহপাকের কিতাবের দ্বারা। নবীজী বললেন, যদি তাতে না পাও তাহলে? তখন তিনি বললেন- আল্লাহপাকের নবীর সুন্নাত (হাদীস)-এর দ্বারা। নবীজী বললেন, তাতেও যদি না পাও তাহলে? তখন হযরত মুআ'য বিন জাবাল বললেন- আমি (কুরআন ও হাদীসের উপর)

গবেষণা করে ঘোষণা বা রায় দিবো। (হযরত মুআ'য বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আন্হুর জবাব শুনে) নবীজী ইরশাদ করলেন- সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাকের, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এ যোগ্যতা দান করেছেন- যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন"। (মিশকাত শরীফ, আশ্আ'তুল লুমুআ'ত, মিরক্বাতুল মাফা-তীহসহ হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য)

(৩) সাহাবায়ে কেরামের যুগ

যেমন- আবু বাকার ছিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুর কিয়াসঃ

"হযরত আবু বাকার ছিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুর কাছে যখন কোন মোকদ্দমা আসতো, **১**ম পর্বে- কুরআন-হাদীসের প্রতি নযর দিতেন। তখন সেখানে স্পষ্ট কোন কিছু না পেলে- **২**য় পর্বে- নিজের রায় অনুযায়ী কিয়াস করে নিতেন। যদি সঠিক মতে পৌছতেন তাহলে আল্লাহপাকের পুরস্কারের আশা করতেন। আর ভুল হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। (তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ)

অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুর নীতি ছিল যে, তিনি ফায়ছালা করার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের পর হযরত আবু বাকার ছিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু ও হযরত উমার ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুর রায়ের প্রতি নযর দিতেন। সেখানেও না পাওয়া গেলে বলতেন "ফীহি বিরা-য়ী" অর্থাৎ নিজের রায় মুতাবিক্ব ফায়ছালা করতেন। (মুসনাদু দারিমী, মুসতাদরিকে হাকীম)

তাক্বলীদ যুগে যুগে

উল্লেখ্য যে, তাক্বলীদ দুই প্রকার যথাঃ মুক্ত তাক্বলীদ ও ব্যক্তি তাক্বলীদ।

(ক) সাহাবায়ে কেরামের যুগঃ (মুক্ত তাক্বলীদ)

নবীজির প্রিয় সাহাবাগণের পূণ্যযুগেও কুরআন -সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত 'তাক্বলীদ'এর উপর ব্যাপক আমল বিদ্যমান ছিলো। সাহাবাগণের মধ্যে যাদের ইল্ম অর্জনের পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ ছিলো না কিংবা যাদের ইজতিহাদ প্রয়োগের ক্ষমতা ছিলো না, তারা নির্দ্বিধায় ফক্বিহ ও মুজতাহিদ সাহাবাগণের শরণাপন্ন হয়ে তাদের ইজতিহাদ মুতাবিক আমল করে যেতেন।

মোটকথা, সাহাবাগণের পূণ্যযুগে মুক্ত তাক্বলীদ ও ব্যক্তি তাক্বলীদ উভয়ের প্রচলন ছিল।

বিশেষকরে মুক্ত তাক্বলীদের এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে, তার সংক্ষিপ্ত সংগ্রহও এক বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। পরিসরের কথা বিবেচনা করে কয়েকটি মাত্র নযীর এখানে আমরা তুলে ধরলাম।

প্রথম নযীরঃ-

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো: প্রথম জন দ্বিতীয় জনের কাছে মেয়াদী ঋণের পাওনাদার। আর সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরিশোধের শর্তে আংশিক ঋণ মওকুফ করে দিতে সম্মত হয়েছে। (এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি) হযরত

ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে তা নাকচ করে দিলেন।

এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ সম্বলিত কোন মারফু হাদীস না থাকায় নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায় যে, এটা হযরত ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর নিজস্ব ইজতিহাদ। অথচ তিনি নিজে যেমন তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকুলে কোন দলিল পেশ করেননি, তেমনি প্রশ্নকারীও তা তলব করেনি। ***আর শরীয়তের পরিভাষায় বিনা দলীলে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক আমল করার নামই তাক্বলীদ।***

দ্বিতীয় নযীর ঃ

হযরত আব্দুর রহমান বলেনঃ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমি হাম্মাম খানায় গোসলের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে শুধু তনি বললেন, হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু এটা অপছন্দ করতেন।

দেখুনঃ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্নকারীর জবাবে হাদীস-দলীল উল্লেখ না করে হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ এ সম্পর্কে এমনকি হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

তৃতীয় নযীরঃ

'মুআত্বায়ে ইমাম মালিক' নামক হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে একবার ইহরাম অবস্থায় রঙ্গীন কাপড় পরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। রংগানো কাপড় পরেছো যে? হযরত তালহা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এতে তো কোন সুগন্ধী নেই। (আর রংগানো কাপড়ে সুবাস না থাকলে ইহরাম অবস্থায় তা পরতে আপত্তি থাকার কথা নয়) হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু তখন তাকে বললেন, তালহা! তোমরা হলে ইমাম। সাধারণ মানুষ তোমাদের সব কাজের ইক্বতিদা করে থাকে। কোন অজ্ঞ লোক এ অবস্থায় তোমাকে দেখলেই বলবে, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ইহরাম অবস্থায় রংগানো কাপড় পরতেন। (অজ্ঞতাবশতঃ সুবাসহীন ও সুবাসিত সব ধরনের কাপড়ই তারা তখন পরা শুরু করবে)। সুতরাং এ ধরনের কাপড় তোমরা পরো না।

চতুর্থ নযীরঃ

হযরত মুসআব বিন সাআদ বলেন- আমার বাবা সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস মসজিদে সালাত পড়ার সময় পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত রুকু সিজদা করতেন। কিন্তু ঘরে তিনি রুকু সিজদাসহ বিলম্বিত সালাত পড়তেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, ছেলে! আমরা ইমাম বলে আমাদের ইক্বতিদা করা হয়। (সুতরাং আমাদের দীর্ঘ সালাত দেখে ওরা তা জরুরী মনে করবে। ফলে সালাত তথা গোটা শরীয়'ত তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে)।

এ রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ সাহাবাগণের বাণী ও বক্তব্যের সাথে সাথে তাঁদের কর্ম ও আচরণের ইক্বতিদা করতো। তাই নিজেদের খুঁটিনাটি আমল সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট সতকর্তা অবলম্বন করতেন। বলাবাহুল্য যে, কারো আমল দেখে ইক্বতিদা করার ক্ষেত্রে দলীল প্রমাণ তলব করার কোন প্রশ্নই আসে না।

পঞ্চম নযীরঃ

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে তাবাকাতে ইবনে সাআদের বরাতে বর্ণিত হয়েছে- হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুকে একবার বলা হলোঃ মসজিদে রক্ষিত ঐ সিক্বায়া (পানপাত্র) থেকে আপনি পানি পান করেছেন, অথচ তা সদকার সামগ্রী। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু (তিরস্কারের স্বরে বললেন) থামো হে! আবু বাকার ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু উম্মে সাআদের সিকায়া থেকে পানি পান করেছেন। দেখুন, আত্মপক্ষ সমর্থনে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু খলিফাদ্বয়ের আমল ভিন্ন অন্য কোন দলিল পেশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। আসলে তিনি তাদের তাক্বলীদ করছিলেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা বিবেচনা করে মাত্র অল্প কয়েকটি নযীর এখানে আমরা পেশ করলাম। এ ধরনের আরো অসংখ্য নযীর আপনি পেতে পারেন- মুআত্বায়ে ইমাম মালিক, কিতাবুল আছার লিল ইমাম আবু হানীফা, মুছান্নাফে আব্দুর রায্যাক্ব, মুছান্নাফে ইবনে শাইবা, শরহে মাআনিল আছার লিত্তাহাবী এবং মাত্বালিবে আলিয়া লি- ইবনে হাজার প্রভৃতি গ্রন্থে।

সারকথাঃ-

ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ উভয় পন্থা অবলম্বন করতেন। কখনও কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল উল্লেখ করে ফতোয়া দিতেন আবার কখনো বিনা দলীলে শুধু সিদ্ধান্তটুকু শুনিয়ে দিতেন। আর মানুষ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করতো।

(খ) সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগঃ (ব্যক্তি তাক্বলীদ)

মুক্ত তাক্বলীদের পাশাপাশি ব্যক্তি তাক্বলীদের ধারাও সমানভাবে বিদ্যমান ছিলো সাহাবা ও তাবেয়ীগণের পূণ্য যুগে। অনেকে যেমন একাধিক সাহাবীর তাক্বলীদ করতেন তেমনি অনেকে নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর তাক্বলীদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। এ সম্পর্কিত দু'একটি নযীর শুধু এখানে তুলে ধরছি।

প্রথম নযীরঃ

বুখারী শরীফে হযরত হুযাইফা বিন শুরাহবিল বলেন- হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, তবে সেই সাথে প্রশ্নকারীকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতামত জেনে নেয়ারও নির্দেশ দিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ বরাবরে বিষয়টি পেশ করা হলে তিনি বিপরিত সিদ্ধান্ত দিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু সব বিষয় অবগত হয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর উচ্ছসিত প্রসংশা করে বললেন, "এ মহা জ্ঞানসমুদ্র যত দিন বিদ্যমান আছেন ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না"। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল ফারাইদ্ব, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠাঃ ৯৯৭ এবং মুসনাদে আহমদ খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৪)

দেখুন, হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু সকলকে ইবনে মাসউদের উপস্থিতিতে তাঁর কাছেই মাসাইল জিজ্ঞাসার পরামর্শ দানের মাধ্যমে কি সুন্দরভাবে ব্যক্তি তাক্বলীদকে উৎসাহিত করলেন।

দ্বিতীয় নযীরঃ

আমর বিন মাইমুন আওদী বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু ইয়ামানে আমাদের মাঝে এসেছিলেন। ফজরের সালাতে আমি তাঁর তাকবীর শুনতে পেতাম। গভীর ও ভরাট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে ভালবাসলাম এবং শামদেশে তাঁকে দাফন করার পূর্বপর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে আঁকড়ে থাকলাম। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ। একইভাবে আমরণ তাঁর সান্নিধ্যের সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি।

"তাঁর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ" হযরত আমর বিন মাইমুনের এ মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, ফিক্বাহ ও মাসাইলই ছিলো যথাক্রমে হযরত মুআয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর সাথে তাঁর সম্পর্কের বুনিয়াদ। এবং হযরত মুয়াযের জীবদ্দশায় ফিক্বাহ ও মাসাইলের ব্যাপারে তাঁর সাথে ছিল একক সম্পর্ক। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পরবতীর্তে সে সম্পর্ক গড়ে উঠে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর সাথে।

আরো কিছু নযীরঃ

তাবেয়ীগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সাহাবীর একক তাক্বলীদের আরো বহু নযীর ছড়িয়ে আছে হাদীস গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

সুপ্রসিদ্ধ তাবিঈ ইমাম শা'বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "বিচার ক্ষেত্রে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করতে হলে হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর মতামতই অনুসরণ করা উচিত।"

অপর তাবিঈ হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশ হলো- কোন বিষয়ে মতানৈক্য হলে দেখে নাও হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু কি করেছেন, তাকেই তোমরা অনুসরণ করবে।

সর্বজনমান্য তাবিঈ হযরত ইব্রাহীম নাখ্য়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসৃত নীতি প্রসংগে ইমাম আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-হযরত উমার ও ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মুকাবিলায় কাউকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তবে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিলে হযরত ইবনে মাসউদের মতামতই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতো।

হযরত আবু তামীমাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন -সিরিয়ায় গিয়ে দেখি, লোকেরা দল বেঁধে একজনকে ঘিরে বসে আছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তারা বললো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট সাহাবাগণের মাঝে ইনিই শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ। তাঁর নাম- 'আমার আল বাকালী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু'।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু ছাড়া আর কোন সাহাবীর স্বনামধন্য শিষ্য ছিলো না। ফলে তাদের ফতোয়া ও ইজতিহাদ (আগাগোড়া) বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ইবনে মাসউদই একমাত্র ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও নিজস্ব ইজতিহাদের পরিবর্তে হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা

আ'ন্হুকেই তিনি অনুসরণ করতেন। পারতপক্ষে হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হুর কোন ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেননি বরং নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তাঁর মতামতই মেনে নিতেন। ইমাম শা'বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ইবনে মাসউদ কুনুত পড়তেন না। (কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে) হযরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু কুনুত পড়লে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আ'ন্হু অবশ্যই কুনুত পড়তেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিপ্লবী গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেছেনঃ- কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো উক্তি হুজ্জাত (দলীল) নয় এবং আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য কারো হালাল হারাম নির্ধারণের ইখতিয়ার নেই। অতঃপর যদি সে হাদীসের অর্থ নির্ধারণ, দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং হাদীস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে অক্ষমতার কারণে হিদায়াতপ্রাপ্ত কোন আলিমকে এই শর্তে অনুসরণ করে যে, তিনি সুন্নাহ মুতাবিক ফতোয়া দিবেন এবং সুন্নাহ বিরোধী ফতোয়া দিচ্ছেন, প্রমাণিত হওয়া মাত্র নির্দ্বিধায় তাকে বর্জন করা হবে। তাহলে আমার মতে কোন বিবেকবানের পক্ষে তাহা নিন্দা করা সম্ভব নয়। কেননা ফতোয়া প্রদান ও গ্রহণের বৈধতা যখন প্রমাণিত হলো, তখন নির্দিষ্ট একজনের কিংবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের ফতোয়া গ্রহণ একই কথা। তবে ফতোয়াদাতাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। (সূত্রঃ- মাযহাব কি ও কেন? ৩৩-৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সারকথা

এই হলো সাহাবা যুগের ব্যক্তি তাক্বলীদ এর নমুনা। তবে মুকাল্লিদের ইল্‌ম ও প্রজ্ঞার তারতম্যের কারণে তাক্বলীদের স্তরে তারতম্য হতে পারে। এমনকি ব্যক্তি তাক্বলীদের গন্ডিতে থেকেও মুক্বাল্লিদ ক্ষেত্রবিশেষে আপন ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হানাফী মাযহাবের মাশাইখ ও শীর্ষ আলিমগণ মূলনীতি পর্যায়ের ইমাম আবু হানিফা তাক্বলীদ বজায় রেখে বিশেষ বিশেষ মাসআলায় এসে নিঃসংকোচে ভিন্ন ফতোয়াও প্রদান করেছেন। সাহাবাগণের পূণ্যযুগে মুক্ত তাক্বলীদের পাশাপাশি ব্যক্তি তাক্বলীদের ধারাও বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ কুরআন হাদীস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা যার ছিলনা, তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ সাহাবীগণের তাক্বলীদ করতেন। তবে অনুসরণ করেছেন ব্যক্তি তাক্বলীদের পথ, আর কারো মুক্ত তাক্বলীদই ছিল অধিক পছন্দ। সুতরাং দু'একটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল উদাহরণ টেনে এতগুলো সুস্পষ্ট ও সুসংহত তথ্য প্রমাণ উপেক্ষা করা কোন অবস্থাতেই বুদ্ধিভিত্তিক সততার পরিচায়ক হতে পারে না। বস্তুতঃ এরপরও সাহাবা-যুগে তাক্বলীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মেঘ খন্ডের কারণে আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

(গ) ফুক্বাহায়ে কেরামের স্তরঃ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর লিখিত মূল মাকতুবাত শরীফের

২য় খন্ডের ৫৫নং মাকতুবে সুপ্রসিদ্ধ চার ইমাম ছাড়াও সাত তবক্বার ফক্বীহগণকেও হক্বপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তবক্বার ফুক্বাহায়ে কেরামঃ

১. দ্বীন বা ধর্মের মুজতাহিদঃ (ফক্বীহ মুজতাহিদ ফিদ্দীন)

তাঁরা ইসলামের উৎস চতুষ্টয় থেকে মাসআলাহ বের করার পদ্ধতি এবং নীতি গঠন করেছেন এবং এভাবে দ্বীনের নিয়ম-কানুন বের করেছেন। চারজন আল আইম্মাতুল মাযাহিব যেমন- (ইমাম আবু হানীফা গং চার মাযহাবের ইমামগণ) এরা তবকা বা স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

২. মাযহাবের মধ্যে মুজতাহিদঃ (ফক্বীহ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব)

তাঁরা মাযহাবের ইমামদের তৈরীকৃত মূলনীতি অনুসারে মূল চার উৎস (কুরআন হাদীস ইজমা কিয়াস) থেকে মাসআলাহ বের করেছেন। যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনগণ।

৩. মাসআলার মুজতাহিদঃ (ফক্বীহ মুজতাহিদ ফিল মাসাইল)

মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ যেসকল বিষয়ে আলোচনা করেননি এই স্তরের ফক্বীহগণ সেসকল ক্ষেত্রে মাযহাবের মূলনীতি অনুসারে মাসআলা বের করেছেন। কিন্তু এ কাজেও তারা ইমামদের অনুসরণ করেছেন। তাঁরা হলেন ইমাম ত্বাহাবী, ইমাম খাস্‌সাফ, আহমাদ ইবনে উমার, আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইন আল কারখী, শামসুল আইম্মা আল হালওয়ানী, শামসুল আইম্মা আস্‌-সারাখ্‌সী, ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল বাযদাবী, কাযীখান হাসান ইবনে মনসুর আল ফারাহগানী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

৪. আছহাবুত্‌ তাখরীজঃ

তাঁরা নিজেরা ইজতিহাদ করেননি বরং মুজতাহিদগণ কর্তৃক বের করা অস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত মাসআলা সমূহের ইল্লাত ও মানাত্ব অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহ বের করেছেন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। হুসামমুদ্দীন আর্‌ রাযী আলী ইবনে আহমাদ- তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আল কুদুরী কিতাবের উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

৫. আছহাবুত্‌ তারজীহঃ

তাঁরা মুজতাহিদগণ থেকে আগত বিভিন্ন রেওয়ায়েত (মুজতাহিদগণের উক্তি বা মতামত) থেকে একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন আলী ফারগানী তিনি আল হিদায়ার লিখক।

৬. আছহাবুত্‌ তামীযঃ

তাঁরা মুক্বাল্লিদ হিসেবে বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফক্বীহগণের রেওয়াজসমূহ তাঁদের কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁরা কোন বাতিলকৃত রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেননি। ক্বানযুদ্‌ দাক্বায়িক্ব প্রণেতা আবুল বারাকাত ইবনে আহমাদ আন্‌ নাসাফী, মুখতার প্রণেতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মুসুলী, আল বেক্বায়া প্রণেতা বুরহানুশ শারীয়াহ্‌ মুহাম্মাদ ইবনে ছাদরুশ্‌ শারীয়াহ উবাইদুল্লাহ, মাজমাউল বাহরাইন এর লেখক ইবনুস্‌ সাআ'তী আহমাদ ইবনে আলী আল বাগদাদী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

৭ সপ্তম স্তরের মুক্বাল্লিদঃ

উত্তম, মধ্যম, অধম, প্রকাশ্য রেওয়ায়েত ও বিরল রেওয়ায়েত সমূহের পার্থক্য নির্ণয় করবার ক্ষমতা ও দক্ষতা তাঁদের নেই। তাঁরাও ফক্বীহদের মধ্যে গণ্য। কারণ নিজে কিতাব বুঝার এবং যারা বুঝেনা তাদেরকে বুঝানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে। সপ্তম ত্ববক্বা সম্মন্ধে 'দুর্‌রুল মুখতার' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে- 'পূর্ববর্তীগণ যা ছহীহ করেছেন এবং পছন্দ করেছেন তার বিপরিত কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

তা ছাড়া ছিহাহ সিত্তাহ'র ইমামগণও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করতেন। ***কারণ মুহাদ্দিছীনে কেরামের মৌলিক প্রচেষ্টা ছিল হাদীস শাস্ত্রের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। পক্ষান্তরে মুজতাহিদীনে কেরামের মৌলিক প্রচেষ্টা ছিল ইসলামী আইন বিষয়ক হাদীসের উপর গবেষণা করতঃ মাসআলা-মাসাইল আবিষ্কার করা। আর ইহা ছিল অত্যন্ত কঠোর প্ররিশ্রমের দু'টি আলাদা কাজ। সেজন্য হাদীস শাস্ত্রবিদগণ বাধ্য হয়ে নিজের কল্যাণের তরে পছন্দমতো যে কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। তাঁদের যুগ ছিল ১৯৪ থেকে ৩০৩ হিজরী পর্যন্ত সর্বমোট ২৮৯ বৎসর।***

শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন-

১) ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (১৯৪-২৫৬ হিজরী)

২) ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (২০৪-২৬১ হিজরী)

৩) ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (২১৫-৩০৩ হিজরী) প্রমুখ ইমামগণ এবং

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন-

৪) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (২০২-২৭৫ হিজরী)

৫) ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (২০৭-২৭৩ হিজরী)

৬) ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (২০৯-২৭৯ হিজরী) প্রমুখ ইমামগণ।

হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন-

মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মুহাদ্দিছ ওক্বী ইবনে জাররাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীন আল ক্বাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মুহাদ্দিছ ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মুহাদ্দিছ ইমাম যাইলায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মাযহাব প্রসঙ্গে বিভিন্ন কিতাবের ভাষ্য

মাযহাব অনুসরণের গুরুত্বের উপর বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো-

১. তাফসীরে কাবীর কিতাবে- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "শরীয়তের নতুন বিষয়সমূহে সাধারণদের জন্য আলিমগণকে অনুসরণ করা ওয়াজিব"।

২. মুসাল্লাম কিতাবে- "যে ব্যক্তি মুজতাহিদে মুত্বলাক নয় যদিও সে আলিম, তথাপি তার

জন্য তাক্বলীদ অর্থাৎ কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করা ফরয”।

৩. তাফসীরে আহ্‌মাদিয়াত কিতাবে- হযরত মুল্লা যিউন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সাধারণদের জন্য আলিমগণকে এবং আলিমদের জন্য মুজতাহিদগণকে অনুসরণ করা ওয়াজিব”।

৪. জামউল জাওয়াম কিতাবে- আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যারা ইজতিহাদে মুত্বলাক্বের ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্য কোন একজন ইমামের মাযহাবকে অনুসরণ করা ওয়াজিব”।

৫. ইহয়া-উ উলূমিদ্দীন এবং কিমিয়ায়ে সাআদাত কিতাবে- হযরত ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব”।

তা ছাড়া- হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘আল মা’লুমা’- হযরত আল্লামা বাহরুল উলূম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘তাহরীর’- হযরত ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘ইকুদুল জীদ, ইনসাফ’, ‘সাফরুস্ সাআ’দাত’ ও ‘ফয়যুল হারামাইন’ এবং ‘তাফসীরে আযীযী’তে বর্ণিত আছে যে-“মাযহাব অনুসারে চলা ওয়াজিব। অন্যথায় গুনাহ হবে।” (তথ্যসূত্রঃ মাযহাব নিয়ে বিভ্রান্তি- একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠার মুখোশ উন্মোচন পৃষ্ঠা ৮-৫০)

তৃতীয় পর্ব

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং পরকাল

কোন বস্তুর ওজন নির্ধারণ করতে হলে একটি নিক্তি বা পাল্লার প্রয়োজন। অতি সাম্প্রতিককালে ডিজিট্যাল যান্ত্রিক নিক্তিও বাজারে এসেছে। যদিও তা পুরাতন যুগের দাড়িপাল্লার মতো নয়। তবে কর্মসম্পাদনের নীতি একই। নিক্তি এমন যন্ত্র, যার সাথে সমপরিমাণ ওজনের একটি বস্তু না থাকলে তার নির্ধারণ ক্ষমতা বেকার। সুতরাং ওজনের সত্য বা হক্ব-কে নির্ধারণ করতে হলে, সমপরিমাণ একটা কিছুর প্রয়োজন। এখন কেউ যদি বলেন, আমি পৃথিবীর ওজন জানতে চাই। তাহলে হয়তো তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা দিয়ে পৃথিবীর ওজনের একটি ধারণা পেয়ে যাবেন। কারণ আকাশের অক্ষপথে অনেকগুলো গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যেকোনো একটির সাথে তুলনা দিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন। তবে সঠিক ওজন নির্ধারণ করতে পারবেন না। কারণ সমপরিমাণ ওজনদার একটি বস্তু আবিষ্কার করা এবং বিশাল আকারের নিক্তিতে তুলে ওজন করা বর্তমান বিজ্ঞতার বাইরে। এখানে অনেক ব্যাপার-স্যাপার জড়িত আছে। যেমন পৃথিবী নামক এই বিশাল গ্রহটি চতুর্দিক থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উপর চলমান।

অন্যদিকে, পৃথিবীর আয়তনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও ওজনের ধারণা পাওয়া যেতে পারে, তবে এগুলোও হবে অনুমান। সঠিক ওজন নির্ধারণ মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টা নিয়ে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায় যে, কেউ এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর যে বা যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এগুলোর আয়তন ও ওজন থেকে বিশাল। কারণ, একটা বস্তুর স্রষ্টা কখনো সৃষ্ট থেকে ছোট হতে পারে না। উপমাস্বরূপ, পৃথিবীতে দন্ডায়মান বহুতল বিশিষ্ট একটি দালানের ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই দালানটির ওজন কতো? তারা সঠিক বলে দিতে পারবেন। যেহেতু তারা নিজে এটা তৈরী করেছেন। এমনকি এই দালান তৈরীতে কি কি জিনিস কতটুকু লেগেছে, তাও বলতে পারবেন।

একইভাবে, বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যে বৈজ্ঞানিক সৃষ্ট সময় নির্ধারণের উপর সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও সপ্তাহের হিসেবে দিনাতিপাত করছি। সেটাও পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ প্রকৃত সময় নির্ণয় করতে হলে স্থির বস্তুর প্রয়োজন। যেমন, লন্ডন শহরের পিকাডিলী সেন্টারের একটি স্থানে, মাটির উপর একটি খুঁটি পুতে ওর চারপাশে ম্যাপ অঙ্কন করা হয়েছে। ম্যাপে লেখা রয়েছে বৃটেনের কোন্ শহর কোন্ দিকে এবং এই কেন্দ্রস্থল থেকে এর দূরত্ব কতটুকু। যেহেতু এই খুঁটিকে কেন্দ্রস্থল ধরে নিয়ে দূরত্বটা নির্ণয় করা হয়েছে। তাই আমরা যখন মটরওয়েতে গিয়ে সাইনবোর্ডের দিকে নজর দেই, তখন দেখি বার্মিহ্যাম ১২৫ মাইল দূরে। অর্থাৎ পিকাডিলীর ঐ স্থির খুঁটি থেকেই এই পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণের ভিত্তিতে পৃথিবী

যেমন ঘুর্ণমান, তেমনি সূর্যও ঘুর্ণমান। এমনকি সমস্ত সৌরজগতে একটি স্থির বস্তুও পাওয়া যায় না, যা ঘুর্ণমান নয়। তাহলে আমাদের এই সময় নির্ধারণটিও সঠিক নয়, বরং অনুমানের ভিত্তিতে। তবে এটা সত্য যে, এই সমস্ত সৃষ্টিতে অবশ্যই একটা স্থির বস্তু রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে সঠিক সময় নির্ণয় করা যায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, এই সঠিক, স্থির এবং স্থায়ী বস্তু কি?

উত্তরটা খুব সহজ। অর্থাৎ কেবলমাত্র চিরস্থায়ী হচ্ছেন আল্লাহ্। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর চিরস্থীরকৃত সত্ত্বা।

বিজ্ঞানের একটি সাধারণ প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে কোনো 'ফল' পাওয়া যায়, সেখানে এই 'ফল'-এর মূলে কোনো 'কারণ' নিহীত থাকে। অর্থৎ বৈজ্ঞানিকরা সারাক্ষণ এই 'কারণ'-এর পশ্চাতের 'কারণ'-কেই সন্ধান করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস জীনস বলেছেন, 'আমাদের এই মহাবিশ্ব একটি বিশালাকার মেশিনের চেয়ে- একটি বিরাট চিন্তার মতো মনে হয়। আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্য হিসেবে না বলে, অনুধ্যান হিসেবে বলতে চাই যে, মহাবিশ্ব আমাদের সকল মনের অতলে অবস্থিত এবং সকল মনের সমন্বয় সাধনকারী কোনো এক মহান বিশ্বজনীন 'মনের' সৃষ্টি বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেনো সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।'

অর্থাৎ মহাবিশ্বের এই বিশালতা যতো বৃহত্তর হোক, এটা কোনো বিশাল চিন্তাশীলের কর্মকান্ড। তা-ই তিনি উপলব্ধি করতে চান। এইজন্য, পৃথিবীর জলে-স্থলে যে বিশাল প্রাণীজগৎ রয়েছে, তাদের বিচিত্র সৌন্দর্যের দিকে তাকালে চোখ জুড়ায়। চিন্তাশীল মনের মাঝে হাজারো প্রশ্ন জাগে- কে এই সত্ত্বা? যিনি এই সৃষ্টিকে এক অমোঘ সৌন্দর্যে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার সাথে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মনের সরাসরি যোগাযোগ বিদ্যমান। নিশ্চয় মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নন!

বৈজ্ঞানিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট লিখেছেন, 'দুটি বিষয় আমি যতোই দীর্ঘকাল ধরে এবং অধিক মনোযোগের সাথে চিন্তা করি, ততই আমাকে ক্রমবর্ধমান প্রশংসামুখর আর বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে এবং তা হচ্ছে বাইরের নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ এবং অন্তরের নৈতিক আইন।' (দর্শনের কথা)

ইম্যানুয়েলের বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, মহান সৃষ্টিকর্তার এই আশ্চর্যময় সৃষ্টি নিতান্তই বিস্মিত হবার বিষয়। বিশাল পৃথিবীর এই জীবন্ত প্রাণীকুল, আর আকাশের সারি সারি গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের সৌন্দর্যময় আনাগোনা আমাকে স্রষ্টার প্রতি প্রশংসামুখর করে। আমি বার বার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসায় নত হতে চাই। আমার মন যেনো বলতে চায়, হে মহাপ্রভূ! তোমার সৃষ্টির কাছে আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ। তুমি সত্যি আমাদেরকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মানুষের উপর কি কালের এমন একটি অংশ অতিবাহিত হয় নাই, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলো না? নিশ্চয় আমি মানুষকে সম্মিলিত শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার মানসে। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী করেছি।" (সূরা দাহ্‌র, আয়াত-১-৩)

মানুষের উপর মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কি দয়া ও রহমত। এই তো! যে ব্যক্তিটি সেদিন উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিলো না। না ছিলো ব্যক্তির কোনো নাম-ধাম জ্ঞান-বিদ্যা। আর না ছিলো কোনো পরিচয়। পৃথিবীর কেউ তাকে জানতো না, কেউ তাকে চিনতো না। এমনকি তার মা-জননীও বুঝতে পারেন নি প্রথম দিকে। এক ফোটা শুক্রবিন্দু ধীরে ধীরে জমাট বাধা রক্ত থেকে রূপান্তরিত হলো হাড়গোড়, শরীর, মাংস, হাত-পা, চোখ-মুখ-মস্তিষ্ক। তারপর দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি এবং খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার জিহ্বা নিয়ে এলো পৃথিবীতে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে দান করলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা বুঝার ও শোনার শক্তি-সামর্থ্য।

আজ এই ব্যক্তিই পৃথিবীর একজন বিজ্ঞ মানুষ। লোকেরা তাকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সংস্কারক ইত্যাদি কতো উপাধীতে ভূষিত করে। অথচ উল্লেখ করার মতো সেদিন সে কোনো বস্তুই ছিলো না। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া এমন স্রষ্টা আর কে হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে সূফীগণ বলেন, যে ব্যক্তি নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে। নিজের কর্মতৎপরতা, জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা নিয়ে ভাবে। তখন নিজের কাছে পরিচিত হয়। নিজকে চেনার অর্থই আল্লাহ্র সাথে পরিচিতি লাভের পথ।

নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ডক্টর অ্যালেকজিস্ ক্যারেল বলেছেন, ‘এর মারাত্মক রকম বিশালত্ব সত্ত্বেও জড়পদার্থের জগত মানুষের জন্য খুবই সংকীর্ণ। তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের অবস্থান, এটি তাকে মানায় না। গাণিতিক বিমূর্তন দ্বারা তার মন ইলেক্ট্রন এবং নক্ষত্রের উপলব্ধি করে। বন্ধুর পর্বতমালা মহাসাগর আর নদীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবেই তাকে সৃষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অন্য জগতের অধিবাসী, সে জগত যদিও তার নিজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, তথাপি মহাশূন্য মহাকালের ওপারে ছড়িয়ে রয়েছে।’

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহ্র নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?” (সূরা কাসাস আয়াত- ৬০)

নোবেল বিজয়ী ক্যারল যদিও মুসলমান নন, তবু তার বক্তব্যটি মহান আল্লাহ্র কুরআনের সদৃশ। অথচ আজকের অধিকাংশ মুসলমান সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে রাজী নয়। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অনুধাবন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝতে চেষ্টা করে না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি মানুষের মস্তকে অত্যন্ত সুনিপুন বিন্যস্ততায় মগজ তৈরী করে রেখেছেন। মগজকে বানিয়েছেন ‘জ্ঞান-বিদ্যা’ জমা রাখার থলে হিসেবে। যাতে মানুষ ‘দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যার্জন করো’ এই হাদীসের আহরিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা ধরে রাখতে পারে।

মানুষের মগজ বা ‘ব্রেন’ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ডাক্তারগণকে ভাবাবেগে আপ্লুত হতে দেখা যায়। কারণ, আজকের যুগের বৈজ্ঞানিকদের সবচে বড় আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার। আজকের কম্পিউটারে লক্ষ কোটি মানুষের জীবনী লিপিবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি কম্পিউটারের রয়েছে- নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ ধারণ ক্ষমতা। যতো শক্তিশালী কম্পিউটারই হোক,

এক সময় সে ধারণ ক্ষমতা হারাতে বাধ্য।

কিন্তু মানুষের মগজ! কি অদ্ভুত আল্লাহ্‌র কারিগরী। ত্রিশ পারা কুরআন এবং হাজার হাজার হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীসহ হাদিসের বাণীগুলো একটি মগজে ধারণ করা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের মগজের ধারণ ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। জ্ঞান-বুদ্ধি ভরে রাখলেও মগজটি বেলুনের মতো ফোলে না। এমনকি ধারণকৃত বস্তুকে চিরতরে মুছে ফেলাও যায় না। বছরের পর বছর ধরে মানুষ জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি নিজ মগজে ধারণ করে রাখে। একইভাবে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। এসব বিষয় নিয়ে মানুষ চিন্তা করে না। অহংকারী মানুষেরা একবারও ভাবতে রাজী নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা "এক ফোটা তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে মানুষের বংশ বিস্তার করে থাকেন।" (সূরা সিজদা, আয়াত- ৮) আর এতো সুন্দর বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ মগজ দিয়ে মানুষকে করেছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই মগজ নামক সাধারণ একটি প্রাণবন্ত বস্তুর কারণেই তো মানুষ এতো মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সামনে তিন জিনিস রাখা হলো। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ করা হলো, এই তিনটি জিনিসের যেকোনো একটি তোমাকে দান করা হবে। সুতরাং নির্ণয় করো কোন্‌টি তুমি চাও। তিনটি জিনিস হচ্ছে- এক) দৌলত বা সম্পদ। দুই) বিদ্যা বা জ্ঞান-প্রজ্ঞা। তিন) হেকমত বা বুদ্ধি।

আদম আলাইহিস সালাম তখন কঠিন চিন্তায় পড়ে গেলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি হেকমত বা বুদ্ধিকেই গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, মানুষের কাছে যদি হেকমত বা বুদ্ধি থাকে, তাহলে সে জ্ঞান ও সম্পদকে সংগ্রহ করতে সক্ষম। কিন্তু বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে সে কোনোটাই আয়ত্ত করতে পারবে না। (সীরাত বিশ্বকোষ)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তা ডক্টর ক্যারেল-এর উক্তিতেও লক্ষ্যণীয়। তিনি মানুষকে এই পৃথিবী নামক গ্রহের চিরস্থায়ী বাসিন্দা বলতে রাজী নন। এতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দাগণ অন্য কোনো স্থান থেকে এসেছি এবং আরেকটি গন্তব্যে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সে গন্তব্যটা কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে যদি আমরা একটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে বিষয়টি অনুধাবণ করা সহজ হবে। ধরে নেয়া যাক, একজন গর্ভবতী মায়ের উদরে একটি শিশু'র বয়স সাত-আট মাস হয়েছে। শিশুটি দুনিয়াতে আসে নি। তবে কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীতে তার আগমন ঘটবে। শিশুটি মোটেও জানে না যে, সে কোথায় যাচ্ছে এবং সেখানে গেলে তার কি অবস্থা হবে। ছোট্ট একটি প্রকোষ্ঠে সে বন্দি জীবন-যাপন করছে। তার চোখ-মুখ বন্ধ। হাত-পা নাড়াতে পারছে না সঠিকভাবে। তবে সে জীবিত। তার খাবারের সমস্যা নেই। হার্ট বিটিং অর্থাৎ হৃদযন্ত্র চলছে আপন গতিতে। মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করতে পারে। শিশুটির মা তখন টের পান, পেটে ব্যথা অনুভূত হয়। নিরবে সহ্য করেন। কারণ, মা যেমন নিরুপায়, তেমনি শিশুটিও বন্দিশালায় আবদ্ধ।

এই পরিস্থিতে কেউ যদি শিশুটিকে বলে, হে মানব সন্তান! তুমি তো বিশাল একটি দুনিয়াতে যাচ্ছো। যে দুনিয়ার বিশালতা তোমার চিন্তার বাইরে। সেখানে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে।

কোটি কোটি জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা রয়েছে। রয়েছে সুন্দর সুন্দর বাগান আর ফলমুলের সারি সারি বৃক্ষ-লতা-পাতা। সেখানে রয়েছে বিরাট বিরাট দালান আর অট্টালিকা, নানা রং ও ডিজাইনের ঘর-বাড়ি। বিছানা-পত্র, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি কতো কিছু রয়েছে সেখানে। তুমি যে পৃথিবীতে যাবে তার আলো-বাতাস অত্যন্ত আরামদায়ক। সেখানে ঘুরে বেড়াবে স্বাধীনভাবে। তোমার চলাফেরায় কেউ বাধা সৃষ্টি করবে না। এখানে তুমি সঠিকভাবে ঘুমুতে পারছো না। তুমি যখন ঘুমুতে চাও, তোমার মা তখন হয়তো পায়চারীরত অথবা নামায আদায় করেন। ফলে তুমি ঘুমুতে পারো না। কিন্তু বিশাল ঐ পৃথিবীতে গেলে তোমার কোনো কষ্ট নেই। তুলতুলে নরম বিছানা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আগমনবার্তা শুনে তোমার মা-বাবা আত্মীয় স্বজন প্রহর গুণছেন। কখন তুমি আসবে, এটাই সকলের প্রতীক্ষা। পৃথিবীর বিশালতা ও আরামের এতো বিবরণ শুনে শিশুটি কিন্তু অনুমান করতে পারবে না। তার জ্ঞানে ধরবে না, আসলে পৃথিবী জিনিসটা কি? যেহেতু সে পৃথিবীর চেহারা দেখে নি। একইভাবে, তার মনে প্রশ্ন জাগবে, এতো বিশাল পৃথিবীকে সামনে রেখে আমি এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কেনো বন্দি? নিশ্চয় আমাকে কেউ বন্দি করে রেখেছেন? কিন্তু আমাকে তো বলা হচ্ছে- আমি বিরাট পৃথিবী নামক স্বাধীন একটি স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। অচিরেই আমি সেখানে উপস্থিত হবো।

যেহেতু শিশুটি জন্ম নিচ্ছে। এটাই সত্য। আর একেই বলে, হক্ব। অর্থাৎ আল-হাক্ব-এঁর কারিগরী।

আরবী ভাষায় হক্ব শব্দের অর্থ স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, (ছুবূত) ইত্যাদি। একইভাবে, আল-হাক্ব শব্দের অর্থ যাহা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট, চিরস্থায়ী ও প্রকৃত। পবিত্র কুরআনের তাফসীরসমূহে সাধারণত এর অর্থ 'আছ-ছাবিত' (স্থায়ী) বলা হয়েছে। যেমন, আল-বায়দ্বাবী গ্রন্থে 'আল-হাক্ব'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ (আছ-ছাবিতু রুবূবিয়্যাতুহু) যাঁর প্রভুত্ব স্থায়ী, খাঁটি। অনুরূপভাবে, যাঁর উলূহিয়্যাত স্থায়ী (আছ-ছা'বিতু ইলাহিয়্যাতুহু)। যিনি সেই সকল ইলাহের বিপরীত- যারা বাতিল, বৃথা ও অপ্রকৃত। অর্থাৎ 'আল-হাক্ব' মহান আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। যা বাতিল বা মিথ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অতএব উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সত্য ও চিরস্থায়ী এবং পরকাল আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং মিথ্যার সাথে সম্পর্ক মানেই সত্যের গতিপথে বাধা সৃষ্টি। আর একারণেই মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ে লিপ্ত হয়।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

এক) "আল্লাহ তাআলা মুমিনগণের প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার

নিকট বাইআত গ্রহণ করছিলেন এবং আল্লাহ তাদের অন্তরের সব কিছুই অবগত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে শান্তি সৃষ্টি করেছিলেন। (সূরা ফাত্হ, আয়াত-১৮)

দুই) "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সে সকল অগ্রগামীগণ এবং যারা সততার সাথে তাদেরকে অনুসরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।" (সূরা বারাআত, আয়াত-১০০)

তিন) "হে নবী! আপনার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছেন আল্লাহ এবং সেই সকল মুমিন যারা আপনার অনুসরণ করছে।" (সূরা আনফাল, আয়াত-৬৪)

চার) "(উক্ত সম্পদের) প্রাপ্য হচ্ছে দরিদ্র ও মুহাজিরগণ যারা নিজের আবাসভূমি ও বিষয়-সম্মত্তি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের কামনা করে থাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাজে সাহায্য করে থাকে- তারাই হচ্ছে সত্যবাদী।" (সূরা হাশর, আয়াত-৮)

পাঁচ) "যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং যারা জিহাদ করেছে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে, তাদের মর্যাদা (অন্যের তুলনায়) বহুগুণ অধিক। আর এই সকল লোকই হচ্ছে সফলকাম।" (সূরা বারাআত, আয়াত- ২০)

ছয়) "কিন্তু এই রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে সে সমস্ত মুমিন আছে- তারা এ পর্যন্ত জিহাদ করে এসেছে নিজেদের ধন-প্রাণ কুরবান করে; তাঁদের জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং এরাই হলো সফলকাম।" সূরা বারাআত, আয়াত-৮৮)

সাত) "মক্কা বিজয়ে পূর্বে যারা দান (ধন-সম্পদ) ও জিহাদ করেছে, তাদের সমান হতে পারে না, যারা পরে দান ও জিহাদ করেছে; প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা অনেক বেশি। আর প্রত্যেক দলকেই আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ওয়াদা দান করেছেন। (সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

আট) "কিন্তু যাদের কল্যাণ সম্মন্ধে আমার ব্যবস্থা পূর্ব হতেই অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে দূরে।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০১)

সূরা আম্বিয়া ও সূরা হাদীদের আয়াতদ্বয় সম্পর্কে ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইবনে হাজ্‌ম বলেন, সফলগণই নিঃসন্দেহে জান্নাতী। কেননা, সূরা হাদীদের আয়াতে সাহাবীদেরকে কল্যাণের প্রতিজ্ঞা দান করা হয়েছে। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে বলা হয়েছে, "কিন্তু যাদের কল্যাণ সম্মন্ধে আমার ব্যবস্থা পূর্ব হতেই অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে দূরে।" অর্থাৎ জান্নাত দানের ওয়াদা।

সাহাবীগণ সম্পর্কে হাদীস

১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার সাহাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে আল্লাহকে ভয় করো, তাদেরকে নিন্দা-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে সে আমাকে

ভালোবাসার দরুনই তাদেরকে ভালোবাসলো। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বিরোধীতা করলো- সে আমার সাথেই বিরোধীতা করলো। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলো, সে আমাকেই কষ্ট দিলো। সুতরাং আল্লাহ শীঘ্রই তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন।" (তিরমিযী)

২) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর কসম (হে আমার উম্মতেরা)! যদি তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে তা হলে আমার সাহাবীদের এক মুদ্ বা অর্ধ মুদ্ (প্রায় এক কেজির সমান) দানের মর্যাদাও লাভ করতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, অর্থাৎ আমার সহচরদের যুগ। অতঃপর যারা এদের পরে আসবে। (তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগ)" (সূত্র- ইছাবা, পৃষ্ঠা-২১)

৪) হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তররূপে পেলেন। তাই তাঁকে পয়গম্বররূপে মনোনীত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর অপর বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্ঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি সাহাবীদের অন্তরকে উৎকৃষ্ঠ অন্তররূপে পেলেন, ফলে তিনি তাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হিসেবে মনোনীত করলেন। কারণ- সাহাবীগণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করবেন।" (সূত্র- ইস্তিয়াব পৃষ্ঠা-৬)

৫) হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমার সাহাবীদেরকে সমস্ত নবী-রাসূল ব্যতীত সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূত্র ইছাবা পৃষ্ঠা- ২২)

হাদীস বর্ণনায় সাহাবীগণের সত্যবাদিতা

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বীকৃতি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাহাবায়ে কেরামের সত্যবাদিতা। পরবর্তী যুগে হাদীস সংকলনকারী ইমামগণ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কোনো একজন সাহাবীকেও একটা বিন্দু-বিসর্গ মিথ্যাশ্রয়ী প্রমাণ করতে পারে নি। হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং অন্য সাহাবীর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছে, তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় শুধু মক্কা শরীফে তখন জীবিত সাহাবী ছিলেন ত্রিশ হাজার এবং মদীনা শরীফে ছিলেন- ত্রিশ হাজার। এঁরা সকলেই কোনোভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের অধিকাংশরাই হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ- ব্যক্তিগত মনভুলামীর দরুন যদি একটি বিন্দু-বিসর্গও ভুল হয়ে যায়, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ হবে ভেবে তাঁরা দারুণভাবে সতর্ক থাকতেন।'

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের জীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে,

১) আছমাউর রিজাল গ্রন্থে প্রায় ৯ হাজারের মতো।

২) ইবনে আব্দিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থে ৭ হাজার।

৩) ইবনে আছীর জজরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'উছদুলগাবা' গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৪) ইমাম জাহ্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাজরীদ' গ্রন্থে ১২৮১ জন সাহাবীর জীবনী গ্রন্থস্থ করেছেন।

এ ছাড়া অনেক কিতাবাদিতে অন্তত ষাট হাজার সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইমাম আবূ জুরআ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সাহাবীগণের সমালোচনা বা তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে দেখবে তখন নিশ্চিত মনে করবে, সে ব্যক্তি জিন্দীক। আসলে তার ঈমান নাই। কারণ, নিঃসন্দেহে কুরআন শরীফ সত্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং কুরআন-হাদীস আমাদেরকে যা দিয়েছে তা সত্য। অথচ এ সব বিষয় আমরা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত সত্যবাদী সে সকল সাহাবীগণের মাধ্যমেই পেয়েছি। সুতরাং সাহাবীগণের সাক্ষ্যকে যে ঘায়েল বা সন্দেহযুক্ত করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কুরআন-হাদীসকেই অস্বীকার করতে চায়। অতএব, সকল বিবেচনায় এ সকল ব্যক্তি জিন্দীক, তারা নিজেরাই সন্দেহযুক্ত। (হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৪)

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির অপচেষ্টা

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, 'ইহুদী নাসারাগণ ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদেরকে আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করে শোনায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা অবগত হয়ে বললেন, "তোমরা ইহুদী নাসারাদের কথা বিশ্বাস করবে না এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বলবে না। বরং তোমরা বলবে- 'আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখি। (ঈমান রাখি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইসহাক, মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর এবং সকল নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না, আমরা তাদের সমর্থক। (বুখারী)

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাওরাত কিতাবের একখানা হস্তলিখিত পান্ডুলিপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি তাওরাত কিতাবের পান্ডুলিপি। একথা বলেই তিনি তা পাঠ করতে লাগলেন। এতে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে উঠলো। তখন হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার পরাজয় হোক! তুমি কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোহারা

মুবারকের অবস্থা দেখছো না? উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক প্রত্যক্ষ করে বললেন, আমি আল্লাহর গজব ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ থেকে রক্ষা চাইছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমার রব, ইসলাম আমার জীবনাদর্শ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে অত্যন্ত খুশী। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার কুদরতী হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে হযরত মুসা আজ জীবিত থাকলে আমার নবুয়াতীর প্রতি তাঁর ঈমান আনা ওয়াজিব হতো।" (মিশকাত)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আগের ধর্ম ও কিতাব অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে বাতিল। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু জাতশক্রু ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠি এতে অত্যন্ত নাখোশ। তাদের ধর্ম যে বাতিল বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে, সেই প্রতিহিংসা তারা অন্তর থেকে দমন করতে পারে নি। বরং ইসলামের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও অহংকারী হয়ে উঠে। আর ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু শহীদ হবার পর ইহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ও নাজ্জাম (ইবরাহীম) ইবনে ছাইয়ার নামক লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাও তার অনুসারীদেরকে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মৃত্যুদন্ড দিয়ে লাশগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেন। এদিকে হযরত ইবনে কুতাইবাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নাজ্জামের মিথ্যা রটনার সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে তাকে প্রতিহত করেন। ২২৯ হিজরীতের নাজ্জামের মৃত্যু হয়। কিন্তু যুগে যুগে নাজ্জামের শিষ্যরা সাহাবায়ে কেরাম ও হাদীসের প্রতি কুৎসা রটিয়ে আসছে। আর একদল হক্কানী আলিম বরাবরই সত্যের উদ্‌ঘাটন করছেন।

হাফিজ ইবনুছ-ছালাহ্ বলেন, সকল সাহাবীই যে আদিল বা বিশ্বস্ত এ সম্মন্ধে সমগ্র উম্মত একমত। এমন কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী যুগে যাঁরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছিলেন- তাঁরাও বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী। ইসলামের জন্য তাদের জীবনোৎসর্গ, নানাবিধ ত্যাগ ও বিভিন্ন গুণাবলীর কারণে আল্লাহ তাআলাও তাদের উপর সন্তুষ্ট। যুগে যুগে হক্কানী উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য বিদ্যমান, সুতরাং পূর্ব ও পরবর্তী যুগের সকল মুসলমানই এ ব্যাপারে একমত। আর আমাদের আক্বিদাও এটাই।

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আহলে সুন্নাত জামাতের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, সাহাবীগণ সকলেই আদিল বা বিশ্বস্ত। প্রত্যেক যুগেই তা নতুনভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। (সূত্র- হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)

উত্তরাধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির কারণ

বর্তমান যুগের অরাজকতা ও বিশৃংখলাপূর্ণ পরিবেশ মানবসভ্যতার জন্যে বড়ই কষ্টদায়ক। প্রত্যেকটি মানুষ কোনো না কোনো ভাবে আরেকজনের অন্যায় আচরণের শিকার। যদিও পৃথিবীতে ন্যায়পরতাদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গণতন্ত্র (বা 'মানবিক অধিকার' অর্থে) প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিশাল মানবসমাজের অভ্যন্তরে তা অনুপস্থিত। তাবৎ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা যেভাবে এর প্রয়োগ ও প্রকারভেদের সাথে পূর্ণ পরিচিত নয়, তেমনি গণতন্ত্রভোগী সাধারণ মানুষ আজ মারাত্মক রকমের কৌশলগত শাসন আর শোষণের শিকার। অথচ গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে- 'প্রত্যেকটি মানুষ তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আজন্ম দাবীদার।' সে নিরাপত্তা সরকারী, প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগতই হোক। এমনকি পিতা তার সন্তানের কাছেও নিরাপত্তার দাবী রাখে। এই মূলমন্ত্রের উপর ভিত্তিকরে পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ ন্যায়ের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পেলো না, আদায় করতে পারলো না।

দেখা গেছে, জনগণের 'রায়'-এর ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ 'রায়' দানের আগের রাত্রে রায়দাতারা ভিন্নস্বার্থের বিনিময়ে 'রায়' বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে যায়। যেহেতু পূর্ব থেকেই 'রায়' দাতাগণ বিভিন্ন আক্রমণের শিকার বা সমস্যাজর্জরিত। ফলে ন্যায়পরতা আর প্রতিফলিত হয় না।

এই তো গত শতাব্দিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যতো আমুল পরিবর্তন এসেছে, সবগুলোই অসার ও অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। ফলে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নব্য পুঁজিপতিরা পৃথিবীর একচ্ছত্র পরাশক্তির দাবীদার। একদিকে, অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কৌশলগতভাবে অন্যায় যুদ্ধ চাপানো হয়েছে দুর্বল দেশগুলোর উপর। অন্যদিকে, মিডিয়ার মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে সমর্থন দিয়ে সমাজে সৃষ্টি করেছে স্বার্থপরতার শাসন। যে শাসনের ফলে মানুষ স্বার্থান্ধের গহ্বরে দিনাতিপাত করছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তি স্বার্থকে জীবনের পরম পাওয়া মনে করছে। যে স্বার্থান্ধতার আরেক নাম- গৃহযুদ্ধ বা ক্ষমতার সংগ্রাম।

একদিকে, তারা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে দুর্বল দেশগুলোর ব্যক্তি নিরাপত্তা, ন্যায়পরতা, সুশিক্ষার পরিবেশকে তছনছ করে মার্কিন মুখাপেক্ষী পরাধীনতায় ছেড়ে দিয়েছে। ফলে দেশ ও জাতি মার্কিন সম্মতির বাইরে পা রাখতে পারে না। আর যদি কেউ এমনটি করতে যায়, তাহলে তার উপর সৃষ্টি করা হয় জাতিসংঘ অবরোধ। ফলে, একজন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই পরিস্থিতিকে কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে না।

যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও ইসলামের মূলমন্ত্র হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। একমাত্র স্রষ্টার কাছেই সে ন্যায়পরতা, অধিকার ও নিরাপত্তা আহ্বান করে। কোনো ব্যক্তিই কারো নিরাপত্তা, অধিকার ও ন্যায়পরতা ক্ষুন্ন করতে পারবে না। এটা আল্লাহ্র বিধান। আর বিশ্বমানবতাকে নিরাপত্তা, অধিকার ও ন্যায়পরতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূলগণ। এ সাথে প্রত্যেকটি মানুষকে পৃথকভাবে দান করেছেন

বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা। তারপর বলে দিয়েছেন, সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরকাল হচ্ছে ইহকালের কর্মসম্পাদনের ফল প্রাপ্তির স্থান। নিঃসন্দেহে পরকাল ইহকালের চেয়ে উত্তম।

তাই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা ব্যবহারের পদ্ধতি। সমাজে বসবাস করে, জীবনকর্ম দিয়ে প্রমাণ করেছেন ব্যক্তিচরিত্র গঠনের নিয়ম-কানুন। কোনো নবী রাসূল জীবনে একটি মিথ্যা বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। কোনো নবী রাসূল নিজের জীবনের ভিতর বাহিরের একটি কথাও গোপন রাখেন নি। সবকথা মানুষকে খুলে বলেছেন। তারপর বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরকালের চিরন্তন শান্তি পেতে হলে নবীর চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। নবীর চরিত্রই প্রকৃত চরিত্রের উদাহরণ।

কিন্তু তারপরও আজ হাজার হাজার সমস্যা-জর্জরিত এই মানবসমাজ। এসকল সমস্যার শুধু ‘নাম’ দিয়ে যদি তালিকা নিরূপণ করা যায়, তাহলে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। আজকের মানবসভ্যতায় বিশেষ বিশেষ যেসকল সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে, সেগুলোর কয়েকটি হচ্ছে,- ১) চারিত্রিক অবক্ষয়। ২) স্বার্থপরতা। ৩) প্রতিহিংসা। ৪) অহংকার। ৫) পরনিন্দা। ৬) পরশ্রীকাতরতা। ৭) মিথ্যাশ্রয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর যদি একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সবগুলো সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, মিথ্যাশ্রয় অর্থাৎ শয়তানের গোলামী। মানুষ যখন সত্যকে পরিহার করে তখনই মিথ্যাশ্রয়ের গহ্বরে পতিত হয়। মানবসভ্যতার জন্য মিথ্যা এমন এক অভিশাপ যা মানুষকে পশুতুল্য করে ছাড়ে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদের বঙ্গানুবাদ হচ্ছেঃ-

অর্থ ক্ষয় কিছুই নয়,
স্বাস্থ্য ক্ষয় কিছুটা ক্ষয়!
চরিত্র ক্ষয় মহাপ্রলয়!!

আজকের সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ব্যক্তির ধন-সম্পদের ক্ষতিকে স্বাস্থ্য ও চরিত্রের ক্ষতির চেয়েও বেশি গুরুত্বদান। কারণ- পূঁজিতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা মানুষকে এভাবেই গঠন করে। ধন-দৌলত অর্জনই আজকের পূঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার মোক্ষম। পশ্চিমা সভ্যতার ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনে সক্ষম হয়, তখনই সে স্বার্থক বা সভ্যজগতে সফল ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ সে-ই প্রকৃত চরিত্রবান।

অন্যদিকে বর্তমান সমাজে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে অক্ষম, সে ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থ। পূঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার অর্থে সে চরিত্রহীন। যে কারণে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে দেখা দেয়- চারিত্রিক অবক্ষয়, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা, অহংকার, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা। আর এইসব মানবতা বিধ্বংসী অভ্যাসগুলো সমস্ত দেশ, জাতি ও মানবসভ্যতাকে যুদ্ধ-বিগ্রহের এক অসার পশুত্ব পথে ছেড়ে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ আমেরিকার টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডী ঘটানোর পর বৃটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন,

"আমরা সভ্যজাতি। আমরা এখানে সভ্যতার চর্চা করি।" এই কথাগুলো বলে মিস্টার ব্লেয়ার আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের সমর্থন দেন। তখন বৃটেনসহ বিশ্বের কিছু সংখ্যক বিবেকবান মানুষ প্রশ্ন উত্তাপন করেছিলেন যে, এটা সভ্যতা নয়, বরং সভ্যতার নামে আদিম বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটা আধুনিক চরিত্রবানের পরিচয় নয়, বরং আদর্শহীন সভ্যতাবিবর্জিত ব্যভিচারের নামান্তর। কারণ, ঘটনা ঘটেছে আমেরিকায়। আর আমেরিকা এমন একটি দেশ, যার পরাশক্তির অহংকারে পৃথিবীর কোনো একটি দেশও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহস করতে পারে না। সুতরাং সে দেশের মাটিতে এরকম একটি ঘটনা ঘটে যাবে, আর তারা জানবে না! এটা কেমন কথা? সাধারণ একটি কুড়ে ঘরের মালিকও রাতে ঘুমোবার আগে দরোজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমোয়। সতর্কতা অবলম্বন করে। হয়তো চোর ঢুকতে পারে?

অন্যদিকে, একজন মানুষ যদি সে বৃহৎ সন্ত্রাসীও হয়, তার জন্যে একটি দেশে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করার কি অর্থ হতে পারে? তাছাড়া, আফগানিস্তানের তখনকার তালিবান সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছে, 'আপনারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হাজির করুন, আমরা উসামা বিন লাদিনকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো।' কিন্তু তার পরও যুদ্ধ করা হলো। এই যুদ্ধের অর্থ কি সভ্যতা! না বর্বরতা? এই পূঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার অর্থ কি চরিত্রহীনতা নয়?

চরিত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত; স্বভাব; আচরণ; চালচলন; রীতিনীতি; ব্যবহারবিধি; কায়দা-কানুন; সদগুণ; উন্নত; আদর্শ; সুনীতি; সদাচার ইত্যাদি। এগুলোর উল্টো যা কিছু আছে সবই চরিত্রহীনতা। অতএব চারিত্রিক অবক্ষয়ের অর্থ হচ্ছে- ব্যভিচার ও আদর্শহীনতা।

আজকের এই উত্তরাধুনিক যুগে কোনো বিবেকবান লোক যদি ব্যভিচার ও আদর্শহীনতা শব্দদ্বয় নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখা যাবে- সমস্ত বিশ্বে মার্কিন পূঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার কারণেই এগুলোর প্রসার লাভ করছে। মানুষগুলোকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেমন- 'তুমি এসেছো একা এবং যেতে হবে একা। তোমার জীবন, তোমার মরণ তোমাকেই গ্রহণ-বরণ করতে হবে। সুতরাং একটু আরামে জীবন-যাপনের জন্যে অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধিই প্রকৃত জীবনবোধ। কারণ মানুষ যতো আপনই হোক, অর্থনৈতিক সহযোগিতায় কেউ কারো নয়! এমনকি দার্শনিকদের শেখানো মানবতা, সভ্যতা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সবকিছুই অর্থনীতির কাছে পরাজিত। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন-সম্পদ অর্জিত হলে, ঐসব বিষয়গুলো আপনা-আপনি চলে আসে।' যুক্তিসঙ্গত এইসব কথায় মানুষের মন-মগজে সৃষ্টি হয় স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা, অহংকার, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা। কিন্তু আজকের বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষেরা কখনো এটা ভুলেন যে, 'অর্জিত সম্পদের একটি কানা-কড়িও সাথে যাবে না।'

এটা ঠিক যে, মানুষ একা আসে এবং একাই যায়, সাথে কেউ যেতে চায় না! এটাও সঠিক যে, অর্থনৈতিক সহযোগিতায় কেউ কারো নয়।

অতএব যদি প্রশ্ন করা হয়- ঐশ্বর্য হাসিলের চিন্তায় আজকের মানুষ যতোটা ব্যস্তসম্মত জীবন-যাপন করে, তা কার জন্যে? একজন মানুষের জন্যে কতোটা সম্পদের প্রয়োজন? পৃথিবীতে যতো রকমের আরাম-আয়েশ আছে, একার জন্যে সবগুলো ভোগ করা কি সম্ভব?

আজকের পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যজগতের মানুষ যতোটা সম্পদ অর্জন করে, মৃত্যুর পর সেগুলো কার জন্যে ছেড়ে যায়?

এইসব প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন রাখে। এটা সংগত নয়, তোমরা শীগগিরই তা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীগগির তা জানতে পারবে। তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্র অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা তাকাছুর আয়াত ১-৮)

হাদীস শরীফে এসেছে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন।" (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি সূরা তাকাছুর তিলাওয়াত করে বলছেন, "মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলো অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে- তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

মিথ্যার জন্ম

সঠিক তথ্য দ্বারা 'মিথ্যা'-এর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করা কঠিন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ঘটনা ও কিতাবাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে, শয়তান কর্তৃক হযরত আদম আঃ-কে সিজ্দা করার অস্বীকৃতি থেকেই 'মিথ্যা'-র জন্ম।

আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন- পরম সত্য, স্থির, অক্ষয়, চিরস্থায়ী। বাদবাকি যাকিছু আছে, সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সৃষ্টির স্থায়িত্ব কেবলমাত্র স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। স্রষ্টা যাকে ইচ্ছা রাখতে পারেন, যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করতে পারেন। সৃষ্টি অর্থই স্রষ্টার আজ্ঞাবহ। সুতরাং সৃষ্টির মধ্য থেকে কেউ যদি স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করে, কিংবা স্রষ্টার নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে 'বাতিল' বা 'মিথ্যা' বলে গণ্য হয় এবং অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

শয়তান সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে, আর আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে- আদম আলাইহিস সালাম-কে সিজদা করার জন্য। কিন্তু শয়তান তখন অহংকারী হয়ে যায় এবং মাটির তৈরী মানুষকে সিজ্দা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাকে 'সত্য' থেকে 'দূর' করে দেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, 'শয়তান' শব্দটি 'শাতানুন' শব্দ থেকে উৎপত্তি। 'শাতানুন' শব্দের অর্থ 'দূর হওয়া' এবং একপ্রকার রশি যা দীর্ঘ ও কম্পমান। অর্থাৎ 'শয়তান' ভালো ও ন্যায়পরতা থেকে দূরে থাকে এবং মন্দ ও অন্যায় কাজে সারাক্ষণ লিপ্ত থাকে। (ইসলামী বিশ্বাকোষ ও গুনিয়াতুত তালিবীন)

ইবলিস ও শয়তান

শয়তানের আসল নাম ইবলিস। আরবী ভাষাবিদগণের মতে ইবলিস শব্দটি 'বা'-'লাম'-'সিন' ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। এর অর্থ, নিরাশ। 'কারণ ইবলিস্ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়েছে।' একইভাবে, তাকে 'আদুও'উল্লাহ্, অথবা 'আদুওউ' অর্থাৎ আল্লহ্‌র দুশমন বলা হয়। ইবলিসের আরেকটি নাম হচ্ছে, 'আযাযীল'।

আদিকালে পৃথিবীতে জিন জাতির বসবাস ছিলো। জিন জাতি আত্মকলহ ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদের একটি বাহিনী দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর সর্দার ছিলো 'আযাযীল' অথবা 'আল-হারিছ'। বিভিন্ন কিতাবে 'আযাযীল' -এর আরেক নাম 'আল-হারিছ' বলেও উল্লেখ রয়েছে। বিবাদমান জিনদের বিরুদ্ধে ফিরিশতাদের আগমণ ঘটলে, তারা পাহাড় জঙ্গলে পলায়ণ করে। অবশ্য- তাফসীর গ্রন্থ তাবারী ৮৪ পৃষ্ঠার বর্ণনামতে ফিরিশতাগণ 'ইবলিস'-কে বন্দি করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির করেন। আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জিনদের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। এই সূত্রে তার নাম ছিলো আল-হাকাম। সে বিচারকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অহংকারী হয়ে উঠে এবং জিনদের মধ্যে নতুন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। কিন্তু ইবলিস কোনক্রমে পলায়ণ করে বেহেশতে আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আল্লাহ্ যেহেতু 'রহমান' ও 'রাহীম' তাই তাকে ক্ষমা করে দেন। সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত দিন থেকে আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগত দাসরূপে বেহেশতে বসবাস করার সুযোগ পায়। (তাবারী ৮৫ পৃষ্ঠা, মাসউদী ১ম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

পরবর্তীতে হযরত আদম ও হাওয়া আঃ-এঁর সাথে শয়তানের অহংকারী তৎপরতা তাকে জান্নাত থেকে বহিঃষ্কৃত হতে হয়। কিন্তু শয়তানের অতীত যুগের সুকর্মের ফল হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে সে কিছু বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের দাবী জানায়। আল্লাহ্ তাকে শক্তি দান করেন। অর্থাৎ সে মানুষের শিরা-উপশিরা ও রক্তে-মাংশে বিচরণ করতে পারে। তাই সে আল্লাহ্‌র সাথে শপথ করে, "মহা সম্মানিত আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদেরকে (আদম সন্তানদেরকে) বিপথে নিয়ে যাবো।" আল্লাহ্ তাআলাও শয়তানের এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নেন, 'যাঁরা আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা তারা নিরাপদে থাকবে।' (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬৫)

একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, শয়তান মানুষের রক্তে-মাংসে বিচরণ ক্ষমতা রাখে। আর পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ".... তোমরা বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অতএব তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো।" (তাফসীর ইবনে কাসীর ও গুনিয়াতুত তালিবীন)

সুতরাং বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করলে দেখা যাবে, হক্ব বা সত্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষাবলম্বনকারী। অর্থাৎ 'আল-হাক্ব' এর একটি অর্থ চিরসত্য বা স্থির। অন্যদিকে, মুমিন ইনসানের চির শত্রু বা বিপরীত হচ্ছে- মিথ্যা ও শয়তান।

পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 'মিথ্যা' শব্দকে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্নভাবে অর্থ করেছেন। মিথ্যা অর্থ= বাতি'ল। মিথ্যা অর্থ= মুব্‌তি'লূন। মিথ্যা অর্থ= খাতা'। মিথ্যা অর্থ= নিষ্ফল। মিথ্যা অর্থ= ফাসিদ। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮)

এছাড়াও মাযহাবের ফিক্‌হী মাসআলা-মাসাইলের বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনায় 'সহীহ্' বা বিশুদ্ধ এর বিপরীতে 'বাতিল' বা অগ্রহণযোগ্য অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবে 'মিথ্যা' অর্থাৎ বাতিলের বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এককথায় জীবনের যেকোনো একটি স্থানে মিথ্যা বা বাতিল ঢুকে গেলে সত্য বা হক্ব-এর সাথে সংযোগ লোপ পায় এবং ধীরে ধীরে বাতিলের প্রাবল্যের কারণে মানুষ পুরোটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়, 'হক্ব'-এর সাথে সংযোগ লোপ পাওয়ার অর্থ, পরম সত্য থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে- পরমসত্য বা 'আল-হাক্ক' কি?

পরম সত্য বা আল-হাক্ব এমন এক কেন্দ্রস্থল বা কেন্দ্রবিন্দু, যার সাথে মানবাত্মার একটি সুতলিবিহীন বন্ধন বিদ্যমান। এই বন্ধনের মধ্যখানে যখনই কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হয়, তখনই কেন্দ্রস্থলের সাথে সংযোগের বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। অতএব এই কেন্দ্রস্থল বা কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরী।

মিথ্যার স্বরূপ

আল্লাহ্‌র নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকল পাপের মা হচ্ছে মিথ্যা।" অর্থাৎ মিথ্যা থেকেই ব্যক্তিগত, সাংসারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার অপকর্ম আর কুকর্মের জন্ম হয়। ব্যক্তি চরিত্র ধ্বংস হওয়ার পিছনে যেমন মিথ্যার হাত থাকে, তেমনি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতাও এই মিথ্যাই। এইজন্যই বুযুর্গানে দ্বীনগণ বলে থাকেন, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শয়তান অর্থ মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যা বা শয়তান হচ্ছে, অসৎ। এখন কোনো ব্যক্তি বা দল যদি মিথ্যা বা অসৎ-এর সাথে বসবাস শুরু করে, তাহলে অবশ্যই সে নিজের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। কারণ, সৃষ্টিকুলের সবচে বড় অপরাধী হচ্ছে শয়তান। যেহেতু সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে অহংকার করেছে। এইজন্য আল্লাহ্ তাআলার সকল রহমত ও নিয়ামত থেকে সে আজীবন বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং আজকের পৃথিবীর মানুষ যদি এই নিকৃষ্ট শয়তানের সাথে আতাঁত করে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাতে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা অপরাধী ও অবাধ্যদের জন্য শাস্তিস্বরূপ জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন।

অন্যদিকে, দুনিয়াতেও এইসকল অবাধ্যরা শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। বাস্তব চোখে যদিও তাদের মাঝে কিছুটা শান্তি দেখা যায়, আসলে এটা শান্তি নয়। বরং আল্লাহ্র অনুগত সৃষ্টির মধ্যখানে বসবাস করার কারণে স্বল্পক্ষণের মুক্তিলাভ। অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগত সৃষ্টি সর্বক্ষণ আল্লাহ্র গুণগানে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অকারণে গাছের একটি পাতাও ছিড়ো না, যেহেতু ওরা আল্লাহ্র জিকির করে"।

উপমাস্বরূপ বলা যায়, হঠাৎ যদি কেউ দুর্গন্ধময় কাপড় পরে কোনো সুবাসী ফুলের বাগানে ঢুকে যায়, তাহলে ফুলের ঘ্রাণে সে তার শরীরের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তার শরীরও সুগন্ধময় হয়ে যায়।

অতএব আজকের এই বাস্তববাদী দুনিয়ার ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠি যতোই নিজেদেরকে সুখী-সম্মৃদ্ধশালী ধারণা করুক। আসলে মুসলিম সভ্যতায় পতিত আল্লাহ্র রহমতের বদৌলতে তারা টের পাচ্ছে না। কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, আজকের অধিকাংশ মুসলিম ঐসব ইহুদী-নাসারাদের সাথে সঙ্গ দিয়ে চরম মিথ্যায় লিপ্ত রয়েছেন।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও মুসলিম জাতির সমস্যা

মিথ্যার সাথে সঙ্গতি রাখার কারণে মুসিলম জাতি কি প্রকারের দুর্গতিতে দিনাতিপাত করছেন, সে বিষয়ে কিছু আলোপাত করা যাক্।

আজ পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই। এর প্রধান কারণ, মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয়। অতএব প্রশ্ন আসে যে, চারিত্রিক অবক্ষয় কিভাবে হয়? চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে মুমিনী জীবন-যাপনের পথ পরিহার করার কারণে। মানুষকে প্রকৃত চরিত্রবান হতে হলে মুমিন হতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের সত্তরের (৭০) এর উর্ধ্বে শাখা রয়েছে। ঈমানের সর্বোত্তম শাখা- 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং ক্ষুদ্রতম শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।" (মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে 'ঈমান'-এর কথা, আর আমরা আলোচনা করছি 'মুমিন' সম্পর্কিত বিষয়ে। কারণ, ঈমানের সত্তরটি (৭০) শাখাকে যিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করবেন, তিনিই প্রকৃত মুমিন। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসের শেষ শাখাটি নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আজকের অধিকাংশ মুসলমান লজ্জাশীলতার পরিবর্তে লজ্জাহীনতার কালচার গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অতীতের বনিইসারঈলীরা যদি জননীর সাথে প্রকাশ্য জ্বিনা (ব্যাভিচার) করে থাকে, তাহলে আমার উম্মতেরাও তা করবে।" (ইমাম তিরমিযীর হাদীসের অংশ বিশেষ, মিশকাত শরীফ বাংলা অনুবাদ ১ম খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)

একবিংশ শতাব্দির এই মুসলিম সমাজে এখনো এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে সঠিক খবরাখবর প্রকাশিত হয় নি। তবে এই যুগে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু আজকের অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের অবিজ্ঞতাপূর্ণ গবেষণার পথ ছেড়ে ইহুদী-খৃষ্টানদের শয়তানী পথে পা বাড়িয়েছেন।

বর্তমান যুগের ইহুদী-খৃষ্টানদের সাম্রাজ্য কায়েমের সবচে বড় দু'টো হাতিয়ার হচ্ছে, মিডিয়া ও মহিলা। মিডিয়া সম্পর্কে আমাদের অন্যান্য আলোচনায় বিশদ ব্যাখ্যা হয়েছে। অতএব মহিলাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানরা বিশেষ একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। যেমন, পশ্চিমা পুঁজিপতিরা মহিলাদের একটি বিশেষ দলকে উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত করাচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে মহিলাদের ছদ্মাবরণে অনেক কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত দুনিয়াজুড়ে একটি কথা উচ্চারিত হয় যে, মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার ছিলো না। সমাজে মহিলাদেরকে বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে রাখা হতো। তাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করা হতো না। কেবলমাত্র ইসলামী সভ্যতার বিপরীতে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে মহিলাদের প্রকৃত কোনো মর্যাদাই ছিলো না।

রাশিয়া ও চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলো মাহিলাদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়। তারা মহিলাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দানের পাশাপাশি দেশের উন্নতি ও সম্মৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করতে থাকে। পশ্চিমা বিশ্বে সর্বপ্রথম মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তিতে মহিলাদেরকে অন্তর্ভূক্তি দেয়া হয়। তারপর বাইরের সমাজ-জীবনে পূর্ণ মর্যদা দানের মধ্যদিয়ে গোপনে অপকর্মে লিপ্ত করানো হয়। প্রথম দিকে মহিলাদের অপকর্মে লিপ্ত করানোর সরকারী স্বীকৃতিকে সমালোচনা করা হলেও পরবর্তীতে বিষয়টি সমাজ-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়। আজকের পশ্চিমা সমাজ-জীবনে পুরুষ-মহিলারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন। নারী-পুরুষেরা রাতের অন্ধকারে যা-ই করুক সংসার জীবনে এটি একটি কালচার বা জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে অর্থ উপার্জনের একটি বিশেষ পন্থা ছিলো 'নারী' ব্যবহার। যেমন- হংকং, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও অপকর্মের বৈধতা জাতীয় সংস্কৃতিতে স্বীকৃত। একই সাথে বৈদেশিক পুঁজিপতিদের বিনোদনমূলক আগমণকে কেন্দ্রকরে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের সুবিধা দান। উক্ত কায়দা বা হেকমত বাতিলপন্থী কিছু সংখ্যক মুসলিম ফিরকার মাঝেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা এটাকে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভের একটি দর্শন হিসেবে মূল্যায়ণ করেন। কারণ, মানুষ সর্বদা নফ্স বা প্রবৃত্তির গোলাম। প্রবৃত্তির গোলামীর দরুণ মানুষ মুমিন থেকে কাফির হতে পারে। আবার নফ্সের উপর কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবেও স্থান করে নিতে পারে। সুতরাং বর্তমান বাতিলপন্থীদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে, রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন। দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে, দুনিয়ার শান্তি-সম্মৃদ্ধির জীবন-যাপন। তাই তারা অত্যন্ত কৌশলে মুসলিম মহিলাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পর্দার আড়ালে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার হেকমত (বুদ্ধি) অবলম্বন করেন। তারা যদিও নারী-পুরুষকে অপকর্মের সরাসরি স্বীকৃতি দেন না। তবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মুত্আ'র স্বীকৃতি দেন।

তাই মুসলিম সমাজে ইদানিং ব্যাঙের ছাতার মতো মহিলা সংগঠনের জন্ম হয়েছে। মহিলারা দলে দলে ওয়াজ মাহফিল, সভা-সমিতি, মিছিল-সমাবেশ, ইসলামিক কালাচারাল অনুষ্ঠান,

ইসলামী নাটক সন্ধ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দার সাথে আনাগোনার স্বীকৃতি পাচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বে মহিলাদের নিয়ে জোরালোভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রথমত শুরু হয় ইরানের শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর ইরান বিপ্লবের প্রাক্কালে। ইরান বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে কিছু সংখ্যক সুন্নী নামধারী ইসলামী দল ও সংগঠনে মহিলাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে মহিলাদেরকে সংগঠনের নেতৃত্ব দান করা হচ্ছে। এমনকি কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মসজিদে মহিলার ইমামতিতে নামায আদায় করা হয়েছে বলেও পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

অথচ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় পুরুষদেরকে মহিলাদের কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে। অর্থাৎ মহিলারা কখনো ইমামতির যোগ্য নয়। অবশ্যই পুরুষ তাদের কর্তা এমনকি মহিলাদের কর্তৃত্বকে মুসলিম সমাজের অধঃপতন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি জিনিস আমার কাছে সবচে বেশি প্রিয়, এক) নামায। দুই) সুগন্ধি। তিন) মহিলা। (আল-হাদীস)

হাদীসের বাণীর মর্মার্থ নিয়ে যদি আলোকপাত করা যায়, তাহলে একটি জিনিস পরিস্কার হয় যে, প্রিয় জিনিসকে প্রিয় খাতে ব্যবহার না করলে, পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ- এমনি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন- কেউ যদি নামাযে শৈথিল্য প্রকাশ করে, তাহলে মুনাফিকের নামায হিসেবে পরিগণিত হয়। কেউ যদি সুগন্ধি জিনিসকে দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের সাথে মিশিয়ে দেয়, তাহলে এমন অদ্ভূত গন্ধ বিকশিত হয়, যা সহ্য করা কঠিন। ঠিক এইভাবে কেউ যদি মায়ের জাত মহিলাদেরকে হীনস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অধঃপতন অর্থাৎ চরিত্রহীনতা সৃষ্টি হয়।

উপমাস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, “আমি একটি হাদিসে পেয়েছি পুরুষের ওয়াজ মহিলাদের শোনা জায়েয নাই। তেমনি মহিলাদের ওয়াজ ও পুরুষের শোনা জায়েয নেই। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বললে খুশি হবো।”

মাওলানা সাঈদীর উত্তরঃ এই রকম কোনো হাদিস আমি পাই নাই যে পুরুষের ওয়াজ মহিলারা শুনতে পারবেন না। বরং মহিলাদের কণ্ঠ সম্পর্কে পর্দা বলা হয়েছে। মহিলাদের ওয়াজ মহিলাদের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু পুরুষের কণ্ঠস্বর মহিলারা শুনতে পারবেন তাতে কোনো আপত্তি নেই। পুরুষ মহিলাদের কণ্ঠস্বরের ভিতর আকাশ এবং জমিনের পার্থক্য। মহিলাদের কণ্ঠস্বরের ভিতরে আকর্ষণ রয়েছে সেটি একটি ভিন্ন আকর্ষণ। সেই জন্য মহিলাদের বক্তব্য পুরুষদের শোনার ব্যাপারে কথা থাকতে পারে।

আরেকটি প্রশ্নঃ মহিলারা সামাজিকভাবে পুরুষদের সাথে কি একই সঙ্গে কাজ করতে পারবে?

মাওলানা সাঈদীর উত্তরঃ হ্যাঁ অবশ্যই পারবে তবে পর্দার ভিতরে থেকে, যেমন ইসলামী ব্যাংকে মহিলারা কাজ করছে, একইসাথে মহিলাদের জন্য আলাদা বুথ আর পুরুষদের জন্য আলাদা বুথ। এভাবে করে মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জনসেবা, অর্থনৈতিক সেবা, চিকিৎসা

সেবা, রাষ্ট্রীয় সেবা, শিক্ষকতা সর্বক্ষেত্রেই তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে তবে পর্দা রক্ষা করে। (তথ্যসূত্রঃ দেশ-বিদেশের মহিলা সমাবেশের প্রশ্নোত্তর, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা- ৬৫ ও পৃষ্ঠা-৮২)

উপরোক্ত দু'টো প্রশ্ন এবং প্রখ্যাত মাওলানার উত্তরকে কেন্দ্র করে বলা যায়, এতে বিপরীতমুখী দু'টো বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে, মহিলাদের কণ্ঠস্বরে একপ্রকার আকর্ষণ রয়েছে, সুতরাং পর্দা করা উচিত। অন্যদিকে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ এক সাথে কাজ করতে পারবে, তবে পর্দা সহকারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের দুনিয়ার যেকোনো প্রতিষ্ঠানে যদি নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করতে যায়, তাহলে শারীরীক পর্দা করা সম্ভব হলেও কণ্ঠস্বরের পর্দা কিভাবে হবে? ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্রই হোক। নারী-পুরুষের ওয়াজ শোনার ব্যাপারে যদি ইসলামী আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে থাকে, তাহলে কর্মস্থলের মাসআলা কি?

একই গ্রন্থে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তো মহিলাদেরকে মিছিলে যাবার জন্যেও উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতে মহিলাদেরকে মিছিলে ডাকা হবে বলে তাদেরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ করা হয়েছে। এতে কি প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, এই পদ্ধতির দর্শন আমদানী করা হয়েছে ইরানের খোমেনী বিপ্লব থেকে? শিয়া নেতা খোমেনী তো একই ধারায় সেখানে বিপ্লব করে সাফল্য অর্জন করেন? তাহলে জামায়াতে ইসলামী কি সে রকমই একটা বিপ্লব বাংলাদেশে করতে চায়? যে ভাবধারার মূল ভিত্তি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাইনবোর্ড লাগিয়ে নতুন শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন?

আরেকটি উদাহরণ-

হযরত হাসান ইবনে সালেহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "শয়তান রমনীদেরকে বলে- তোমরা আমার সেনাবাহিনীর অর্ধাংশ। তোমরা এমন তীর যা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তোমরা আমার গোপন রহস্য ভান্ডার এবং আমার কাজের সংবাদদাত্রী স্বরূপ।" (ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত তালবীসুল ইবলীস)

একইভাবে হযরত ওয়াহাব ইব্নে মুনাব্বিহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "বনী ইসরাঈলের একজন প্রখ্যাত দরবেশের কাছে এলাকার তিন ভাই তাদের একমাত্র যুবতী বোনকে আমানত রেখে, জিহাদে যাত্রা করেন। কারণ, ঐ বৃদ্ধপ্রায় দরবেশ ছাড়া তাদের সামনে আর উপযুক্ত কোনো অভিভাবক তখন ছিলো না। দরবেশ সারাদিন আল্লাহ্-বিল্লাহ্ করেন, আর মসজিদের খেদমত করেন। মসজিদের পাশের একটি রুমে ঐ যুবতী মহিলাকে রেখে ভাইগণ জিহাদে চলে গেলেন। খাবারের সময় হলে দরবেশ নিজ হাতে যুবতীর দরোজার সামনে খাবারের থালা রেখে চলে আসতেন এবং ডাক দিয়ে বলতেন। এইভাবেই তারা পর্দার বিধান পালন করে দিনাতিপাত করছেন। হঠাৎ একদিন দরবেশের মনে চিন্তা এলো, আমি তো অন্যায় করছি। একটি মেয়ে দিনরাত একা বসে থাকে, কারো সাথে কথাও বলতে পারে না। এভাবে তো বোবা হয়ে যাবে। তাই তিনি পর্দার আড়াল থেকে যুবতীর সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এতে তাদের মাঝে আলাপচারিতার একটি পরিবেশ গড়ে উঠে। ধীরে ধীরে একে অন্যে জানাজানি হয়। তারপর

দুজনে অবৈধ কাজে লিপ্ত হন। কিছু দিন পর একটি সন্তান জন্ম নেয়। তখন তারা দুজনে পরামর্শ করেন যে, যদি মহিলাটির ভাইয়েরা এসে এই শিশুকে দেখে, তাহলে নিশ্চিত দুজনের মৃত্যুদন্ড ছাড়া গতি নেই। দরবেশ তখন শিশুটিকে হত্যা করে কবরস্থ করেন। তখন দরবেশের মনে আবার প্রশ্ন জাগে, এবার যদি মহিলাটির ভাইয়েরা ফিরে আসে, আর সে যদি ভাইদেরকে সব ঘটনা খুলে বলে তাহলে আমারও মৃত্যু হবে। তাই তিনি মহিলাটিকেও হত্যা করেন। কিছুদিন পর মহিলাটির ভাইয়েরা এসে যখন বোনের সন্ধান চাইলো, তখন তিনি অনেক কান্নাকাটি করে বোনের মৃত্যু সংবাদ শুনালেন। এতে এক ভাইয়ের মনে সন্দেহ হলো। তিনি কবরের সন্ধান করলেন। কবর খুড়ে বোনের লাশ বের করে দেখেন, এটা সাধারণ মৃত্যু নয় বরং তাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা দখন দরবেশকে পাকড়াও করে বাদশাহ্‌র আদালতে হাজির করলেন। বাদশাহ্‌র আদালতে আসল ঘটনা ফাঁস হতেই তার মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ হলো। তিনি বাদশাহ্‌র কাছে মসজিদের খেদমতের দোহাই দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হলো। ঠিক তখন মানুষের রূপ ধারণ করে শয়তান এই দরবেশ নামী খুনীর সামনে এসে হাজির হলো। শয়তান বললো, এক পথ আছে তুমি মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পেতে পারো। দরবেশ বললেন, তাড়াতাড়ি বলো পথটা কি? শয়তান বললো, যদি তুমি আল্লাহ্ বলতে কেউ নাই বলে স্বীকার করো, তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। লোকটি প্রাণের মায়ায় সেকথাটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই কাফির এবং শয়তানও নিজ পথে ভ্যানিশ হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তাআলা এইসব লোকদের উদ্দেশ্য করেই বলেছেন, "শয়তান মানুষকে বলে কুফরী করো। সে (মানুষ) কাফির হয়ে গেলে শয়তান বলে আমি তোমার থেকে পৃথক। আমি বিশ্ব প্রভূ আল্লাহ্‌কে ভয় করি।" (ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত তালবীসুল ইবলীস, পৃষ্ঠা ২৪-২৬)

জিহাদ প্রসঙ্গ

জিহাদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৯)

উপরোক্ত আয়াতখানা ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নাযিল হয়েছিলো। ইসলামের দ্বিতীয় জিহাদ হচ্ছে ওহুদ যুদ্ধ। মক্কার কুরাইশগণ ইসলামকে অঙ্কুরে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। বদর যুদ্ধও ঠিক সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তিকরে সংঘটিত হয়েছিলো। এখানে আরেকটি কথাও জেনে রাখা উচিত যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই কাফির-মুশরিকরা আক্রমণ করবে। সুতরাং মুসলমানদের মনোবল ও বাহুবল দৃঢ় রাখার জন্যেই উক্ত আয়াতের মর্মার্থে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, "ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাকো এবং আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জিহাদে অনড় থাকো, তবে পরিশেষে তোমরা জয়ী হবে।" (সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা- ২০৬)

ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে একটি মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো যে, মদীনা শহরের ভিতরে অবস্থান নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা হবে, না শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হবে? ইসলামের প্রথম মুনাফিক আব্দুলাহ্ ইবনে উবাইসহ কিছু সংখ্যকের মত ছিলো শহরে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করা হোক। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কতিপয় যুবক-তরুণ সাহাবীর উদ্দেশ্য- 'আমরা মুসলিম বীর, আমরা কখনো কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে চাই না।" ওহুদ ময়দানে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হলো। (সূত্রঃ সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সৈনিকের সাজে সজ্জিত হয়ে ওহুদের পথে রওয়ানা হলেন। এক হাজার মুসলিম সৈন্য তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তিন শত সৈন্য নিয়ে দলত্যাগ করে চলে গেলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁদের কিছু সংখ্যক ফিরে এসে যুদ্ধে যোগদেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকটি সামরিক বিপর্যয় দেখা দিলো। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা সঠিকভাবে পালিত হয় নি। কেউ বললেন, আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, যেহেতু যুদ্ধ শেষ, অতএব সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ আহরণ করা উচিত। (দুই) খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো, সেটাই ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূল কারণ। মুসলমানদের এই তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তাঁরা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিলো সত্য, কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। সত্তর জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সাহাবীর মৃতদেহ ছিলো চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হতভাগ্যরা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নিরাশার ছায়া বিস্তার করেছিলো। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতে দু'টো বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো। (এক) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণ যেনো দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে।

এই দু'টো ছিদ্রপথ চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে বিজয়বার্তা। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান- কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।" (সুরা আলে-ইমরান আয়াত- ১৪০-১৪১)

মুজাহিদ মুমিনদের একটি উদাহরণ

বর্তমান পৃথিবী থেকে কুরআনী হুকুমত ধ্বংস করার লক্ষ্যেই গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃষ্টাব্দের সাজানো ঘটনার জন্ম। টুইন-টাওয়ার ট্র্যাজেডি যে একটি অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় চলে আসা ইসলাম বিধ্বংসী পরিকল্পনা তা এখন আর অস্পষ্ট নয়। ভোরের সূর্যালোকের মতো পৃথিবীর মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবুও মুসলিম বিজ্ঞমহলের একটা অংশ বিষয়টিকে আমলে নিতে পারছেন না। তাদের কাছে সমস্ত মুসলিম-বুনিয়াদের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তারা ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মুসলিম-বিশ্ব থেকে ইসলাম তথা কুরআনের বিধানকে অস্বীকার করে চলেছেন। বর্তমান যুগে ইসলামী শাসন পরিচালিত দেশ আফগানিস্তানের উপর ষড়যন্ত্রমূলক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নর্দার্ন এ্যালায়েন্স এবং মুসলিম দেশের (মুনাফিক গোষ্ঠি) সাথে পশ্চিমা ইহুদী-খৃষ্টানদের বন্ধুত্ব এবং চক্রান্তই তালিবান উৎখাতের জন্য দায়ী। (মাসিক ইসলামী সমাচার ২০০১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ৫১)

এরিয়ানা ওরফে আফগানিস্তান

কাবুল একটি পুরাতন শহর। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের নথিপত্রে খৃষ্টপূর্ব ২ হাজার অব্দে কাবুল একটি প্রখ্যাত শহর ছিল। আর তা খোরাসান ও আরজানা নামকরণের সুদীর্ঘকাল আগের খ্যাতি ও সভ্যতা। প্রাচীন পারসিক কাগজপত্রেও হেলমুদ নদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে তুরানী জাতির এবং পূর্ব আফগানিস্তানে ভারতীয় রক্তাশ্রিত অনার্য জাতির বাসস্থান ছিলো বলে উল্লেখ রয়েছে।

ইরানী অর্থাৎ অতীতের পারস্য দেশবাসীর আকিমেনিয়ানদের মাধ্যমে খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে দেশটি বিজিত হয়। এর আগে দেশটি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজাদের করতলে ছিল। তারপর দীর্ঘ দুই শত বৎসর আকিমেনিয়ানদের শাসনাধীন থাকার পর খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে দেশটি গ্রীকদের হাতে চলে যায়। গ্রীকদের পর ভারতীয় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হতে থাকে দীর্ঘকাল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কুশানদ সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশটি বিজিত হয়। ভারত বিখ্যাত কুশানদ সম্রাট কনিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে আফগানিস্তান ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অঞ্চল।

দ্বিতীয় শতাব্দির শেষের দিকে পারস্যের শাসানীয় বংশের রাজাগণ আফগানিস্তান অধিকার করে। তবে তাদের একক অধিকারে দেশটি পরিচালিত ছিল না। ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের বিরাট সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে আফগানিস্তান। আর সপ্তম শতাব্দিতে তুর্কী সাম্রাজ্য মুসলিম শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হলে, আফগানিস্তানসহ দুনিয়ার বিশাল একটি অংশ তাদের অধীনে চলে আসে। অর্থাৎ ৬৭২ খৃষ্টাব্দে আমীর মোয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময় হিরাত ও বলখ বিজিত হবার পর থেকে দীর্ঘকাল এখানে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় উন্নত জীবন-ব্যবস্থার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস সৃষ্টি হয়। তখন মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম খেলাফতের হেডকোয়ার্টার, এ সাথে ইস্তাম্বুল, কায়রো, জেরুজালেম, বাগদাদ, দামেস্কো, কাবুল ইত্যাদি শহরে গড়ে উঠে মানুষের জীবনের সুখ, শান্তি ও কল্যাণের একমাত্র সোপান নামক মুসলিম সাম্রাজ্যের একেকটি কেন্দ্রস্থল। ঐ সময় বর্তমান আফগানিস্তানের গজনীকে কেন্দ্র করে মধ্য-এশিয়ায় এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দিতে সুলতান আলপ্তগীন এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেও ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর, তার সুযোগ্য দৌহিত্র সুলতান মাহমুদ ছিলেন মধ্য এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণ-পুরুষ। সুলতান মাহমুদ তাঁর পিতার সূত্র ধরেই সুলতানাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আর তারই ছোঁয়ায় হাজার হাজার বছরের আফগান ইতিহাসের আকাশে তিন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে শুধু আফগান জনপদই নয়, সমগ্র প্রাচ্যজগতই এই নক্ষত্রগুলোর অবিস্মরণীয় কীর্তি ও গৌরবময়তায় আলোক-উজ্জ্বল হয়ে উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ও চর্চা, শিল্প-সাহিত্যের উন্নত পরিচর্যায় গজনী হয়ে উঠে সমগ্র প্রাচ্যপ্রতীচ্যের তথা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। এই তিনটি নক্ষত্রের একজন হলেন পুরুষ-সিংহ দিগ্বিজয়ী বীর সুলতান মাহমুদ, বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক, বিজ্ঞানী ও মনীষী আবু রায়হান মুহাম্মদ আলবেরুনী এবং ইরান জাতিকে পূনরুজ্জীবন দানকারী কালজয়ী কবি আবুল কাসেম তুসী ওরফে মহাকবি ফেরদৌসী। এইসব মুসলিম মনীষীদের কীর্তিগাঁথা শিল্পকর্মকে চুরি করেই আজকের অত্যাধুনিক পশ্চিমা

বিজ্ঞানের জন্ম। এই কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের একটি স্বীকারোক্তিকে কেন্দ্রকরেই প্রমাণিত হয়।

১৯৭৯ সালে রাশিয়ান বাহিনী আফগানিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চালালে প্রেসিডেন্ট রিগান বলেছিলেন, "আফগান জাতি যুদ্ধের অস্ত্র বানাতে জানে কিন্তু তাদের জনগণের মুখের অন্ন জোগাতে পারে না।" এই কথাটা সেই অতীত ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করে। আলবেরুনীর বিজ্ঞান কর্মের ফর্মুলা এখন মুসলমানদের হাতে নেই, নেই স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞানীদের কোনো নাম ও দাম।

আরেকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের সাজানো ঘটনা প্রচারিত হবার পরপরই বৃটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "আমরা সভ্যজাতি। আমরা এখানে সভ্যতার চর্চা করি।" কিন্তু মিস্টার প্রধানমন্ত্রীকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনাদের লিখা ইতিহাসবিদদের মতেই ইঙ্গ-মার্কিন সভ্যতার বয়স মাত্র হাজার বছর। এই তো একাদশ শতাব্দিতেও বৃটেনের অধিকাংশ মানুষ মাটির গর্তে বসবাস করতেন, আর শুকর ও খরগোস হত্যা করে কাচা মাংস খেতেন। আজ আপনারা সভ্যতার দাবীদার। আফগানিস্তানে চালিয়েছেন গণহত্যা। আর মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে বলছেন, আপনারা সভ্য জাতি! একইভাবে আপনাদের বর্তমান সভ্যতায় এমন কি সামাজিকতা বিরাজ করছে, যা দেখে মানুষ নিজেকে বুদ্ধি-বিবেকবান মানুষ হিসেবে গণ্য করবে? আজ আমেরিকা, বৃটেনসহ পশ্চিমা দুনিয়ায় পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে বিবাহ বন্ধনের সংস্কৃতি চালু হয়েছে। মা-ছেলে, ভাই-বোন ইত্যাদি সম্পর্কের মানবিক দায়িত্ববোধ টুকু আজ পশ্চিমাদের নেই। বনের পশুরা বয়সের ডাকে কারো পরিচয়ের তোয়াক্কা করে না, তাই বলে মানুষ কিভাবে এমন কাজ করতে পারে। এটার নাম কি পশ্চিমা সভ্যতা? এই জন্যই বোধহয়, পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হান্টিংটন 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বে সোভিয়েত কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামকে তাদের সভ্যতার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। আসলে কিন্তু সত্য কথাই লিখেছেন স্যামুয়েল হান্টিংটন। পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক চিত্র হচ্ছে এ্যানিমেল কালচার, আর মুসলমানদের সভ্যতা হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন হিউম্যান কালচার। এই কারণেই আজ সমস্ত পশ্চিমা শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীতে ইসলামী কালচার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

যা হোক, ত্রয়োদশ শতাব্দিতে চেঙ্গিস খান আফগানিস্তানকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হলে আফগানিস্তান বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং স্থানীয় অনেক শাসকের করতলে শাসিত হতে থাকে। প্রায় শত বছর একই অবস্থা বিরাজ করার পর চতুর্দশ শতাব্দিতে তাইমুর কর্তৃক আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হয়। আর তাইমুরের উত্তরাধিকারীদের শাসনামলেই আফগানিস্তানে সুখ ও সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং তখনকার রাজধানী হিরাতে ইসলামী সংস্কৃতির এক বিশাল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দিতে ভারতীয় মোগল সম্রাটগণ ও পারস্যের সাফাবিদ বংশের লোকেরা দেশটি ভাগ করে নেন। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দিতে আফগান জাতির মধ্যে জাতীয় চেতনা দেখা দেয়। ১৭৪৭ সালে আফগান রাজ্য গঠিত হয়। বাদশাহ্ আহমদ শাহ্ দুররানী দীর্ঘ ২৫ বছরকাল

কঠোর পরিশ্রম করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও দেশটিকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করেন। তবে পরবর্তী পুরো দুই শতাব্দিকাল ধরে দেশটিকে নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও রাশিয়ার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। ১৯২১ সালে আফগানিস্তান সম্পুর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

সৈয়দ জামাল উদ্দীনের দেশ আফগানিস্তান

ইতিহাসের চড়াই-উতরাই বহে আসা বর্তমান মানচিত্রের আফগানিস্তান যে ব্যক্তির নামকে সম্মান দেখিয়ে নাম করণ করা হয়েছে, তিনি হলেন সৈয়দ জামাল উদ্দীন-আল আফগানী। তিনি ১৮৩৮ বা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত শহর হামাদানের নিকটবর্তী আসাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। শিয়া মতাবলম্বীদের দ্বারা অধ্যুষিত হামাদান শহরের নিকটবর্তী আসাদাবাদে জন্মগ্রহণ করায় অনেকে তাঁকে শিয়া মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সুন্নী আলিম। তবে আধুনিক বিশ্বের মুসলিম জীবন-ব্যবস্থাকে কিছুটা মডারেট মসলাপাতি দিয়ে সাজানোই ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা। তাই তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই কারবালা, নজফ, দক্ষিণ ইরাক ও ইস্তাম্বুলসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। তবে মুসলিম জীবনের ইসলাম থেকে সরে যাবার দৃশ্য অবলোকন করে দুনিয়ার মুসলমানদের প্রতি তাঁর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশকে লোকেরা সন্দেহবাদীর অপলাপ বলে মনে করতেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আফগান আমীর দোস্ত মুহাম্মদের মৃত্যু হলে, আফগানিস্তানে গৃহবিবাদ দেখা দেয়। তার তিন পুত্র, শির আলী খান, মুহাম্মদ আফজাল খান ও মুহাম্মদ আজম খানের মধ্যে সিংহাসন দখল করার ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ১৮৬৬ সালে শির আলী খান সিংহাসনে আরোহন করলেও ১৮৬৭ সালে ভাই আফজাল খান কর্তৃক পরাজিত হয়ে কাবুল থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হন। ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত আফজাল খান ও আজম খান দেশটি শাসন করেন এবং শির আলী কৃর্তক আবার দু'জনই পরাজিত হন। আজম খানের শাসনামলে কান্দাহার তাদের করতলে চলে আসে। ঐ সময় জামাল উদ্দীন আফগানীকে আজম খানের মন্ত্রীত্ব দান করা হয় এবং রাশিয়ার জারের নিকট থেকে আজম খান বিরাট অংকের অর্থবিত্ত লাভ করেন। তবে শির আলী খানের আমলে তাঁর মন্ত্রীত্ব চলে যায়।

১৮৭০ সালে আফগানী চলে যান ইস্তাম্বুলে। কিন্তু তাঁর বাদশাহী প্রথার বিরোধিতার কারণে তিনি সেখানকার লোকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। ১৮৭১ সালে তিনি মিসরে গমন করেন। মিসরের একদল যুবক তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করে এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করে। সেখানে তাদের দলে ছিলেন মুফতী আবদুহু এবং পরে তিনি ইসলামী দলের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। একই সময় আফগানী মিসরের ওয়াফদ্ পার্টীর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা জগলুল পাশার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পদলেহী মিসরের মন্ত্রী খেদিভ ইসমাইল আফগানীকে সহ্য করতে পারেনি। সুলতানের নির্দেশে খেদিভ ইসমাইল পদচ্যুত হলে তার পুত্র তওফিকের গণতন্ত্রবাদী চিন্তাধারাকে পূঁজি করে খেদিভ ইসমাইল ভিন্নপথে

আফগানীকে আক্রমণ করে। যদিও আফগানীর বক্তৃতায় খেদিভ ইসমাইলের পুত্র তওফিক অত্যন্ত মুগ্ধ হতো। তবুও আফগানীকে ঐসময় অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে মিসর থেকে বহিঃষ্কার করা হয়। তিনি তখন ভারতের হায়দরাবাদে কিছু দিন অবস্থান করে কলিকাতায় চলে যান। সেখান থেকে ১৮৮৩ সালে প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে অবস্থান করে তিনি তাঁর অনুগামী আবদুহুকে নিয়ে আল-উর্ওয়াত আল উস্কা নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের এ সংবাদপত্রে ইংরেজদের দৌরাত্মের কথা প্রকাশিত হতো। এ সময় আরনেষ্ট রেনান নামক একজন ফরাসী ইতিহাসবিদ ও দার্শনিককে ইসলাম বনাম বিজ্ঞান বিষয়ক বিতর্কে পরাজিত করেন। ঐ সময় তাঁর উপর কর্তব্যরূপে দেখা দেয় তুর্কীর সুলতানদের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মতদ্বৈধতার সমাধান কার্য। দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ছিলেন তখনকার তুর্কীর সুলতান। তিনি কিছুটা ইসলামী ভাবধারার হলেও আফগানী ছিলেন কট্টর ইসলামপন্থী। ফলে বৃটিশরা আফগানীকে সহ্য করতে পারেনি। সৌদী-মার্কিন হালত-হিল্লার মাঝে উসামা বিন লাদিন যেমন এখনকার একটি প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছেন। একইভাবে আফগানী তখন তুর্কী সুলতান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে একটি বিষফোড়া হয়ে দেখা দেন। তাই বাধ্য হয়ে আফগানীকে তুর্কীস্তান ছাড়তে হয়। তিনি রাশিয়াতে চলে যান এবং সেখানে ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে বৃটিশদের মুসলিম বিরোধী ও প্রাচ্যদেশ বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারাভিযান চালান। এরপর তিনি আবার ইরানে চলে যান এবং তাঁর ইসলাম ও প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের কারণে পারস্যের বাদশাহ শাহ্ নাসিরুদ্দীন তাঁকে রাজদ্রোহী আখ্যাদিয়ে ১৮৯২ সালে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী তখন লন্ডনে চলে আসেন। এখানে থেকে তিনি একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর সংবাদপত্রের মাধ্যেমেই পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে, ইরানের শাহের তামাক চাষ ও বিশ্বব্যাপী ড্রাগ ব্যবসার খবর। তামাক রফতানীর জন্য ইংরেজদের সাথে শাহের দীর্ঘ মেয়াদী একটি চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ড্রাগ্রাসক্তির বিস্তার ঘটে। এসব তথ্য আফগানীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার কারণে অনেক পশ্চিমা লেখকরা জামাল উদ্দিন আফগানীকে কট্টর মৌলবাদী, এমন কি তাঁর সম্পর্কে খুব বাজে মন্তব্য করে ইতিহাস রচনাতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এরপর আফগানী তুর্কীর সুলতানের আমন্ত্রণে আবার ইস্তাম্বুলে চলে যান। কিন্তু ইসলাম ও প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েমের প্রচারণার কারণে তিনি সুলতানের বৈরীরূপে চিহ্নিত হন। তিনি কখনোই ইসলামে রাজতন্ত্র দেখতে চান না। ফলে সুলতান তাঁকে বন্দী করে রাখে এবং কারাগারেই তিনি ১৮৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন। ঐসময় আফগান জাতির মাঝে স্বাধীনতা লাভের আকাংখা জন্ম নেয় এবং একই বছর জামাল উদ্দীন আফগানীর নামানুসারে দেশটির নতুন নাম রাখা হয় আফগানিস্তান। তারপর ১৯২১ সালে স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হলে, ১৯৪৪ সালে জামাল উদ্দীন আফগানীর মৃতদেহ স্বদেশে স্থানান্তর করা হয়। রাজধানী কাবুলে তাঁকে দাফন করে কবরের উপর একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়।

রুশ ভল্লুকের আফগান দখল

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯২৬ সালে আমীর আমানুল্লাহ্‌র মাধ্যমে আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর নাদির শাহ্ সিংহাসনে বসেন। নাদির শাহ্ আততায়ীর হাতে নিহত হলে তার পুত্র জহির শাহ্ সিংহাসনে বসেন। ১৯৭৪ সালের ১৭ জুলাই জহির শাহের শ্যালক জেনারেল মুহাম্মদ দাউদ খানের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি ইসলাম বিরোধী পশ্চিমাদের পুতুল হিসেবে এখনো জীবিত অবস্থায় ইতালীতে অবস্থান করছেন। জেনারেল দাউদ আফগানিস্তানের রাজতন্ত্র বিলোপ করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আর ঐ সময়ই রুশ-আফগান শান্তি-চুক্তির নামে আফগানিস্তানে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ২৫ হাজার কোটি ডলারের অর্থ সাহায্যের সাথে সাথে ৮০ হাজার সৈন্য পাঠানো হয় আফগানিস্তানে শান্তি-শৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য।

১৯৭৮ সালে আরেক সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল দাউদ নিহত হন। লেঃ জেঃ কাদিরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয়। নয়া পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নূর মুহাম্মদ তারাকীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নূর মুহাম্মদ তারাকীকে অপসারিত করে হাফিজুল্লাহ আমিন ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ২৭শে ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লাহ আমিন ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন এবং বারবাক কারমাল নয়া প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। বারবাক কারমালের অনুরোধে রাশিয়ার কমিউনিষ্টরা আরো ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ‘ধর’-‘মার’ নীতির উপর ভিত্তিকরে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। কিছুদিনের মধ্যেই বারবাক কারমাল মীর জাফরের মতো মিত্র নামক চির শত্রু রাশিয়ানদের হাতেই নিহত হয়। এরপর রাশিয়ার মদদপুষ্ট নজিবুল্লাহ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। রাশিয়ান কিমউনিষ্টরা আফগানিস্তানে চালায় হত্যাযজ্ঞ। প্রতি রাতে আফগান মহিলাদের ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। নিরপরাধ শিশু কিশোরদের হত্যা শুরু করে।

১৯৮২ সালে রোনাসে কেলাস নামক একজন ফরাসী সাংবাদিক লিখেছেন, “আফগানিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের প্রক্রিয়া প্রথম নয়। ১৯৮০ সালে ষ্টকহোমে এর বিচারকগণ আফগানিস্তানে আগ্রাসন, সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতিসংঘ সনদ লংঘনের জন্য মস্কোর নিন্দা করা হয়। তবে আফগানিস্তানে ব্যাপক নির্যাতন, ফাঁসি, ধর্ষণ, বেসামরিক নাগরিক হত্যার মতো অমানবিক ঘটনাগুলোর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আদালত মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে কোন রায় দিতে পারেনি। পরে প্যারিসে আদালতের এক বৈঠকে আফগানিস্তানে বর্বরতা ও মানবাধিকার হরণ সম্পর্কে দ্বিতীয়বারের মতো শুনানী চলে। সেখানে আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনাম দখলের বর্বরতারও সমালোচনা করা হয়। কিন্তু ফলত কোনো কাজ হয়নি।”

রোনাসে কেলাস তার রিপোর্টে লিখেন, “ফরাসী ডাক্তারগণ আফগানিস্তানে তাদের হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের বিস্তারিত বিবরণ দেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আফগান বলেন, সুপরিকল্পিতভাবে শষ্যদানা ও খাদ্যগুদামে বোমা বর্ষণ করে সবকিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, কাবুলের একটি গ্রামের প্রায় শ'খানেক লোক বোমা হামলার ভয়ে লম্বালম্বি একটি গর্তের ভিতর লুকিয়ে ছিল। রুশ সৈন্যরা তাদের দেখতে পেয়ে সেখানে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার চোখের সামনেই সবগুলো নীরিহ মানুষ কয়লার মতো জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে মারা যায়।"

রোনাসে কেলাস বলেন, "আরেক তরুণী চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে এসে তার উপর জঘন্য নির্যাতনের কথা উল্লেখ করলে আমি নিজেই কেঁদে ফেলি। তরুনীটি নিজেই একজন এমবিবিএস ডাক্তার। তাকে রুশ সৈন্যরা ধরে নিয়ে তার উপর অমানষিক নির্যাতন চালায়। একটি ঘরের ভিতর তাকে নিয়ে সৈন্যরা গণধর্ষণ করে। সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলে তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। তারা তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। কিছুদিন পর তাকে অবৈধ সরকার প্রধান নজিবুল্লাহ'র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও তাকে কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে হয়। তারপর পুল-ই-চরখির বন্দীশালায় গোয়েন্দা পুলিশের আশ্রয়স্থলেও তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তরুণীটি বলে, এরকম হাজার হাজার আফগান মহিলা নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন।"

আশির দশকের আফগান জিহাদঃ

শ্বেত ভল্লুকদের এইসব নির্যাতন থেকে জাতিকে মুক্তি দেবার জন্য শুরু হয়েছিল মুজাহিদ বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ জিহাদ। ১৯৭৮ সাল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক দুর্গতি ও নজিবুল্লা সরকারের হত্যাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধের আন্দোলনে আফগান জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মকালে বাদাখশান ও নুরিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় গোপন বৈঠক। ঐ সময় নজিবুল্লাহ সরকার কর্তৃক সাধারণ সৈন্যের বেতন ১২০ আফগানী মুদ্রা থেকে ৫ হাজার আফগানী মুদ্রায় উন্নীত করে। এ সাথে দেওয়া হয় অন্যান্য অনেক সুযোগ সুবিধা। কারণ, সৈন্যরা যাতে নিজের জাতির উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে দেশটিকে একটি মৃতপুরী বানাতে পারে সেই লক্ষ্যে। কিন্তু নাজিবুল্লাহর এসব নীতিতে আফগান সৈন্যদের বিবেকে দারুণ আঘাত হানে। তারা অসম্মতি না জানালেও ভিতরে ভিতরে নাজিবুল্লাহ সরকার ও রুশ সৈন্যের উপস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে রুশ ভল্লুকরা দিশেহারা হয়ে অতর্কিতে হামলা শুরু করে দেয়। এদিকে বিমান হামলা, ওদিকে সৈন্য পাঠিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া, ধর-পাকড় ইত্যাদি বর্বরতায় সমগ্র আফগানিস্তান একটি বিধ্বস্ত বিরাণভুমিতে পরিণত হয়।

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় কাবা শরীফ বৈঠক। পবিত্র কাবা ঘরের সামনে বসে উলামায়ে দেওবন্দের উত্তরসূরী একদল আলিম আফগানিস্তানে জিহাদ করার প্রতীজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ হন। একই মাসে তারা পাকিস্তানে মিলিত হন। অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান সম্মেলন। সেখানে প্রধান ৬টি ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ঐকমত্যে গঠিত হয় 'ইসলামিক এ্যালায়েন্স ফর দ্যা লিবারেশন অফ আফগানিস্তান' সংগঠন।

এই নতুন সংগঠনে 'হিজ্‌বে ইসলামী বা ইসলামী পার্টি' নামক ৬০ হাজার সদস্যবিশিষ্ট

দলের নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার যোগদান করেন। 'হারাকাতে ইসলামী' দলের নেতা মৌলভী মোহাম্মদ নবীলুগর ২৫ হাজার সদস্য নিয়ে যোগ দেন। যোগ দেন ২১ হাজার সদস্য-বিশিষ্ট দল 'আফগানিস্তান জমিয়তে ইসলামী', তাদের নেতা বোরহান উদ্দিন রাব্বানী। 'যাবহা নাজাতে মিল্লী' নামক ১৫ হাজার সদস্যবিশিষ্ট দলের নেতা অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দিদী এসে তাদের সাথে যোগ দেন। 'হিজ্বে ইসলামী বা ইসলামী দল' নামক অন্য একটি দলের নেতা মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস ৮ হাজার সদস্য নিয়ে নতুন এ্যালায়েন্সে যোগদান করেন। 'মিল্লী ইসলামী মাহায বা ইসলামিক রেভল্যুশনারী ফ্রন্ট' নামক অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ জিলানীর দলও ৮ হাজার সদস্য নিয়ে নতুন এ্যালায়েন্সে ভর্তি হন। এছাড়াও উপজাতীয়, আঞ্চলিক ও ধর্মীয় অনেক দল বা গোষ্ঠির লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে শুরু করেন আফগানিস্তানের মুক্তি সংগ্রাম। এইসব দলগুলোর প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গরা হলেন, মাওলানা মুয়াজ্জিনের নেতৃত্বাধীন, 'হারাকাতে ইনকিলাবে ইসলামী', মাওলানা মুহাম্মদ মীরের নেতৃত্বাধীন 'জিবহাতে মিল্লী' এবং মধ্য আফগানিস্তানে 'শিয়াহাজারী' দল, পূর্বাঞ্চলের 'নুরিস্তানী' ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জমিয়তে ইসলামীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত আবদুর রসূল সাইফাক বিন ফকির মুহাম্মদের নেতৃত্বাধীন দল 'ইত্তেহাদে ইসলামী' অন্যতম।

উপরোল্লিখিত সংগঠনগুলোর ঐকমত্য পোষণকারী নেতৃবৃন্দ ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাসে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে 'ইত্তেহাদে ইসলামী' দলের নেতা আবদের রসুল সাইয়াক বিন ফকির মুহাম্মদকে জিহাদের নেতৃত্ব দিয়ে ৫০ সদস্যের মজলিশ-ই-শুরা গঠন করা হয়। আর ঐদিন থেকেই আফগানিস্তানের ২৯টি প্রদেশের ২৫টিতে শুরু হয় তুমুল মুক্তি সংগ্রাম। প্রদেশগুলোর ঘোরতর যুদ্ধ এলাকার মধ্যে, কাবুল, বারওয়ান, পাগমান, কুনার, নাংগারহার, লোয়ার, গজনী, কান্দাহার, হিরাত, ফারইয়ার, ফেজান, বল্খ, সুমনাকান, বাগদান, কান্দজ, বাদখশান, ওয়েরডাক, পাঞ্জশির, জালালাবাদ, পাকতিয়া, জেবুল, হেলমন্দ, ফারাহ, তাখার ও নিমরোজবুখতিয়া ইত্যাদি শহরে।

নিম্নে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দিনওয়ারী কয়েকটি ধারাবাহিক ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

২৭ এপ্রিল, প্রেসিডেন্ট দাউদের পতন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নূর মুহাম্মদ তারাকীর ক্ষমতা দখল। ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদ সংস্থাগুলোর মতে ঐদিন আফগানিস্তানে ৩৫০ জন কমিউনিষ্ট উপদেষ্টা অবস্থান করছিলেন। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে আফগানিস্তানে ২ হাজার রুশ উপদেষ্টার উপস্থিতি। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর তারাকীর প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লা আমীনের কাবুল আক্রমণ।

১৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট তারাকীর পতন ও হাফিজুল্লাহ আমীনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা দখল।

১৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের কাছ থেকে আমীনের শুভেচ্ছাবার্তা লাভ।

২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনশ' যানবাহন বোঝাই যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রুশ বাহিনীর কাবুল আগমণ এবং রুশ বিমান বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে কাবুল বিমানবন্দর দখল। একই দিন

দারুল আমান ও রেডিও কাবুল আক্রমণ, আফগান সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণ এবং বারবাক কারমাল কর্তৃক আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখলের ঘোষণা।

১৯৮০ সালের ১৪ জানুয়ারী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান। সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে ১০৪টি দেশের ভোট প্রদান। রাশিয়া কর্তৃক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা।

২১ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানে রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে কাবুলে হরতাল পালন।

২২ ফেব্রুয়ারী রুশ বাহিনীর গুলিতে ৩শ' বেসামরিক হত্যা ও কয়েক হাজার আহত।

৪ মার্চ কুনার উপত্যকায় মুজাহিদ বাহিনীর উপর রুশ বিমান বাহিনীর বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ।

২৯ এপ্রিল একটি হাইস্কুলে ঢুকে রুশ বাহিনীর ওপেন ফায়ারে কয়েক ছাত্র-ছাত্রীকে নিহত করা।

২১ মে একইভাবে আরেকটি স্কুলের শোভাযাত্রায় রুশ বাহিনীর গুলিতে ৭টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রীকে হত্যা করা হয়।

১২ আগষ্ট রমজান মাসের শেষ শুক্রবার রুশ বিমান বাহিনী কর্তৃক মসজিদে আক্রমণ এবং ১২শ' মুসল্লীকে হত্যা করে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ২৩ জুন 'দি ওয়াশিংটন পোষ্টে'-এর রিপোর্ট, কান্দাহার শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২ দিনের তুমুল যুদ্ধে রাশিয়ার মিগ-১৭ বিমানের বোমা নিক্ষেপ এবং কয়েক শত নিরীহ লোকের প্রাণহানি।

একইভাবে ৫ ডিসেম্বর কান্দাহারের একটি গ্রামে রুশ বিমান হামলায় শতাধিক লোক নিহত।

১৯৮২ সালের ৯ মার্চ বিবিসির খবরে বলা হয়, কাবুলে রুশ বাহিনীর আক্রমণে কয়েকশ' গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। খোলামাঠে ৪শ' সাধারণ নাগরিককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং সাতশ' লোককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

১৯৮৩ সালের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৯ জুলাই ফ্রান্স প্রেস এজেন্সির রিপোর্টে বলা হয়, গজনীতে মুজাহিদদের হাতে একজন রুশ সৈন্য নিহত হলে রুশ বাহিনী একটি গ্রামে ঢুকে ১২ জন লোককে প্রাণদণ্ড দেয় এবং আরেকটি গ্রামের ৫০ জন লোককে বোমা হামলা করে হত্যা করে। (মাসিক ইসলামী সমাচার ২০০১ সংখ্যা)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও চিন্তা করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত- ১৩৯)

শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ সালে জেনেভায় জাতিসংঘের অফিসে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ আফগান মুজাহিদীনের কাছে পরাজয় সনদে সাক্ষর করেন। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া বিষয়টিকে পরাশক্তির লজ্জা মনে করে, বিশ্ব সমাজে প্রচার ও প্রকাশ থেকে বিরত থাকার ভূমিকা নেয়। কিন্তু সত্য কখনো গোপন থাকে না।

সমস্ত বিশ্ব তাকিয়ে থাকে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, ফটোগ্রাফার ও প্রতিবেদকগণ। প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে সকল আশ্চর্যজনক খবর। লোকেরা দেখছে অলৌকিক ঘটনাবলীর বাস্তব প্রমাণ। রুশ কমিউনিস্টরা

এটা বুঝে নিয়েছেন যে, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র মুজাহিদদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ আফগানের মৃত্যু নেই। রুশ নেতৃবৃন্দ এটাও বুঝে নিয়েছেন যে, নাস্তিক্যবাদ মার্ক্সবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও আসলে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। তিনি আছেন এবং থাকবেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী কানাডীয় সাংবাদিকের ভাষায়, "যুদ্ধের সব কিছুই একেকটা চরম বাস্তবতা, যার ব্যাখ্যা দিতে আমি অক্ষম। যুদ্ধে রাশিয়া প্রতিদিন ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ রুশ বিজয়ের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে।"

আল্লাহ্র কালামের মু'জিযাঃ

মিসরের ইখওয়ান নেতা শহীদ হাসানুল বান্নার বন্ধু ও সহকর্মী, কাতার সরকারের শরীয়ত বিষয়ক উপদেষ্টা শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার মিসরী, ফিলিস্তিনের সাবেক সরকারী কর্মকর্তা শায়খ তামীম আল-আদনানী ও আফগানিস্তানের বহিঃর্বিশ্ব বিষয়ক মুজাহিদ নেতা সাইফুল্লাহ্ আখার, এই তিন বিশিষ্ট আলিমদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা গেছে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা। তারা আফগান মুজাহিদদের সাহায্যার্থে পৃথিবীর অনেকগুলো মুসলিম দেশ ঘুরেছেন। মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদে জান-মাল দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন মাহফিল, আলাচনা সভা ও মতবিনিময় কালে জিহাদের বিভিন্ন ঘটনা ব্যক্ত করেন।

যেমন, পাকিস্তান সীমান্তে উদ্বাস্তু আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতা ও বহির্বিশ্বের যোগাযোগে কর্মরত অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াসীর। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের গাইড হিসেবে কাজ করছেন। (মুহাম্মদ ইয়াসীর যুদ্ধপরবর্তী অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের তিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন।) একদল সাংবাদিককে মুজাহিদদের কবরস্থান পরিদর্শন করতে গিয়ে বলেন, এই কবরস্থানেই শুয়ে আছেন ফিলিস্তিনী নাগরিক সপরিবারে আমেরিকার অভিবাসী শহীদ আহমদ সাঈদ। এই শহীদের বিস্ময়কর ঘটনা আপনারা পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারেন। আহমদ সাঈদ হজ্জ করতে গিয়ে আরাফাতের মাঠে অবস্থান নিয়েছেন। একটু নিদ্রাচ্ছন্নতা আসতেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আহমদ সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কোথায় চলেছেন?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "আফগানিস্তানে যাচ্ছি।" আহমদ সাঈদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি হজ্জ সম্পাদন করে সোজা আফগানিস্তানে চলে এলেন এবং কিছুদিন পর শহীদ হলেন। আমরা তিন-চারদিন পর আমেরিকায় তার পরিবারবর্গকে খবরটি জানিয়ে দেই। ইতোমধ্যে কয়েকজন আত্মীয় তার কবর যিয়ারতও করে গেছেন।

আল-কুরআনের একজন হাফিজ ছাত্র পথ হারিয়ে একদিন রুশ বাহিনীর একটি ক্যাম্পে ঢুকে পড়েন। সৈন্যরা তাকে পেয়ে বন্দী করে ক্যাপ্টেনের সামনে হাজির করে। ক্যাপ্টেন তাকে গুপ্তচর সন্দেহে তল্লাশী করার নির্দেশ দেন। গুপ্তচরবৃত্তির কোনো নজির না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোরা নাকি বালু ও কংকরে ফুঁ দিয়ে ট্যাংক, কামান ও মেরিন ইত্যাদি ধ্বংস করতে পারিস্?

এবার দেখা সেই কারামতি। যদি না দেখাতে পারিস্ তাহলে তোকে গুলিকরে হত্যা করা হবে।' হাফিজ তরুণটি তখন অন্তর-কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কারণ, তিনি মরে গেলে আপত্তি নেই। কিন্তু কুরআনের আয়াতের অলৌকিক শক্তি দেখাতে না পারলে কাফিরদের কাছে আল্লাহ্‌র কালামের ইজ্জত থাকবে না। ইসলামের, মুজাহিদদের লজ্জার অন্ত থাকবে না। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তিনি আল্লাহ্‌র স্মরণে ভিতরে ভিতরে কাঁদতে থাকেন। এক পর্যায়ে বলেন, 'আমাকে অযু ও নামায আদায় করার সুযোগ দেওয়া হোক।' রুশ সৈন্যরা তাকে নামাযের সুযোগ করে দেয়। তিনি দু'রাকাত নামায শেষে একমুঠো বালি হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করেন, 'ইয্ রামাইতা ওয়ামা রামাইতা ওয়ালা- কিন্নাল্লাহা রামা'- বাক্যগুলো স্বশব্দে উচ্চারণ করে বালিতে ফুঁ'ক দিয়ে পার্শ্বে সাজানো সারি সারি ট্যাংক, কামান ও সাঁজোয়া যান (মেরিন)-এর উপর ছুঁড়ে দেন। সাথে সাথে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় সমস্ত কিছু। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কাফিরদের অস্ত্রশস্ত্র। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ক্যাপ্টেনসহ ক্যাম্পের সকল রুশ সৈন্যই মুসলমান হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে জিহাদের ঘটনা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মরহুম মুজাহিদ মাওলানা আরসালান খান রহমানী যাঁকে সোভিয়েত সৈন্যরা 'মানুষ খেকো' হিসেবে ভয় করতো, তিনি বলেন, 'আমরা কয়েকজন মুজাহিদ অর্ধশতাধিক একটি রুশ বহরের মধ্যখানে আটকা পড়ে যাই। আমাদের হাতে রয়েছে একটিমাত্র রকেট লাঞ্চার ও একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গোলা। আমাদের সাথী 'বাতুর' নামক মুজাহিদ তরুণ রকেট লাঞ্চারটি হাতে নিয়েছে শেষ আক্রমণের নিমিত্তে। আমি তখন আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি- হায় আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, একটিমাত্র লাঞ্চার যেনো লক্ষ্যচ্যুত না হয়। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া! রকেট লাঞ্চারটি এমনভাবে শত্রু বহরে আঘাত করে, পঁচাশিটি ট্যাংক ও গাড়ীসহ সমস্ত বহর পরাজিত হয়। আমরা তখন বিপুলসংখ্যক গণীমতের মালিক হই। যাতে অনেকগুলো অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিলো।'

স্মৃতি চারণে মাওলানা রহমানী বলেন, 'শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশজন মুজাহিদ ছিলাম। দুই হাজার রুশ বাহিনীর একটি বহর আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর ৭০-৮০ রুশ সৈন্য মারা যায়, ২৬ জন আমাদের হাতে বন্দী হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা মাত্র পঁচিশ জন মুজাহিদের সামনে হেঁরে গেলে কেনো? তারা বললো, 'চারিদিক থেকে আমাদের উপর কামান আর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হচ্ছিলো।' অথচ আমাদের হাতে কোনো কামান ও মেশিনগান ছিলো না। আমরা শুধু দেশী কাটা বন্দুক দিয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম।'

তিনি আরো বলেন, আরেকবার প্রায় এক'শ বিশটি ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি আমাদের উপর আক্রমণ করে। এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে। গোলা-বারুদ শেষ হয়ে আসছে। বন্দিত্বের ব্যাপারে আমরা সবাই তখন নিশ্চিত। আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম। সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেলো তুমুল যুদ্ধ। চতুর্দিক থেকে গোলাবৃষ্টি-রকেট আর বুলেটের ছোটাছুটি। কিছুক্ষণ পর কমিউনিষ্টরা পরাজিত হলো। আমি এতে বিশ্বাস করি কমিউনিষ্টদের আজকের এই যুদ্ধ কেবল বদরের ফিরিশ্‌তা ছাড়া আর কেউ করে নি।'

মাওলানা আরসালান রহমানী বলেন, 'আমরা উরগুন-৩২ নামক স্থানে রুশ বাহিনীর উপর

হামলা করলাম। পাঁচ শতাধিককে হত্যা ও তিরাশি জনকে বন্দী করা হলো। বন্দীদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা আমাদের একজন শহীদ করেও কেনো পরাজিত হলে? তারা বললো, 'তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছো। আমরা গুলি ছুঁড়লেও ঘোড়ার গায়ে লাগতো না।' তিনি বলেন, আফগান জিহাদের আমরা কোনো ঘোড়া ব্যবহার করি নি।

মুজাহিদ মুহাম্মদ ইয়াসির বলেন, 'রুশ সৈন্যরা যখনই ট্যাংক বহর নিয়ে কোনো গ্রামে ঢুকতো, তখনই জিজ্ঞেস করতো- ইখওয়ান আল-মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল কোথায়? গ্রামবাসী তখন অবাক হতো। কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিলো না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদ কখনো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে নি!'

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী বলেন, যুদ্ধে যাবার সময় একদল মুজাহিদকে আমি কয়েকটি বুলেট দিলাম। তারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে ফিরে এসে বুলেটগুলো আবার ফিরিয়ে দিলো। একটি বুলেটও কমে নি।

মুজাহিদ আবদুল জব্বার নিয়াজী বলেন, 'আমি দেখলাম গোলাম মুহিউদ্দীন নামক একজন মুজাহিদের উপর দিয়ে একটি রুশ ট্যাংক চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর দেখি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

মুজাহিদ আব্দুল মান্নান বলেছেন, আমরা তিন হাজার মুজাহিদ একটি সেন্টারে ছিলাম। রুশ বিমান বাহিনী সংবাদ পেয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, দীর্ঘক্ষণে তারা তিন শত বোমা আমাদের সেন্টারের উপর নিক্ষেপ করে। সকালে উঠে দেখি একটি বোমাও বিস্ফোরিত হয় নি। পরে আমরা এই তিন শত বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সদরদপ্তরে নিয়ে আসি।

মুজাহিদ পীর মুহাম্মদ বলেছেন, 'আমরা ১০ জন মুজাহিদ পাকতীয়া অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০ টি রুশ বিমানে একটি বহর সমতল ভূমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বোমা বর্ষণ করে। যুদ্ধ শেষে আমরা লক্ষ্য করে দেখি, আমাদের শরীরে কাপড়-চোপড় তেনা তেনা হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা আহত হই নি। আক্রমণে আমরা ১৬০জন কাফির হত্যা করলাম, তিন বিমান বিধ্বস্ত করা হলো এবং আমাদের দু'জন সাথী শাহাদতের মৃত্যু লাভ করলেন।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী বলেন, আমাদের দলের একটি ছেলে শহীদ হলো। আমরা তার পিতাকে খবর দেই। বৃদ্ধ পিতা, আশি বছরের ঊর্ধ্বে তাঁর বয়স। তিনি পাঁচ দিন পর চলে এলেন ছেলের কবর জিয়ারত করতে। ছেলের কবরের পাশে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আপন ছেলের লাশ দেখার দাবী জানালেন। অশিতিপর বুড়ো মানুষটির কথায় আপ্লুত হয়ে কবর খোঁড়ার সম্মতি দেই। দাফনের পাঁচদিন পর যখন কবরটি খোঁড়া হলো, তখন কবরের ভিতর জান্নাতি খুশবো বের হতে লাগলো। বুড়ো লোকটি পাগলপ্রায় কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'বাবা আমার! তুমি কী শহীদী মৃত্যু পেয়েছো? বাবা তুই কী শহীদ হয়েছিস্? আমি আর তোর মা কি এখন শহীদের পিতা-মাতা? বৃদ্ধ পিতার কান্নাকাটি এসব প্রশ্নের জবাব কে দেবে? হঠাৎ লাশটি নড়ে উঠলো। উপস্থিত লোকেরা সবাই হতবাক! আমার স্পষ্ট মনে আছে, শহীদ ছেলেটির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্, হ্যাঁ বাবা, আপনাদের একমাত্র ছেলে একজন শহীদ।' কথাগুলো বলতে বলতে ছেলেটি ডান হাত বের করে পিতার হাতে করমর্দন করলো। অনেক্ষণ বাপ-পুত্র করমর্দন

করলেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত বহুসংখ্যক মুজাহিদের চোখদিয়ে অশ্রু ঝরছিলো।

পাকতিয়া অঞ্চলের রযম ও উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কমান্ডার উরম হানীফ বলেন, 'এমন কোনো শহীদ আমি দেখি নি যার লাশ বিকৃত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে। কোনো শহীদের লাশকেই কুকুর স্পষ্ট করতো না। অথচ কমিউনিস্টদের মরা লাশ নিয়ে কুকুরেরা টানাটানি করতো। যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরাতন বারোটি কবর আমি খুঁড়েছি, কিন্তু কোনো একটি লাশেও পরিবর্তন দেখি নি। মনে হয়েছে যেনো, এদেরকে গতকাল কবরস্থ করা হয়েছে। এমনও দেখেছি যে, এক বছর পর কবরস্থ শহীদের লাশের জখম থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

মুজাহিদ আব্দুল জব্বার নিয়াজী বলেন, 'আমার ভাই আব্দুস সালামের লাশ দু'সপ্তাহ পরে উদ্ধার করি। লাশে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।'

আবদুল মজিদ হাজী বলেন, গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ দীর্ঘ সাত মাস পরে আমরা পাই। কিন্তু মনে হয় তিনি এইমাত্র শহীদ হয়েছেন।

লৌগরের মুজাহিদ যুবায়র মীর বলেন, আমাদের এক সঙ্গী শাহাদাত বরণ করে। তার হাতে ছিলো একটি রিভলবার। আমরা লাশ দাফনের আগে রিভলবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলাম। কিন্তু শহীদের হাত থেকে রিভলবারটি ছাড়ানো যাচ্ছে না। তখন আমরা তার পিতাকে সংবাদ দিলাম। তিনি এসে শহীদ পুত্রের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা এই রিভলবারটি তো মুজাহিদীনদের কাজে লাগবে! তৎক্ষণাৎ রিভলবারটি শহীদের হাত থেকে খসে পড়লো।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর জামাতা খেয়াল মুহাম্মদ জানান, 'আমরা ষাটজন মুজাহিদ একটি পাহাড়ী রাস্তার পাশে, চল্লিশ জন ও কুড়ি জন এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে বসে আছি। রুশ বাহিনীর আশিটি ট্যাংকসহ বিরাট একটি বহর ছুটে আসছে। তখন যোহর নামাযে সময়। আমি এদের দেখে একমুঠো কংকর হাতে নিয়ে পড়লাম, 'ইয্ রামাইতা ওয়ামা রামাইতা ওয়ালা-কিন্নাল্লাহা রামা' তারপর ফুঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। তাদের একটি ট্যাংক যখন ছোট্ট একটি পুলের উপর উঠলো, তখনই সাথী মুজাহিদের মেশিনগান গর্জে উঠলো। ট্যাংকটি ব্রীজের নিচে পড়ে গেলো। দ্বিতীয় ট্যাংকের দিকে একটি বোমা নিক্ষেপ করলো আরেক মুজাহিদ। শত্রুরা মনে করলো রাস্তায় বোধহয় মাইন পোঁতা রয়েছে। ট্যাংকটি তখন গতি পরিবর্তন করে রাস্তার পার্শ্বে নামতেই নরম মাটি ধ্বসে গিয়ে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিলো। নিরুপায় হয়ে শত্রুরা অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পন করলো।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সাহায্য ও মুজাহিদদের শহীদী প্রতিজ্ঞার মধ্যদিয়ে দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর যুদ্ধ করে, শ্বেত ভল্লুকমুক্ত করা হলো আফগানিস্তানকে। চৌদ্দ'শ বছর আগে ওহুদ যুদ্ধের সময় নাযিলকৃত পবিত্র কালামের ওয়াদা নতুন করে পূরণ করা হলো। আল্লাহ্ যেভাবে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও চিন্তা করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রতিজ্ঞা আবারও পূরণ করলেন।

অথচ আজকের কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা শুনে উক্তি করে, ইটস্ হার্ড টু বিলিভ্। অর্থাৎ বিশ্বাস করা কঠিন। তাদের ধারণা, সাহাবায়ে কেরামগণ

রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে যুদ্ধ করেছেন, তাকওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনের যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেমরাগণের রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐসব ঘটনা কেবল ইতিহাসের রঙীন অধ্যায় ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো মূল্য রাখে না।

কিন্তু এসব কথা যারা বলে, এরাও মুসলমান! এরাও পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান! সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে এইসব চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই আফগানিস্তানের জিহাদ প্রত্যক্ষ করেছেন। বিরাট বিরাট টাইটেল ধারী এইসব আলিম-উলামারা তখনও জীবিত ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ এখনো অধিকাংশই জীবিত আছেন। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে এই সকল ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা আমরা মোটেও ভুলি নাই। এমনকি পরবর্তী যুগে আফগানিস্তানের খেলাফত আমলেও তারা যে সকল বন্ধুদের সাথে আঁতাত করে ইসলামের বিরোধিতা করেছেন, সেসব খতিয়ানও আমাদের কাছে রয়েছে। অথচ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ করা 'ফরয' এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'ফরযে কেফায়া'।

বর্তমান আফগানিস্তানঃ

ইতিহাসের সকল যুগেই আফগানিস্তানের অবস্থান কৌশলগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর ইতিহাসে যতো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রায় সকলেই একবার আফগানিস্তান দখল করার চিন্তা করেছেন। বাধ্য হয়েছেন আফগানিস্তানের জন্য যুদ্ধ করতে। ফলে অতীত আফগানিস্তানের আয়তন আর বর্তমানের আয়তনে বিরাট ফারাক। বর্তমানে আফগানিস্তানের আয়তন ২ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ৮৬১ বর্গমাইল। এটি এশিয়া মহাদেশের একটি পার্বত্য দেশ। এর অধিকাংশ পর্বতই ১২২০ মিটারের বেশি উঁচু। পাশ্ববর্তী দেশসমূহ হচ্ছে- ইরান, পাকিস্তান, রাশিয়া এবং চীন। ২৯ ও ৩৮ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬১ ও ৭২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানরত। আফগানিস্তানে জলবায়ু শুষ্ক।

পামিরকে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ। পামিরের দক্ষিণ পাদদেশে শ্বেত বরফের টুপী পরা দেশ আফগানিস্তান। ইন্দোচীনের আন্নাসী পর্বতমালা থেকে যে গিরিশ্রেণীর যাত্রা শুরু হয়েছে, তা হিমালয়, কারা-কোরাম, হিন্দুকুশ প্রভৃতি নামে ভারত, পাকিস্তান ও আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে ইরানের উত্তর পাশ দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের দিকে ধাবিত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশের জন্য ভিয়েতনাম দেশটি যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশের নিরাপদ লোভনীয় করিডোর হচ্ছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পূর্বে কোয়াক গিরিপথ থেকে পশ্চিমে দন্দান শিকান গিরিপথ কয়েকশ' মাইল দীর্ঘ। হিন্দুকুশ পর্বতের শৃঙ্গ ৪৮৮০ মিটার উঁচু। এর উপরই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল অবস্থিত। প্রায় ৩২২ কিলোমিটার লম্বা হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যেই খাইবার পাস নামক ৫৬ কিলোমিটার ঐতিহাসিক গিরিপথ রয়েছে। এই গিরিপথ দিয়েই কাবুল হতে পাকিস্তানের পেশাওয়ার পর্যন্ত বাণিজ্য চলে। আরো দশটি গিরিপথের মধ্যে কোয়াক, খরকনল, তিল, সালাংগ, বাজাহ, কাওয়াস, কাহারদার, রামিয়াস, আক্রবতি, পেলু এবং দন্দানশিবান। এই গিরিপথগুলো দিয়েই

আবহমানকাল ধরে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সওদাগরী কাফেলার যাতায়াত চলে আসছে। এইসব গিরিপথ দিয়েই আলেকজন্ডার দক্ষিণ এশিয়ায় ঢুকে ছিলেন। আরব-আফগান মুজাহিদগণ সেনাপতি কুতাইবার অধীনে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস খান হেটে গেছেন এই গিরিপথ ধরেই, পরের শতাব্দিতে তৈমুরলং এবং ষোড়শ শতকে মোগল বাদশাহ্ বাবরও এইসব গিরি মাড়িয়ে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্য আর মনপোলি ব্যবসায়ীদের চলার পথ, এই আফগানিস্তানের গিরিপথগুলো অধিকারের লোভ কোনোদিনই কমেনি বরং বেড়েছে। সেই যে খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ক্ষমতালোভীদের নজর পড়েছিল আফগানিস্তানের উপর, তা আজো আছে।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লব ও তালিবান মুভমেন্ট

খোলাফায়ে রাশেদার পর বিগত চৌদ্দশ' বছরের পৃথিবীর ইতিহাসের একটি আশ্চর্যজনক ও চমকপ্রদ অধ্যায় হচ্ছে- তালিবান বিপ্লব। মূল বিষয়ে যাবার আগে প্রথমেই বলে রাখি, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ হক্কানী উলামায়ে কেরামের ধারণা- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণীর ব্যাখ্যায় এই তালিবান মুজাহিদদের সর্বশেষ দলটি মুসলিম উম্মাহর আগত সর্বশেষ আমীর হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম-এঁর সাথেই মিলিত হতে চলেছে। তবে এটা দুনিয়ার পরিণতির লক্ষণ নয় বরং বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়েরই সূচনা হতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্তাপিত হয়েছে যে, তালিবান বিপ্লবের ভিত্তিটা পূর্ণ শরীয়ত সম্মত ছিলো কি-না?

এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী উলামায়ে কেরামের মাঝে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা তখনই সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এখনো চলছে। এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর সন্ধানের নিমিত্তে লন্ডন থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'ইসলামী সমাচার'-এর পক্ষ থেকে এবং সহযোগিতায় লেখক সাংবাদিক সৈয়দ মবনুকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। তিনি ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বার্মিংহ্যাম বিমান বন্দর থেকে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ দুই সপ্তাহ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ঘুরে এসে সৈয়দ মবনু'র সচক্ষে দেখা বিষয়গুলো ইসলামী সমাচারে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে লেখাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব সন্ধানে একটু পিছনে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানে 'আফগান ইসলামী সংগঠনগুলো'র এক বৈঠকে 'দ্যা এলায়েন্স অব আফগান মুজাহিদীন' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠনে ছিলো-

১) হিজবে ইসলামী আফগানিস্তান, আমীর- ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার।
২) হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী, আমীর- মুহাম্মদ নবী মুহাম্মদী।
৩) জমিয়তে ইসলামী আফগানিস্তান, আমীর- অধ্যাপক বুরহানুদ্দিন রব্বানী।
৪) জব্‌হে নাজাতে মিল্লী আফগানিস্তান, আমীর- অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দিদী।

৫) কাওমী ইসলামী মাহাজ, আমীর- সৈয়দ আহমদ গিলানী।

৬) হিজবে ইসলামী (খালিস গ্রুপ), আমীর- মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস খালিস।

রুশমুক্ত আফগানিস্তানে উল্লিখিত সংগঠন আর স্থায়ী থাকেনি। পরবর্তীতে এদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। একইভাবে, দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল, সংগঠন ও গোষ্ঠিভিত্তিক ক্ষমতা হাসিলের লক্ষ্যে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। তখনো আফগানিস্তানের ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কমিউনিষ্টপন্থী নেতা নজিবুল্লাহ্। ১৯৯১ সালে এপ্রিলে নাজাতে মিল্লী দলের নেতা অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দিদীর নেতৃত্বে একটি পরিষদ নজিবুল্লাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে কাবুলে শাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু সিবগাতুল্লাহ্র নেতৃত্বে গঠিত পরিষদে হিজবে ইসলামীর নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার যোগ দিলেন না। ফলে দেশের ভিতরে শুরু হলো তুমুল গৃহযুদ্ধ। পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে একটি চুক্তি হলো। চুক্তি অনুসারে সিবগাতুল্লাহ্ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জমিয়তে ইসলামীর নেতা বুরহানুদ্দিন রব্বানীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলো। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন- বুরহানুদ্দিন রব্বানী আর প্রধানমন্ত্রীত্ব পেলেন গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। কিন্তু গৃহযুদ্ধ তবু বন্ধ হলো না। কে কাকে কি জন্য হত্যা করছে? কেউ স্পষ্ট বলতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত সৌদী আরব ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় পবিত্র কা'বা চত্বরের মুসজিদুল হারামে অনুষ্ঠিত হয় আফগান নেতাদের ঐতিহাসিক বৈঠক। পবিত্র কুরআন সামনে নিয়ে মসজিদুল হারামের ইমাম শায়েখ আব্দুর রহমান আল-সারিস বলেন, "আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা এই বছর আফগানিস্তানকে বিজয়ের রূপে মুসলমানদেরকে উপহর দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাধীন ফিলিস্তিন উপহার মিলবে। আমরা যেভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আফগান জিহাদে অংশ নিয়েছিলাম, সে ভরসায় বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ের জন্য দোয়া করে জিহাদ করতে হবে। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত উচ্চারণ করেন-(অনুবাদ) 'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও চিন্তা করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।' ইমাম সাহেবের আরো বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, 'আজ আফগানিস্তান স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আফগান শীষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এরকম মতদ্বৈধতা স্বাভাবিক। কোনো কোনো মতদ্বৈধতায় আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। আজকের মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংশা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মিমাংশা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরষ্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মিমাংশা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" সূরা হুজুরাত ৯-১০)

মুসজিদুল হারামের ইমাম সাহেবের বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই সেদিন আফগান নেতাদের মাঝে

সমঝোতা সৃষ্টি হয়। একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের মাধ্যমে আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়।

কিন্তু সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই সেই পবিত্র চুক্তি ভেঙ্গে যায়। দল আর সংগঠনগুলোর নেতৃত্বসহ কর্মীবৃন্দ একে অন্যের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠে।

সমস্ত বিশ্ব আফসোসের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো আফগান মুজাহিদদের অভিনব পদস্খলনের দিকে। পশ্চিমা গণতন্ত্র ও পূঁজিতন্ত্রবাদীদের কুফরী পরামর্শ, মুসলিম বিদ্বেষী জাতিসংঘের মুরব্বিয়ানা, মুসলিম বিশ্বের আয়েশী সরকার, কমিউনিস্ট, আমলা, বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিদের মিশ্র নেতৃত্বের দাবীর ফলে দেশটি বিরাণভূমিতে পরিণত হতে লাগলো।

১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান সৈন্যদের পলায়নের পর তৎকালিন উলামায়ে কেরামের কাবা শরীফ চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। ভঙ্গ হয়ে যায় ১৫ লক্ষ আফগানী মুসলিমের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া নতুন স্বাধীনতার সংগ্রামী প্রতীজ্ঞা। ধূলায় মিশে যায় ৩০ লক্ষ মানুষের ১৪ বছরের উদ্বাস্তু জীবনের পরিশ্রম। হাজার হাজার কুলবালা রমনীর ইজ্জতের কুরবানী মুছে যায় নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোর বিবেক থেকে।

দলীয় স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ হায়েনার মতো মানুষ খুনের জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন। তখনকার মুসলিম বিশ্বের শ্রদ্ধাভাজন আফগান আলিমগণ হয়ে গেলেন ক্ষমতালোভী এলিয়্যানের মতো। সিংহাসন পাবার উন্মাদনায় তাদের মাঝে হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেতে লাগলো। সমস্ত দেশজুড়ে শুরু হলো ক্ষমতা লোভী গৃহযুদ্ধ।

দেশ-বিদেশের শত্রু মিলিয়ে একটানা চৌদ্দটি বছর সংগ্রাম করার পর আফগানিস্তানের মাটি মুজাহিদদের বিজয়ে সেদিন উৎফুল্লতা প্রকাশ করছিল। শোকরানা জানাচ্ছিল পর্বতের চুড়ায় প্রতিবিম্বিত 'আল্লাহু আকবার ধ্বনি'। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই যেনো দেশ ও মাটির চেহারা মলিন হতে লাগলো। সমস্ত দেশ ভরে গেলো সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, জুয়াখোর, মদখোর, ধর্ষণকারী আর চাঁদাবাজদের দ্বারা। তাদের দৌরাত্মে দেশের সাধারণ মানুষ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলো। যে লোকেরা আজীবন ইসলামের শান্তিকামী মুজাহিদদের গালগল্প শুনেছে কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখেনি। আজ তাদের সামনে যখন বহুদল মিশ্রিত মুজাহিদ সৈন্যদের হিংস্র পশুপ্রবৃত্তি উদ্ভাসিত হলো, তখন তারা লাজে ও ঘৃণায় মাথা নত করতে লাগলেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আফগানিস্তান একটি জাহেলী যুগের বিরাণভূমিতে পরিণত হয়ে গেলো।

পিতা তার মেয়েকে নিয়ে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। ছিনতাই, অপহরণ ও ব্যাভিচারের ভয়ে সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বের হতে চায় না। বাপের চোখের সামনে মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করা হতো। ঘরের ভিতর ঢুকে বিবি-বাচ্চাদের উপর চালানো হতো নির্যাতন। রুশ বাহিনীর সৈন্যরা যেসব বর্বরতা করেনি, তার চেয়েও জঘন্য কুকর্ম চলতে লাগলো স্বদেশীর মাঝে নিজস্ব সমাজে।

সেদিন যেসব ইসলামী দল পাকিস্তান সম্মেলনে বসে জিহাদের ডাক দিয়ে ছিল! আজ তারাই আবার ক্ষমতার মসনদ লাভের আসায় একে অন্যকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। বোমার

আঘাতে ঝাঝরা করতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম। রুশ বাহিনী যেসকল এলাকায় আক্রমণ করেনি, সেসব এলাকায় একদল অন্যদলের উপর হামলা চালালো।

একদিন গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, বুরহান উদ্দীন রাব্বানী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা মুহাম্মদ নবী, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদী, মাওলানা জালাল উদ্দীন হক্কানী, মাওলানা আরসালান রহমানী প্রমুখ মুজাহিদ নেতাদের দর্শন লাভের আশায় মানুষেরা আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতো। এদের ডাকে- লক্ষ লক্ষ টাকা, কাপড়-চোপড়, খাদ্য-খাবার দিয়ে বিশ্বমুসলিম আফগান জিহাদে সাহায্য করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য থেকে মুসলিম যুবকরা আফগান রণাঙ্গনে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। এখনো সৌদী আরব, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, কাশ্মীর, বার্মা, বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, চাদ, জর্দান ইত্যাদি দেশের অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানের শহীদী মৃত্যুর জন্যে গর্ববোধ করেন। এই সকল মুজাহিদ নেতাদের দীর্ঘায়ূর জন্য দু'আ করেন। এদের বর্ণনা শুনে, পত্র-পত্রিকায় পাঠ করে, বহির্বিশ্বের লোকেরা ভাবতো, 'এরা বুঝি সাহাবায়ে কেরামের রাদ্বিআল্লাহু আনহু সত্যিকারের উত্তরসূরী।' এই তো সেই উলামায়ে কেরাম যারা আফগানিস্তানে বদরের ফিরিশ্‌তাদের প্রত্যক্ষ করেছেন। এদের চোখের সামনেই সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কালামের অনেক মু'জিযা। এরাই তো সেই মুজাহিদ আলিমগণ, যারা যুদ্ধের সময় কার্তুজহীন অসহায় অবস্থায় নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, আর আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা কাফির ধ্বংস করে তাদের বিজয়ী করেছেন।

অথচ মাত্র কয়েক মাসের মাথায় এসকল ব্যক্তিদের নাম শুনে লোকেরা ভয় পেতে লাগলো। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, বুরহান উদ্দীন রাব্বানী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা মুহাম্মদ নবী, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদী, মাওলানা জালাল উদ্দীন হক্কানী, মাওলানা আরসালান রহমানী প্রমুখ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের পরবর্তী কর্মকান্ড ইসলামের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত হলো। যেসকল সাংবাদিকেরা সেদিন তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হাজার হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করেছেন। আফগানিস্তানের পাহাড়ে, পর্বতে, বনে, জঙ্গলে ঘুরেছেন তাদের সাক্ষাতের লক্ষ্যে। তাদের সাথে কথা বলেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন আফগান শহীদদের পবিত্র লাশ মুবাররক। পরীক্ষা করে দেখেন দু'বছর আগের লাশও যে এখনো তরতাজা, মনে হয় এইমাত্র মৃত্যু ঘটেছে। মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করেছেন শহীদের রক্তের মনোমুগ্ধকর খুশবো। নতুন করে প্রমাণ করেছেন মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের প্রতিজ্ঞার বাণীসমূহ। বিশ্ব সমাজে প্রচার করেছেন ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ। লিখেছেন বিরাট বিরাট কিতাব। আজ এই সকল সাংবাদিক ও লেখকেরা হতবাক!

দলীয় তৎপরতার কারণে মুসলিম বিশ্বে এইসব ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ইতিহাসের একেকটি কলংক হয়ে দাঁড়ালেন। মাওলানা শব্দের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হতে লাগলো। পবিত্রভূমি মক্কার হারাম শরীফে 'মুজাহিদ' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। মুজাহিদ নামের প্রতি দুনিয়ার মানুষেরা থুথু দিতে লাগলো। মাত্র বছর খানেকের মাথায় সুলতান মাহমুদ, সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর দেশ আফগানিস্তান যেনো একটি জাহান্নামে পরিণত হয়ে গেলো।

মোল্লা উমরের বিপ্লব

তথাকথিত সাধারণ মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মদ উমর কান্দাহারের একটি মাদ্রাসায় তখন শিক্ষকতার কাজে জড়িত। এমন সময় এক বৃদ্ধ এসে কেঁদে কেঁদে বললেন, আমি মাদ্রাসার একজন ওস্তাদের সাথে দেখা করতে চাই। একজন ছাত্র ঐ বৃদ্ধের কান্নাজড়িত কণ্ঠের আহাজারী শুনে বললেন, আপনি বসুন। আমি হুজুরকে খবর দিচ্ছি। ছাত্রটি মোল্লা মুহাম্মদ উমরকে জানালো। মোল্লা মুহাম্মদ উমর সাথে সাথে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ লোকটিকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ তখনও কাঁদছেন। মোল্লা উমর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো?

বৃদ্ধ লোকটি মোল্লা উমরের চেহারার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে মুখখানা মলিন করে চলে যাবার চেষ্টা করলেন এবং বললেন, কিছু না! আমি যাই।

মোল্লা উমর বৃদ্ধ লোকটির কান্নার মাঝেও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে আবার বললেন, আপনি বসুন এবং আমাকে বলুন, আপনি কাঁদছেন কেনো? লোকটি বললেন, আপনি কি মুজাহিদ? তিনি বললেন, এখন নই, তবে আগে ছিলাম। বৃদ্ধ বললেন, আমি আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনি মুজাহিদ ছিলেন। তাই আপনার কাছে কিছুই বলতে চাই না। মাদ্রাসায় কোনো বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব থাকলে ডাকুন! আমি উনার কাছে বলবো। মোল্লা উমর তখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ওস্তাদকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধ লোকটি একটু ইতস্তত করে তাঁর কাছে বললেন, একদল মুজাহিদ আমার চোখের সামনে আমার যুবতী মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে। বলেই বৃদ্ধ লোকটি দুই হাতে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে ফেললেন। এই কথা শুনে বয়োজ্যেষ্ঠ ওস্তাদ লোকটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ইন্শাআল্লাহ্! এই জমীনে আর এমন ঘটনা ঘটবে না।" বৃদ্ধ লোকটি চলে যাবার পর বয়োজ্যেষ্ঠ ওস্তাদ মোল্লা উমরকে ঘটনা শুনালেন।

ঐদিন রাতে কান্দাহারের মেওনদ অঞ্চলের ছংহেছার বস্তিতে বসে মোল্লা উমর তার সাথীদের ডাকলেন। যে সাথীরা একসময় ঐক্যবদ্ধভাবে রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। মোল্লা উমরের ডাকে ছুটে এলেন- মোল্লা হাসান, মোল্লা আব্দুল জলিল, মোল্লা আকতার, মোল্লা উসমানী প্রমুখ পনেরজন বিজ্ঞ আলিম। মুজাহিদদের সাথে শুরু হলো আফগানিস্তানের চলমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে কি করা যায়, তা নিয়ে প্রত্যেকের দায়িত্বশীলতার কথা হলো।

মোল্লা মুহাম্মদ উমর এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বললেন, "আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, দেশের প্রতিটি রাস্তায় যেখানে হিংস্রতার শক্তি বিরাজমান, সেখানে মাত্র পনেরজন লোক কি করতে পারি? এই প্রশ্নের জবাব হবে দেশের বর্তমান সংঘাতসমূহকে প্রতিরোধের জন্য জিহাদের সূচনা করা। জিহাদ শুরু হয়ে গেলে হিংস্র শক্তিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য মিথ্যার উপর বিজয়ী হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেভাবে অস্ত্রশস্ত্রহীন শূন্যহাতে যুদ্ধ করেও আল্লাহর সাহায্যে আমরা জয়ী হয়েছি। আজো সেই আল্লাহ্ তাআলা আছেন এবং আমরা তাঁর সাহায্য পাবো ইনশাআল্লাহ্।

আজ আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে তাওয়াক্কুল ও আমলের মাঝে। সেদিন যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে

আমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করেছিলাম, বিজয়ী হবার পরপরই আমরা এখন ক্ষমতালাভের নেতৃত্ব আর সন্ত্রাসের কর্তৃত্ব পালন করছি। পশ্চিমা ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রভাবে আমাদের স্বাধীন দেশ ও নেতৃত্ব আজ মুনাফিকীর গহ্বরে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। উহা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।'

সুতরাং আমাদেরকে আবার অস্ত্র ধরতে হবে। তবে আজ আমাদের জিহাদ হবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজের ফিৎনা-ফাসাদ, মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার মাধ্যমে নামায কায়েম করার জিহাদ। আমরা যদি বিশুদ্ধ নিয়তে সুন্নতের উপর দৃঢ় থেকে জিহাদের সূচনা করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে। প্রশ্ন আসতে পারে যে, দেশে আজ দু'বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলছে। আমরা যদি এই মুহূর্তে জিহাদে শরীক হই তাহলে হয়তো কেবল আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হবে। আসলে তা নয়! আমরা কিন্তু গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি না। বরং সন্ত্রাস আর ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করতে যাচ্ছি। আমরা জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা নিজেরা জুলুম করে জুলুম বন্ধ করতে যাচ্ছি না। আমাদের মধ্যেও যদি কেউ জুলুম-অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে তার বিরুদ্ধেও আমাদের অস্ত্র কথা বলবে।

আমরা সমাজে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে শাসক আর শোষিতকে এক সারিতে দাঁড় করাবো। আমরা শাসক হবো না বরং স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবো। আমাদের মাঝে কোনো দল কিংবা দলভিত্তিক নেতৃত্ব থাকবে না। কারণ, দলগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থ আর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত থাকে। ফলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। দলের সাথে থাকে বিদেশী প্রভাব ও তোষামোদী নীতি। এই তো আমাদের দেশের শত শত দল এখন শত শত মতবাদ প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা লাভের আসায় নিজের সম্মানকে হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন বায়তুল্লাহ্ শরীফে বসে যে সন্ধি করা হয়েছিল, ক্ষমতার লোভে তা ভঙ্গ করার ফলে নেতাদের উপর থেকে এমনকি সমস্ত দেশের উপর থেকে আল্লাহর রহমত সরে গেছে। নেতারা ইদানিং শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। ঐসব দলগুলোর ছায়াতলে এখন অস্ত্রবাজির অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

মোদ্দাকথা হলো, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' যদি ইসলামের বিধান হয়ে থাকে, তাহলে- আমরা দল, নাম ইত্যাদি কিছুরই তোয়াক্কা করি না। আমরা তালিবান অর্থাৎ ছাত্র এবং বিসমিল্লাহ্ বলে হাঁটা শুরু করলে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অবশ্যই পথের দিশা দিবেন। এতে আমাদের জিহাদের সূচনাও হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা শিক্ষার্থী। আমাদের জন্মও হয়েছে শিক্ষার্থী হিসেবে, অতএব জ্ঞান সন্ধানী হয়ে সত্যের উপর বাঁচবো এবং জ্ঞানের সন্ধান করতে করতে শাহাদতের পথ ধরে আল্লাহর দরবারে হাজির হবো। মহান আল্লাহ্ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে অবশ্যই সকল আয়োজন করে দেবেন ইন্‌শাআল্লাহ্।"

এই প্রতীজ্ঞা নিয়েই সেদিন অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে মোল্লা মুহাম্মদ উমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে তালিবান বিপ্লবের সূচনা হয়। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিচ্ছবি

আজকের এই আফগানিস্তানের মোল্লা মুহাম্মদ উমর। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি রাশিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আফগানিস্তানকে রুশমক্ত করার পর আর তাকে কোনো সভাসমিতি কিংবা বিজয়ী সমাবেশে দেখা যায় নি। তিনি গ্রামের বাড়িতে এসে সাধারণ স্কুল (মাদরাসা) মাষ্টারের চাকুরী ও স্থানীয় মসজিদের ইমামতীকে নিজের জীবিকা নির্বাহের কাজ হিসেবে ধরে নেন। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বিশ্বের সর্বস্তরের গুপ্তচর বাহিনী মোল্লা উমরকে দেখার এবং তার একটি ছবি তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সুন্নাতের পরিপূর্ণতা রক্ষা করতে গিয়ে বরাবরই প্রচারবিমুখ।

মোল্লা উমরের খিলাফত আন্দোলনের ডাকে প্রথম দিনই কান্দাহারের মাটি আনন্দে মেতে উঠলো। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রাম এলাকার চেহারা বদলে গেলো। গভীর অমানিশা রাতে একটি বাতি জ্বালালে যেমন অন্ধকার দূরে সরে চতুর্দিক থেকে হাজারো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তেমনি সমগ্র দেশ তাকাতে লাগলো। সকলের মুখে একই প্রশ্ন, এরা আবার কে? হঠাৎ এই দল কোথা থেকে এসে খিলাফতের আহ্বান জানালো? এরা কি আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের আরেকটি নতুন মাত্রা? সমস্ত বিশ্বজুড়ে শুরু হলো তালিবান বিরোধী প্রচারণা। নানা জনের নানা কথা। কেউ বলেন, এরা তালিবান নয়, বরং আইএসআই-এর এজেন্ট। কেউ কেউ বলেন, এরা সিআইএ এবং আইএসআই-এর মদদপুষ্ট ভাড়াটে ইত্যাদি কতো উক্তি ও মন্তব্য।

মাত্র কয়েকদিনের মাথায় লোকেরা নিজ থেকেই এসব প্রশ্নের জবাব পেতে লাগলো। না! এরা সত্যিকারের ভিন্ন একটি দল। যারা সমাজে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, বরং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যাদের সাথে আইএসআই কিংবা সিআইএ-এর কোনো যোগসাজস নেই। এমনকি পৃথিবীর কোনো দল বা গোষ্ঠির সাথে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কও নেই। তারা আল্লাহ্‌র তরবারীর দল। যে দলের ঈমান হচ্ছে- ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ’ এবং ‘তরবারীর নিচে জান্নাত’।

দেশের মানুষ দলে দলে তালিবানদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে লাগলেন। যেখানেই তালিবানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই শান্তি-শৃংখলা যেনো আকাশ থেকে ঝরতে থাকে। আশ্বিনের হাল্‌কা বাতাসে যেমন শিউলী ঝরে ফুলেল হয়ে যায় গাছতলা। খুশবো আর সুবাসী বাতাস প্রবাহিত হয় দিকে দিকে। তেমনি তালিবানী পদধূলিতেই ফিরে আসতে থাকে শান্তির নিশ্বাস। ব্যাভিচার তো দূরে থাক্, পাড়ায়, গ্রামে, শহরে, বন্দরে মানুষেরা রাতে দরোজা খুলে ঘুমুতে আরম্ভ করে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে যেসকল এলাকার লোকেরা সন্ধ্যার সাথে সাথে নিজ থেকে গৃহবন্দী হতো ইজ্জতের ভয়ে, সেখানে সারারাত ঘুরে বেড়ালেও কোনো আতঙ্ক নেই। এক সময় রুশ সৈন্য এবং পরের বছরগুলোতে মানুষ দলীয় সন্ত্রাসীদের দেখে ঘৃণার আতঙ্কে তাকাতো। আজ সেই স্থানেই সাধারণ মানুষেরা তালিবান প্রহরীদের সাথে করমর্দন করে। বৃদ্ধ মহিলা পানি নিতে গেলে তালিবান প্রহরীরা তাদের বাসায় পানির কলস পৌঁছে দেয়। রাতের অন্ধকারে ঘরের লোকেরা উপোস করছে কি-না, সে খবর নিতে এলাকার গভর্নর ঘুরে বেড়াতেন।

কাশ্মিরীরের প্রখ্যাত মুজাহিদ নেতা আলিমে দ্বীন মাসউদ আজহার তাঁর এক ভাষণে বলেন,

ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যখন আফগানিস্তানে পৌঁছি, তখন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি জীপ পাঠানো হয়। জীপের ড্রাইভার এক যুবক। চেহারায় উৎফুল্লতার চাপ। মনে হলো তার সমস্ত শরীর এক অভিনশ্বর আনন্দে হাসছে। করমর্দন করে গাড়ীতে উঠলাম। মাইল কয়েক যেতেই তিনি পথিমধ্যে গাড়ী থামালেন। রাস্তার পাশেই একটি পাঠশালার কাজ হচ্ছে। তিনি আমাদেরকে সেখানে নিয়ে গেলেন। বললেন, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে, একটু দেখে যাই। তিনি আমাকে একটি রুমে বসতে দিলেন। আরো কয়েকজন মেহমান সেখানে রয়েছেন। আমি বসলাম। কয়েকজন তরুণ আমাদের জন্য শরবত ও হাল্‌কা নাস্তা নিয়ে এলো। বললাম, আমি এতোটা ক্লান্ত নই। একজন বললো, কি বলেন! এতোটা পথ পরিশ্রম করে এসেছেন! সামান্য বিশ্রাম নিন। মিনিট কয়েক পরই ড্রাইভার এসে গেলেন। আবার গাড়ীতে উঠলাম।

আরো কয়েক মাইল যেতেই দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখি একটি দালানের কাজ হচ্ছে। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। ভাটির রোদের ঝিলিক পড়েছে তাদের সাদা পোষাকে। চকচক করছে। ড্রাইভার যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে ওরা কারা? একজনকে তো চিনি চিনি মনে হচ্ছে!

ড্রাইভার বললেন, চলুন যাই। আপনার সাথে দেখা করিয়ে নেই। কাছে যেতেই দেখি, শাইখ উসামা বিন লাদিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কনস্‌ট্রাকশন জরিপ করছেন। বললাম, আমার তো ভাগ্য ভালো! ড্রাইভার যুবকটি বললেন, তিনি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। শাইখের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে জানতে পারলাম, যে যুবকটি আমাকে বাসষ্ট্যান্ড থেকে এতোটা পথ ড্রাইভ্‌ করে নিয়ে এসেছেন, তিনি এই এলাকার গভর্নর।

কাশ্মীরী মুজাহিদ আরো বলেন, তালিবানদের শাসন পদ্ধতি দেখে আমি সবসময় দু'আ করতাম, 'হে আমাদের প্রতিপালক! হে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন, তুমি সমস্ত দুনিয়ায় এরকম শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করে দাও।' (তথ্যসূত্রঃ মাসউদ আজহার কর্তৃক বক্তব্যের ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত, অনেকগুলো নাম অস্পষ্ট থাকায় লিপিবদ্ধ করা গেলো না।)

তালিবান কর্তৃক কাবুল বিজয়ের পূর্বে সংগৃহীত একটি সাক্ষাৎকারে কান্দাহারের গভর্ণর মোল্লা হোসেইন বলেন, "তালিবানরা যে সকল এলাকায় সন্ত্রাসীদেরকে পরাজিত করে একচ্ছত্র শাসন পেয়েছে, সেখানে সর্বপ্রথম শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চলছে। অলি গলি থেকে কমান্ডারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ জীবন-যাপনের পথ উন্মোক্ত হয়েছে। অবৈধ অস্ত্রগুলো একস্থানে জমা করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি না হয়। সেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্যে ওদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনবসতিতে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শরয়ী আদালত স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদসমূহকে আবাদ করা হয়েছে। বেআইনী কর্মকান্ড বন্ধ করা হয়েছে। দেশের সবত্র যতো গাঁজা ও আফিমের চাষাবাদ ছিলো, সেইসব জমিনে প্যাট্রোল ঢেলে পুড়ানো হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে এই জমিতে আর কখনো নেশাজাত উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ না করে।

যে সকল স্থানে তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠিত, সেখানে চুরি, ডাকাতী, ছিনতাইসহ সকল সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়েছে বলা যায়। ধীর ধীরে সমস্ত আফগানিস্তানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, স্কুল-মাদরাসা খোলা হচ্ছে। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দুবাই পর্যন্ত কার্গো বিমান চলাচল শুরু করেছে, ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই তালিবান বিমান কোম্পানীর মাধ্যমে আফগানিস্তান এয়ারলাইন্সও চালু হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমরা সারাদেশে চৌদ্দটি বড় শরয়ী আদালত ও প্রায় দেড় হাজার ছোট আদালত চালু করেছি।”

তালিবান শাসনামলে শরয়ী আদালতের বিচারের নমুনা

এক ছেলে তার মাকে কষ্ট দিলো। মা নিরুপায় হয়ে ছোট আদালতে বিচার চাইলেন। বিচারক ছেলেকে ডেকে ঘটনা তদন্তক্রমে তাকে শাস্তি প্রদান করা হলো। ছেলেটির শাস্তি হচ্ছে, প্রায় দেড় কেজি ওজনের নয়টি পাথর তার পেঠের তলায় বেধে দেওয়া হলো এবং দুজন প্রহরী সর্বক্ষণ লাগিয়ে দেয়া হলো। প্রহরীরা নয় মাস তার সাথে থাকবে।

একটি অলৌকিক ঘটনাঃ

আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট আমলের একজন সেনা অফিসার। নাম- মেজর (অবঃ) সলিমুল্লাহ্ (অবশ্য এটা তার ছদ্মনাম) এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “যেদিন তালিবানরা কান্দাহার সেনানিবাস আক্রমণ করেন, তখন আমি সেনানিবাসে কমান্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত। তালিবানদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে আমি নিজেও ময়দানে বেরিয়ে যাই। তালিবানরা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবে কোনো যুদ্ধকৌশলে নয়, বরং সাধারণ মানুষের বেশে তারা সেনানিবাস দখল করতে আসছেন। আমি অস্ত্র হাতে নিয়ে যখনই গুলি করার জন্যে টার্গেট করি, ঠিক তখনই কে যেনো আমার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। এমনকি মিনিটের মধ্যে আমার দু’গালে তিনটি থাপ্পড় পড়লো। আমি হতবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। ইতোমধ্যে কে যেনো বললো- সলিমুল্লাহ্! কি করছো? আওয়াজটি শুনে আমি ভীষণ ভয় পেলাম। সাথে সাথে অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পন করি। এখনো মনে পড়ে সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের কথা। কিন্তু আশ্চর্য! তালিবানরা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার দেখালেন যে, আমার সেনানিবাসের অধিকাংশ অফিসার এখন তালিবান শাসনে কর্তব্যরত বড় বড় অফিসার।”

মাত্র দু’বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তালিবানরা কাবুল দখল করে আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তৎকালীন জিহাদে অংশগ্রহণকারী নেতা মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানী তালিবানদের সকল অস্ত্রশস্ত্র সদস্যদের পাঠিয়ে দিলেন তালিবানদের সাহায্যার্থে। একইভাবে আরো অনেকেই শরীক হলেন। কিন্তু শরীক হলেন না বুরহান উদ্দিন রব্বানী, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, সিগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদী, ইউনুস

খালিস ও মাওলানা মুহাম্মদ নবী গুল'র নেতৃত্বাধীন দলগুলো। তারা বরং তালিবানদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। বাইরের শত্রুদের চেয়ে ভিতরের শত্রুদের সাথে তালিবানদের যুদ্ধ হলো বড় যুদ্ধ। দেশের সাধারণ মানুষ দলে দলে তালিবানদের দলে যোগ দিতে লাগলো। কিন্তু ক্ষমতালোভী ইসলামকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারকারী দলগুলো তালিবানদের সাথে সামিল হতে পারলো না।

ফলে ভিতরের শত্রুরাই অতীতের ধারাবাহিকতায় দাওয়াত করলো বাইরের কুফরী শক্তিকে। মিত্রতা গড়ে তুললো ইহুদী-নাসারা ও ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে। এই গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আর বুরহান উদ্দিন রব্বানী গংদের পুরুষানুক্রমিক ব্যক্তিস্বার্থ আর ইসলামকে নিয়ে পুতুল খেলার নেতৃত্বের ফলেই মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ধ্বংস হয়েছিল। তখনকার চক্রান্তকারীরা যেভাবে শরীয়তি নিয়মনীতিকে উৎখাত করার জন্য ইহুদী-নাসারা ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল, আজো তাই করেছে।

বহির্বিশ্বের শত্রুতা ও তালিবান শাসনের সম্পর্কঃ

তালিবানরা রাজধানী কাবুল থেকে তাদের বাহিনী সরিয়ে নেয়ার পর (ডিসেম্বর ২০০১) বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় কুফরী জোটের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করেছে।

তালিবানরা ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর সেখানে তথা বহির্বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তালিবান মুজাহিদরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছ থেকে কাবুল দখল, সাবেক প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আইন চালু করেন। প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রব্বানী আমলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ তার জন্মস্থান পানশীর উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯৯৬ সালের ১০ অক্টোবর মাসুদ সমর্থিত অংশ জাতিগত উজবেক জেনারেল আবদুল রশিদ দোস্তামের তালিবান বিরোধী বাহিনী ও শিয়া মুসলিম গোষ্ঠী হেজবে ওয়াহাদাতের সঙ্গে একটি জোট গঠন করে। ১৯৯৭ সালের ১৯ মে দোস্তামের প্রতিনিধি উজবেক বংশোদ্ভূত জেনারেল আবদুল মালিক কৌশলগত উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজার-ই-শরীফে দোস্তামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তালিবানদের সঙ্গে একটি জোট গঠন করে। ২৪ মে তালিবানরা দোস্তামের শক্ত ঘাঁটি মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করলে দোস্তাম শহর ছেড়ে পালিয়ে যান।

২৮ মে তালিবানদের সঙ্গে জোট গঠনকারী জেনারেল মালিক তাদের বিরোধিতা করলে তালিবানরা মাজার-ই-শরীফে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এতে প্রায় ৬শ' তালিবান নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ৩০ মে হেজবে ওয়াহাদাত কেন্দ্রীয় গোরবান্দ উপত্যকা এবং মাসুদের বাহিনী কাবুলের উত্তরাঞ্চলীয় জাবাল সিরাজ শহর দখল করে নেয়। ২৪ জুলাই মাসুদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী কাবুলের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে অগ্রসর হয়। অবশেষে তারা তালিবানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ২১ আগস্ট মালিকের অনুগত সৈন্য ও দোস্তামের বাহিনীর মধ্যে মাজার-ই-শরীফের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দোস্তামের

বাহিনী পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৮ সালের ৯ আগস্ট তালিবানরা পুনরায় মাজার-ই-শরীফ দখল করেন এবং দোস্তাম আবার পালিয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আফগানিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা বিশেষ করে শিয়া মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের জন্য তালিবানদের দায়ী করে। ২০ আগস্ট কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসের ওপর বোমা হামলায় ২২৪ জন নিহত ও ৫ হাজার মানুষ আহত হয়। এর ১৩ দিন পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের কাবুলকে লক্ষ্য করে অবিরাম প্রচণ্ড ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার লক্ষ্য হচ্ছে তালিবানদের মেহমান উসামা বিন লাদিনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা।

একই বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর তালিবানরা হেজবে ওয়াহাদাতের শক্ত ঘাঁটি হাজারাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তালিবানরা দেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি এলাকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ফলে পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব তালিবানী সরকারকে কূটনৈতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ১৪ মার্চ তালিবান ও বিরোধী জোট তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি চুক্তিতে সম্মত হয়। এপ্রিলের দিকে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে আবার শত্রুতা শুরু হয় এবং তালিবানরা হেজবে ওয়াহাদাতের শক্ত ঘাঁটি মধ্যাঞ্চলীয় বামিয়ান শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের মে মাসেই তালিবানরা পুনরায় শহরটি দখল করে নেন।

২৪ আগস্ট মোল্লা উমরের প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়। ট্রাকভর্তি বিস্ফোরণের হাত থেকে তিনি বেঁচে যান। ১৪ নভেম্বর বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ তালিবানদের ওপর সর্বপ্রথম জাতিসংঘ অবরোধ কার্যকর করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান সংস্থার একটি ছিনতাইকৃত যাত্রীবাহী বিমান কান্দাহারে অবতরণ করে। ভারত কর্তৃক কাশ্মীরী মুজাহিদ মাসউদ আজহারকে মুক্তি দেয়ার পর আটক যাত্রীদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়।

২০০০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী কাবুল থেকে মাজার-ই-শরীফগামী এরিয়ানা বিমান সংস্থার একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয়। অবশেষে এটিকে বৃটেনে অবতরণ করানো হয় এবং সেখানে ১০ ফেব্রুয়ারী ছিনতাইকারীরা আত্মসমর্পণ করে ও ১৭০ জন যাত্রীকে মুক্ত করে দেয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর তালিবানরা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তালোকান শহর দখল করেন। ৩ নভেম্বর তালিবানরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় সম্মতি প্রদান করেন। ২০ নভেম্বর তালিবানরা রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশা জহির শাহের একটি শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে আবার জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করা হয় এবং তালিবানরা শান্তি আলোচনা বর্জন করেন। ২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী তালিবানরা কাবুলে জাতিসংঘ অফিসসমূহ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানে আবার নতুন জাতিসংঘ অবরোধ জারী করা হয়। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য আর ঔষদের অভাবে দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করে।

একটি বিদেশী সংস্থা আফগানিস্তানে পঞ্চম শতাব্দির ঐতিহাসিক বৌদ্ধমুর্তি সংস্কারের জন্য

তালিবান সরকারকে টাকা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যেহেতু তালিবান শাসন আমলে আফগানিস্তানে অমুসলিম প্রচারণা ও ইহুদী-খৃষ্টান এনজিও সংস্থার প্রতি কড়া নজর রাখা হতো। ফলে এনজিও নামধারী সংস্থাগুলো গুপ্তচরবৃত্তির সুযোগ পেতো না। তালিবান সরকার বৌদ্ধমুর্তি সংস্কারের অর্থগুলো দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। তালিবান পররাষ্ট্র দফর থেকে বলা হয়, "জাতিসংঘ অবরোধ ও দীর্ঘ যুদ্ধের কারণে আমাদের দেশের মানুষ ভূখা দিনাতিপাত করছে। ঔষধের অভাবে সুচিকিৎসা নিতে পারছে না। সুতরাং মুর্তি সংস্কারের অর্থগুলো মানুষ বাঁচানোর কাজে ব্যবহার করা হোক।" তালিবানদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

ফলে, তালিবান সরকার বৌদ্ধমুর্তি ভেঙ্গে ফেলার ফতোয়া দেন। মৌর্য সম্রাট অশোক পঞ্চম শতাব্দীতে এই মুর্তিগুলো নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৭৫ ও ১২০ উঁচু দু'টি মুর্তি হিন্দুকুশ পর্বতের একটি দুর্গম স্থানে নির্মিত ছিলো। মৌর্য সম্রাট নিজের রাজকীয় ইতিহাসকে মহাকালের মানুষের কাছে বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এই মূর্তিগুলো তৈরী করেন। মূর্তির গায়ে অনেক শিলালিপি খোদাই করা ছিলো। এই শিলালিপিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা বুদ্ধদেবের গুণগানের চেয়ে সম্রাজ অশোকের ব্যক্তিগত পরিচয়ই ছিলো বেশি। কালের বিবর্তনে মূর্তিগুলোর পার্শ্বে গিয়ে সাধারণ মানুষের পরিদর্শন করা বড়ই কষ্টকর। তা ছাড়া আফগানিস্তানে যে ক'জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ছিলো, তালিবান আমলে তারাও মুসলমান হয়ে যায়। ফলে খিলাফত শাসনের পবিত্র ভূমি আফগানিস্তানে বৌদ্ধ মূর্তিটি বেকার দাঁড়িয়ে থাকে শিরক গোনাহের এক চুড়ান্ত সাক্ষী হিসেবে।

আমিরুল মুমিনীন মোল্লা উমর বৌদ্ধ মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে সমস্ত বিশ্বজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ। এমনকি অনেকগুলো মুসলিম দেশের টাইটেলধারী কিছুসংখ্য আলিম উলামাও মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে চিৎকার দেন। কিতাব-গ্রন্থ খোঁজে আফগানিস্তানের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার মাসআলা প্রচার করতে থাকেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ কারদায়ী এবং মিসরীয় গ্র্যান্ড মুফতী ওয়ালিসিল ফতোয়া জারী করেন। তারা বলেন, "মুর্তি পূজা মুসলমানদের জন্য হারাম, অন্যদের জন্য নয়। তাই বৌদ্ধমুর্তি ভাঙ্গা ঠিক হবে না। যেহেতু দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিসর বিজয়ের পর সেখানের বিরাট বিরাট মুর্তিগুলো ভাঙ্গার নির্দেশ দেন নাই। সুতরাং আফগানিস্তানে এইসব ঐতিহাসিক মুর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার কোনো যুক্তি নেই।" (সুত্রঃ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধ)

একইভাবে, আফগানিস্তানে মুর্তি ভাঙ্গাকে কেন্দ্রকরে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় সেদেশে পবিত্র কুরআন শরীফের কপি পুড়িয়ে ফেলার ধৃষ্টতা দেখায়। কিন্তু বিশ্ব মুসলিম অত্যন্ত নিরব ভূমিকা পালন করেন। বরং মুর্তি ভাঙ্গার নির্দেশকে কেন্দ্রকরে জাতিসংঘ সদরদপ্তরেও প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়।

মার্কিন মদদপুষ্ট মুসলিম দেশসমূহের ঐ সকল আলিম-উলামার মাসআলা ও রিপোর্ট পড়ে মনে হয়েছে, এরা তো বাদশাহ্ নমরূদের রাজসভার সেইসব নজ্জুমগণ। যারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক কা'বা ঘরের মূর্তি ভাঙ্গাকে জাতীয় অপরাধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলো এবং পরবর্তীতে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার পরমর্শ দিয়েছিলো। এইসকল মাওলানা আর

মুফতী নামধারী লোকেরা এখনো পৃথিবীতে জীবিত আছেন। আল্লাহ্ তাদের সুমতি দান করুন।

তালিবান কর্তৃক বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশকে কেন্দ্র করে সমগ্র দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হলো। কিন্তু তালিবানরা তো ওহী এবং সুন্নাতের ফয়সালাকে শিরোধার্য মনে করেন। অবশেষে, ১ মার্চ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালিবানরা বামিয়ান প্রদেশের বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করেন।

তালিবান বিরোধী জোটের নেতা আহমদ শাহ্ মাসুদ এপ্রিলে ২০০১ প্যারিস, স্ট্রার্সবুর্গ ও ব্রাসেলস সফর করেন। আগস্টে আফগানিস্তানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের দায়ে আটজন বিদেশী ত্রাণকর্মী ও তাদের আশ্রয়দানকারী ১৬ জন আফগান নাগরিককে কাবুলে গ্রেফতার করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর জেনারেল আহমদ শাহ্ মাসুদ দু'জন আরব সাংবাদিকের আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে ছিনতাইকারীদের তিনটি বিমান হামলায় নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়। সাথে সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ নতুন ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদিন ও তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে দায়ী করে। ১৫ সেপ্টেম্বর বিরোধী নেতারা মাসুদের নিশ্চিত মৃত্যুর খবর দেয়। তালিবানরা আফগানিস্তানে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিককে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় পার্শ্ববর্তী কোন দেশ সহযোগিতা করলে সেসব দেশের ওপর পাল্টা হামলা চালানোর হুঁশিয়ারী দেন। আফগানিস্তানের ইসলামী চিন্তাবিদরা ২০ সেপ্টেম্বর তালিবান শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিন লাদিনকে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান। এর জবাবে তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ উমর জানান, তিনি ধর্মীয় চিন্তাবিদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবেন। তবে বিন লাদিনকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন না। কারণ, কোনো বিপদগ্রস্থকে ইসলামী নীতি অনুযায়ী মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার বিধান নেই।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত সান্‌ডে টাইমস্ পত্রিকার সিনিওর সাংবাদিক ইভন রিডলী গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যে আগানিস্তানে ঢুকলে, তালিবানরা তাকে গ্রেফতার করেন। দীর্ঘ তেরো (১৩) দিন তালিবান কারাগারে তিনি বন্দী-জীবন কাটান। ইভন রিডলীর গ্রেফতারকে কেন্দ্রকরে সমস্ত বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়। ৩ অক্টোবর তালিবানরা পাকিস্তান মধ্যস্থাকারীদের হাতে ইভন্ রিডলীকে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ইভন্ রিডলী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সমস্ত মুসলিম বিশ্ব তালিবানদের সমর্থন না করে মারাত্মক ভুল করছেন। তালিবানদের মতো শাসন-ব্যবস্থা যদি পৃথিবীর আর দু'চারটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে পৃথিবীতে অন্যায় নামক জিনিসটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। কারণ, তালিবানদের কারাগারে যদি এরকম নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা হাওয়ারীদের ভূমিকা পালন করেছেন।' ইভন্ রিডলী আরো বলেন, তালিবানদের কারাগারে আমরা যে কজন অ-মুসলিম ছিলাম, সবাই মুসলিম হয়ে গেছি। আমি এখন গর্বিত মুসলিম নারী।' ইভন্ রিডলী ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সানডে টাইমস্ পত্রিকা থেকে চাকুরী চলে যায়। ফলে তিনি 'তালিবান কারাগারে তেরো দিন' নামক একটি বিরাট গ্রন্থ

রচনা করেন। যে গ্রন্থটি বিশ্বজুড়ে বহুল প্রচারের সম্মান অর্জন করে।

২৫ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব কাবুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তালিবানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় তালিবানরা তাদের প্রধান মিত্র পাকিস্তানের সমর্থন হারায়। গত ১ অক্টোবর রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহের সঙ্গে আলোচনার পর তালিবান বিরোধীরা আফগানিস্তানে একটি পরিবর্তনমূলক সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২ অক্টোবর ক্ষমতাসীন তালিবানদের পক্ষ থেকে রোম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ নয়– মধ্যস্থতার আহবান জানানো হয়। ৬ অক্টোবর এক হাজার এলিট মার্কিন সৈন্য উজবেকিস্তানে পৌঁছে। সেখানে ওয়াশিংটন ও লন্ডনের প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ও বেশ কিছু জঙ্গী বিমান ও রণতরী আফগানিস্তানে সন্ত্রাস বিরোধী নামে মার্কিন হামলার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিন লাদিনকে হস্তান্তরের সময় ফুরিয়ে আসছে বলে তালিবানদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং নতুন ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। ৭ অক্টোবর মার্কিন জোটের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক বোমা হামলা চালানো হয়।

সমস্ত মুসলিম বিশ্ব নিরব দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বোমা বর্ষণের চিত্রগুলো বিশ্বমিডিয়ায় ২৪ ঘণ্টা প্রচারিত হয়। কিন্তু একটি মুসলিম দেশও একথা বলার সাহস করেন নি যে, এটা মুসলমানদের দেশ! এদেশের নিরীহ মানুষের উপর যুদ্ধ করা চলবে না! অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করেব না আল্লাহ্র রাহে, অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের পক্ষে?....." (সূরা নিসা আয়াত ৮৫-এর প্রথমাংশ)

দুঃখজনক সত্য যে, তালিবান কর্তৃক মুর্তি ভাঙ্গার বিপক্ষে যে সকল ইসলামী শিক্ষিত, ডক্টর, মুফতী, ডিগ্রীধারীরা বড় বড় ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাদের কেউ মার্কিনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করার সাহস করতে পারলেন না। তারা পবিত্র কুরআনে রীতিমতো তিলাওয়াত করেন যার অনুবাদ হলো, "সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না। তোমরাই প্রবল। আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করেন না। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত ৩৫)

কিন্তু আল্লাহ্ যে মুমিনদের সাথে রয়েছেন, তা অধ্যয়ন করেও যেনো বিশ্বাসী হতে পারলেন না। ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের ভয়ে সমস্ত বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানগণ যেনো থরথর কাঁপতে লাগলেন। অথচ আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো মৃত্যু তোমাদেরকে নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তবে তারা বলে ইহা তোমার নিকট থেকে। বলো, সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে। এ সম্প্রদায়ের হলো কি যে, এরা একেবারেই কোনো কথা বুঝে না। (সূরা নিসা আয়াত- ৭৮)

আল্লাহ্ বলেন, "এরা কি জানে না আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা যুমার আয়াত ৫২) সুতরাং এই সকল মুফতী সাহেবান কি সত্যিকার অর্থে মুমিনের দায়িত্ব পালন করছেন?

২৬ অক্টোবর ক্ষমতাসীন তালিবানদের বিরুদ্ধে জাতিগত পশতু উপজাতিদের প্ররোচিত

করার অভিযোগে তালিবানরা আফগান প্রতিরোধের নায়ক আব্দুল হকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। ৯ নভেম্বর তালিবান সৈন্যরা নর্দার্ন এ্যালায়েন্স তাদের নতুন মিত্রদের জন্য মাজার-ই-শরীফ ছেড়ে দেন। ১৩ নভেম্বর তালিবানরা কাবুল থেকেও তাদের সৈন্য তুলে নেন। পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা সমস্ত আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করেন।

আফগানিস্তানের বর্তমান সংঘাতঃ

ইতিহাসের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর ইদানিং প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে নতুন সাম্রাজ্যবাদী ও পূঁজিবাদী দল ইঙ্গ-মার্কিন ক্রুসেডাররা। অতীতের দখলদার বাহিনীর মতো একবিংশ শতাব্দির ঊষালগ্নে আজ নতুন সভ্যতাসম্পন্ন মানববিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন জোটও চালিয়েছেন সন্ত্রাসী তৎপরতা। তারা অতীতের ভারতীয় মৌর্য, রক্তাশ্র, চেঙ্গিস খান ও রাশিয়ান জারদের চেয়েও জঘন্য চরিত্র নিয়ে আজ আফগানিস্তানে হানা দিয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান সংঘাতের বড় একটা কারণ হলো, চৌদ্দশ' বছর আগের মদীনার মুসলিম শাসনব্যবস্থা। তখনকার যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে মদীনা শরীফে ইসলামী জীবনব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সে যুগের ইহুদী-নাসারারা তা প্রতিহত করতে পারেনি। তবে ইসলামী হুকুমত ধ্বংস করার চেষ্টা তৎপরতা চালিয়েছে সদাসর্বদা। তারপরও যুগে যুগে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কোনো না কোনোভাবে ইহুদী-নাসারা প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আজকের আফগান সংঘাতও সেই ঐতিহাসিক চক্রান্তেরই ধারাবাহিকতা। উসামা বিন লাদিন কিংবা টুইন-টাওয়ার ট্র্যাজেডি কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তালিবানদের ইসলামী হুকুমত ও আফাগানিস্তানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার প্রতি চির শত্রুতা।

অথচ সেদিনের আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী মোল্লা-মৌলভীদের বর্তমান ভূমিকা নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের সামিল। কোনো বিবেকবান লোকও একথা মানতে পারছে না যে, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দল, বুরহানুদ্দিন রব্বানীর দল কিভাবে ইহুদী-নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারলেন। পবিত্র কুরআন যেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, সেখানে তারা কিভাবে নিজের দেশকে ইহুদী-নাসারাদের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী হলেন?

আজ যারা ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তালিবানমুক্ত আফগানিস্তান দেখার জন্য কাবুল পর্যন্ত ফিরে এসেছেন। তাদের মুখেও আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাদের থুৎনীতেও সুন্নতী দাড়ি রয়েছে। তারা কিভাবে তালিবান সমর্থক মুসল্লীদের দাড়ি কেটে ফেলতে লাগলেন? তারা কেমন করে মহিলাদের ইজ্জত-আব্রু নামক বোরখা খোলে ফেলে সমস্ত বিশ্বের সামনে মহিলাদের উলঙ্গ করতে পারলেন? অথচ এরাও ইসলামের কথা বলেন। পৃথিবীতে তারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চান?

কিন্তু কোন্ ইসলাম যে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চান সে বিষয়টিই স্পষ্ট নয়। তাদের কেউ কেউ বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলেন,

১)- তালিবান মুভমেন্ট সত্যিকার অর্থেই খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো কি-না তা পরীক্ষা করতে হবে।

২) তালিবান আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই জিহাদী ভূমিকা পালন করেছে কি-না সে বিষয়টি নিয়ে মাসআলা-মাসাইল ঘাটাতে হবে।

৩) তালিবানরা একজন সন্ত্রাসীকে (উসামা বিন লাদিন) কেন্দ্র করে একটি দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের যতেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

৪) তালিবানদের দাবী অনুযায়ী আফগানিস্তানে প্রকৃত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, নাকি শাসনদন্ডে মানুষ ভীত ছিলো, সেটাও বিচার্য। কারণ- পত্র পত্রিকার রিপোর্টে তো আসল সত্য অন্যরকম বলে মনে হয়। বিবিসি, সিএনএন, রয়টার ইত্যাদি সংস্থাগুলোর সংবাদ তো আর একেবারে মিথ্যা হবার কথা নয়।

উল্লিখিত সন্দেহ ও বক্তব্যগুলোর উত্তর কিন্তু আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় পাওয়া যাবে। তারপরও আমরা উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব চেয়ে বিশ্বের অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ দেওবন্দ মাদ্রাসায় মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জবাবে বলেছেন, “তালিবান আন্দোলন পুরোটাই শরীয়ত সম্মত।” তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তালিবান আন্দোলন ও উসামা বিন লাদিন প্রসঙ্গে যারা আজও সন্দেহজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাদের ঘাড়ে মুদ্রাদোষের ভূত সওয়ার হয়েছে।

سوال : بذریعہ ای میل　　　مؤرخہ: ۲۳/۵/۲۰۰۵ء　　　(حوالہ نمبر: ۲۲۱۸)

۲۴ ستمبر ۱۹۹۴ء میں طالبان کی پہلی تحریک شروع ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے لڑائی کو کیا جہاد کہا جا سکتا ہے؟ (جن سے لڑائی ہوئی ہے کیا ہم کو ان کو منافق کہہ سکتے ہیں؟)

براہ کرم، میرے سوالوں کا جلد از جلد جواب دیں، کیوں کہ سلفیوں کا کہنا ہے کہ طالبان خلافت صحیح نہیں۔ مجھے فتوی چاہیے، میں اسے طبع کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ!　　　والسلام

(فتوی: ۱۸۷/ک=۷۰۳/و)

الجواب : شرعاً جہاد وہ کہلاتا ہے کہ جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو اور اس سے محض اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ اس کسوٹی پر پرکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی واقفیت کیلئے ملاحظہ فرمائیں ''سیرۃ المصطفی جلد دوم'' (از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی) کبھی اپنے لوگوں سے بھی جہاد ہوتا ہے جبکہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں جیسے منکرین زکوۃ سے حضرت ابوبکرؓ نے قتال کیا۔ قرآن میں ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی أمر اللہ۔ فقط　واللہ تعالیٰ اعلم

کفیل الرحمن
(۱۷/۴/۱۴۲۶ھ)

الجواب صحیح: حبیب الرحمن/مفتیان دارالعلوم دیوبند

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

কারণ তালিবান আন্দোলনের ভূমিকা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও যদি প্রশ্ন থাকে, তাহলে এদেরকে আর কি বলা যেতে পারে? উপমাস্বরূপ বলা যায়- ইসলামের চিরশত্রু আবু জাহিল মুমূর্ষাবস্থায় বদর প্রান্তরে পড়ে থেকেও হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে 'ছাগল রাখাল' বলে গালি দিয়েছিল। এ কথাগুলোকে কেন্দ্র করেই সম্ভবত একটি গাল্পিক উপমা তৈরী হয়েছে যে, "আবু জাহিলের মগজে যে অবিশ্বাস ঢুকেছে, তা দোযখের আগুনে জ্বললেও ধ্বংস হবে না। জাহান্নামেও কেউ যদি তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে তখনও সে বিরোধীতাই করবে।" (লেখক) যেহেতু আবু জাহিলের মৃত্যু সংবাদ শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "আলহামদু লিল্লাহ্- সে ছিলো আমার উম্মতের ফিরআউন"। (সীরাত বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩৯৫)

অতএব বিবিসি, সিএনএন, রয়টার ইত্যাদির তথ্য ও রিপোর্টগুলো আজকের কিছু সংখ্যক মুসলিম মগজে পূর্ণ সত্য হিসেবে ঢুকেছে। সুতরাং এদের সামনে পবিত্র কুরআন-হাদীসের শত শত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও তারা বিশ্বাস করবেন, কিন্তু মানবেন না।

এইজন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে তাদের (ইহুদী-খৃষ্টান) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।"

মুনাফিক প্রসঙ্গ

মুনাফিক শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তবে প্রাচীণ আরবে মুনাফিক শব্দের ব্যুৎপত্তিকে মেঠো ইঁদুরের গর্তের প্রকাশ্য ও গোপন প্রবেশদ্বার অর্থে ব্যবহার ব্যবহৃত হতো। অবশ্য আবিসীনীয় অর্থে ধর্মদ্রোহীকে মুনাফিক বলা হয়। যেহেতু এই মুনাফিক শব্দটি নাফাকা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নাফাকা শব্দের অর্থ দ্বিধা-বিভক্ত হওয়া, দুর্বল বিশ্বাসী, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দিহান ইত্যাদি। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃঃ ২১৭)

মুনাফিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত কাতাদাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুনাফিকের অবস্থা এই যে, তাদের মুখ পৃথক, অন্তর পৃথক, কাজ পৃথক, বিশ্বাস পৃথক, সকাল পৃথক, সন্ধ্যা পৃথক, তারা নৌকার মতো যা বাতাসে কখনও এদিকে ঘুরে কখনও ওদিকে ঘুরে। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খন্ড মুনাফিক প্রসঙ্গ)

পবিত্র কুরআনে মুনাফিক সম্পর্কে সরাসরি যেসকল আয়াত নাযিল হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ-

(১) মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা বিশ্বাসী নহে। (সূরা বাকারা আয়াত- ৮)

(২) আল্লাহ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজদিগকে ছাড়া ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝে না। (সূরা বাকারা আয়াত -৯)

(৩) তাদের হৃদয়ে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। (সূরা বাকারা আয়াত- ১০)

(৪) তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। (সূরা বাকারা আয়াত -১১)

(৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আনো, তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো? সাবধান এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। (সূরা বাকারা আয়াত- ১৩)

(৬) এবং যা তারা করে না, তা বলে। (সূরা শূআরা আয়াত -২২৬)

(৭) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আর উহাদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র। (সুরা বাকার আয়াত- ১৪)

(৮) তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এসো, ও রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। (সুরা নিসা আয়াত- ৬১)

(৯) যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদদিয়ে কাফির লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ শুনয়ে দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। উহারা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকটে যায়? অথচ সম্মান তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য। (সুরা নিসা আয়াত- ১৩৮-৩৯)

(১০) এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকার প্রতিফল প্রদান করবেন। উহারা যখন নামায পড়ার জন্য উঠে তখন অনিচ্ছা ও শৈথিল্য সহকারে শুধু লোক দেখানোর জন্য করে এবং আল্লাহ্কে তারা কমই স্মরণ করে। উহারা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে, না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্য আপনি কখনও কোনো পথ পাবেন না। (সুরা নিসা আয়াত-১৪২-১৪৩)

(১১) নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (সূরা নিসা আয়াত- ১৪৫)

(১২) মুনফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পর অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভালো ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হস্ত ফিরিয়ে রাখে। উহারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ্ও তাদের ভুলে গিয়েছেন। এ মুনাফিকরাই হলো ফাসিক। (সূরা তওবা আয়াত-৬৭)

(১৩) এই মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে, উহাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (সূরা তওবা আয়াত- ৬৮)

(১৪) এ মুনাফিকরা ভয় পায় যে তাদের সম্পর্কে এমন কোনো সূরা যেনো নাযিল না হয়,

যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দিবে। হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, আচ্ছা খুব করে ঠাট্টা বিদ্রুপ করো। আল্লাহ্ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয় করো। (সূরা তওবা আয়াত- ৬৪)

(১৫) হে নবী! কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তওবা আয়াত - ৭৩)

মুনাফিক প্রসঙ্গে হাদীসঃ

(১) হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি- ১) কথা বললে মিথ্যা বলে। ২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। ৩) আর তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর স্বভাব থেকে যায়। ১) তার কাছে কোনো আমানত রাখলে, সে তার খেয়ানত করে। ২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। ৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বুখারী)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন দু'টি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। ১) সুস্বভাব। ২) দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

(৪) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয়, যারা কথা বলে সুকৌশলে, আর কাজ করে যুলুমের সাথে। (বাইহাকী)

মুনাফিক প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের ভাষ্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে মুনাফিকী আচরণ মানুষকে কতো নিকৃষ্টতম স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। এই জন্যেই আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সংগ্রাম আমার স্বভাব" অর্থাৎ মুনাফিকী আচরণ থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে হলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। আর সে সংগ্রামের ক্ষেত্র হচ্ছে রক্ত-মাংশের শারীরিক অবকাঠামো, উদ্দেশ্য হচ্ছে নফস্ এবং শত্রুতা হচ্ছে প্রবৃত্তির সাথে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলেন, "পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম করো এই ভেবে যে, এখানে তোমাকে চিরকাল জীবিত থাকতে হবে। আর পরকালের জন্য আমল করো এই কল্পনা করে যে, আগামীকালই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।" কিন্তু আজকের মুসলমানদের এই অভিধা থেকে সরিয়ে অন্য পথে পরিচালিত করা হচ্ছে সুকৌশলে।

নতুন প্রজন্ম কিভাবে মুনাফিকী আচরণের শিকার

মারইয়াম জামীলা নামী এক মহিলা 'ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেছেন। লেখিকা তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখেন, 'আমার জন্ম ৪৬ বছর আগে নিউইয়র্ক শহরের কাছাকাছি এক মনোরম সমৃদ্ধ শহরতলীতে। পূর্বতন নাম মার্গারেট মার্কাস। আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জার্মান। জন্মসূত্রে ইয়াহুদী হলেও আমার মা কিংবা বাবা ধর্মচর্চার দিকে যান নি। কেবল নামমাত্র ইয়াহুদী ছিলেন। আমার বড় বোনের মতো আমিও এক বিচিত্র মার্কিন পরিবেশে বড় হই। আর স্থানীয় সরকারি স্কুলে থেকে পাই সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর যখন প্রায় সমস্ত খৃষ্টান রাষ্ট্র বা সমাজ সেমিটিক ধর্ম-বিরোধী খৃস্টের দু'হাজার বছর শাসনের দাবী ছেড়ে দেয় এবং ইয়াহুদী সমাজের পুনর্বাসনের পিছনে লাগে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, তখন আমি আর আবেগ-তপ্ত হয়ে নিজেকে ইয়াহুদী বলে সনাক্ত করতে পারলাম না। দীর্ঘ দশ বছরের একটি কর্মসূচী হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করি।

ইসলাম নিয়ে যতো পড়াশুনা করি, ততই আমার বিশ্বাস জন্মে যে, অসংশয়ে ইসলাম গ্রহণই কেবল ধর্মপ্রাণতা এবং আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতার একমাত্র পথ নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ওষুধও বটে। ইসলামী শিক্ষাধারার মতে জীবন কোনো প্রমোদ-ভ্রমণ নয়, পরীক্ষা। জীবনের মিনিটে মিনিটে আল্লাহ্ আমাদের ঈমানের বা ঈমান-চ্যুতির পরীক্ষা নিচ্ছেন। এভাবে আমরা দুনিয়ায় যে কষ্ট সহ্য করি, তা কোনো প্রতারণামূলক বিপর্যয় নয়। সেসব পরীক্ষারই অঙ্গ। আল্লাহ্ আমাদের সুখ-সম্ভোগের জন্য এখানে (দুনিয়াতে) রাখেন নি, রেখেছেন আমরা তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ হই তা দেখার জন্য। পরকাল না আসা পর্যন্ত যার চুড়ান্ত ফল জানা যাবে না।'

মারইয়াম জামীলা'র 'ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ' নামক পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ সালে। পুস্তকখানি অনুবাদ করেছেন আবদুর রাকিব। বাংলা অনুবাদ সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ২০০১ কলিকাতা থেকে। মাত্র দেড় শ' পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানির উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "এই বইখানি উৎসর্গ করা হল- ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের এবং বাইরের কলেজ-ইউনিভার্সিটির সমস্ত মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যাতে তারা তাদের ধ্বংসের যে চক্রান্ত চলছে, তার একটা পুরো ধারণা পেতে পারে।"

পুস্তকখানির ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'আধুনিকীকরণের আগে গতানুগতিক মুসলিম সমাজের বর্ণনা করতে গিয়ে পশ্চিমী পন্ডিতেরা এর 'পশ্চাদ্‌গামিতা' এর 'নিশ্চলতা'র উপর বসবাস করতে ভালোবাসেন। এগুলি নিগ্রহমূলক ঐতিহ্যের দাসত্বের ফল- যা দীর্ঘদিন ধরে এসবের প্রয়োজনীয়তাকে টিকিয়ে রাখে। বড় জোর তারা ইসলামী শিক্ষাধারাকে সপ্তম শতকীয় আরবের অনুন্নত বেদুঈনদের উপযোগী বলে বর্ণনা করেন। যদিও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকেরা এখন সাধারণভাবে হাজার বছর আগের ইসলামী সভ্যতার মহত্ত্ব স্বীকারে আগ্রহী এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চায় এর অবদানের কথা ঈর্ষান্বিতভাবে স্বীকার করেন, তবুও তারা নিশ্চিত ভাবে বলেন যে, মুসলিম গৌরব চির অস্তমিত। ১৩ শতকের পর থেকে ইসলামের সৃজনশীলতা

চরমভাবে পর্যুদস্ত। গতানুগতিক মুসলিম সমাজের 'সেকেলে' জীবন পদ্ধতিকে আজকের দারিদ্রজর্জর, অজ্ঞ, ব্যধিগ্রস্ত, অনুভূতিহীন এবং পশ্চাৎপদ্ মুসলিম দেশগুলির দুর্বলতার জন্য দায়ী করা হয়। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত, অগ্রগতির একমাত্র পথ হলো বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চিমী বস্তুবাদ গ্রহণ।

পশ্চিমী দুনিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে ক্রমবর্ধমান জড় জ্ঞানায়ূগ প্রয়োগ করে। বিদগ্ধ মহলে ইসলামের উপর বোমা বর্ষণ করার জন্য কম করে আটটি মার্কিন ও ইউরোপীয় সাময়িকী পুরোপুরি নিযুক্ত। বিশেষ করে দুখানি সাময়িকপত্র আঘাত করে ইসলামী পাঠ গবেষণার উপর। প্রথমগুলি হলো, দ্যা মুসিলম ওয়ার্ল্ড (হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট), মিডিল ইষ্ট ষ্টাডিজ (নিউইয়র্ক), দ্যা মিডিল ইষ্ট জার্নাল (ওয়াশিংটন ডিসি), জার্নাল অফ দ্যা অরিয়েন্টাল সোসাইটি (নিউ হ্যাভেন, কানেকটিকাট) এবং আমেরিকান নিয়ার ইষ্টার্ণ ষ্টাডিজ (শিকাগো)।

পশ্চিমী প্রকাশনালয়গুলি ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক রচনাবলী ছাপে সুদৃঢ় সাহিত্য-শাখার মতো। ইসলামের প্রতি পশ্চিমী মনোভাবের বিরুদ্ধবাদী পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন ফুটে উঠে। যেমন- পবিত্র কুরআন মুহাম্মদের রচনা। হাদীস সাহিত্য জাল, ইসলাম অমার্জিত বেদুঈনদের সামান্য একটি আর্থ-রাজনৈতিক বিস্ফোরণ, কোন ধর্মীয় আন্দোলন নয়। ইসলাম বিজিত জাতির শৈল্পিক সৃজনশীলতার শ্বাসরোধ করেছিল। ইসলাম বর্তমান মানুষের বর্তমান রীতি অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অদৃষ্টবাদী অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক, অনাধুনিক এবং বিকাশবিরোধী। খৃষ্টানধর্ম যে সংস্কার গ্রহণ করেছিল, ইসলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুরূপ সংস্কারের প্রয়োজনের মুখে। ইসলামে সেরা বস্তু হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদসহ সূফীবাদ যা শরীয়তবিরোধী। যা জোর দেয় মানুষের পতন-স্খলনের উপর। আর সে মানুষের প্রয়োজন হয় এক ত্রাণকর্তা প্রভুর। যুদ্ধপ্রিয় একচেটিয়াবাদী সুন্নী তত্ত্বকে সে অস্বীকার করে। আর, সর্বোপরি ইসলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নিকৃষ্টতর নৈতিক স্তরে যাতে রয়েছে জান্নাতের বস্তুবাদী ধারণা, স্ত্রীলোকের নিম্নতর অবস্থান-স্তর। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ-এটা শিল্পায়ন বিরোধী। মদ বিরোধী নীতি সভ্যতা ও আধুনিক উদারতার পরিপন্থী। এর মতাদর্শ প্রগতিবিরোধী। ইসলাম-এ দুঃস্থ পরাজিত লোকজনকে মানসিক বাতুলতার দিকে চালিত করে এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ রয়েছে তাদের পক্ষে এবং তিনিই ইতিহাসের রচনাকারক- বস্তুত প্রতিটি পশ্চিমী প্রকাশনায় ইসলামের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সভ্যতার এইসব মিথ্যাচারিতা সাম্প্রতিক হয়ে প্রকাশ পায়।'

লেখিকা অন্যত্র লেখেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রাচ্যবিদ এবং খৃষ্টান মিশনারিরা ব্যক্তি-মুসলিমের পরিবর্তন প্রয়াস এবং তাদের স্বমতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ব্যাখ্যার সাহায্যে এবং ভেতর থেকে এর পুনর্গঠনের সংগঠিত আন্দোলন চালু করে খোদ ইসলামকেই পরিবর্তিত করার প্রয়াস গ্রহণ করে। একজন মিশনারী লিখেন, মিশনারীকে যদি সশ্রদ্ধ ও বিনয়ী মনোভাবের প্রতি সংদেবনশীল হতে হয়, যেখানেই তা দেখা যায়, তাহলে তাকে ইসলামের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে অবশ্যই সংবেদনশীল হতে হবে। আর যেখানে তা সম্ভব ও উপযোগী বলে মনে হবে, সেখানেই তাদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংস্কার আন্দোলন হলো বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মীয় শিক্ষাধারার

পুনর্ব্যাখ্যার, কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতার সাথে ব্যাখ্যা করার অকপট প্রয়াস। আর এইজন্যই এগুলি মিশনারীদের জন্য প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা সম্ভব যে, এই সংস্কার আন্দোলনের কোন একটির আরও বেশি তাৎপর্য ফুটে উঠবে খৃষ্ট সম্বন্ধে মুসলিমদের চূড়ান্ত উপলব্ধির ফলস্বরূপ- যা আপাতত কল্পনাও করা যায় না। এমনও হতে পারে পরবর্তী কয়েক বছরের মাথায় মুসলিম দেশগুলিতে মিশানরীদের মুখ্য অবদান হবে ততটা ব্যক্তি-মুসলিমের ধর্মান্তর নয়, যতটা হবে খোদ ইসলামেরই ধর্মান্তর। এখানে রয়েছে একটি সুযোগ ক্ষেত্র। আর তা হেলায় নষ্ট করা যাবে না। একজন খৃষ্টান মুসলিমকে ভালোবাসবে কিন্তু ঘৃণা করবে ইসলামকে- এর প্রয়োজন রয়েছে কি না- তা হবে সমীক্ষার একটি আকর্ষণীয় দিক। কিংবা ইসলামকেও ভালোবাসতে হবে কি না, তা-ও দেখতে হবে। আর এর পুনর্জন্মের জন্য কাজ করতে হবে।'

প্রাচ্যবিদদের প্রায় সমস্ত সাম্প্রতিক রচনায় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।"

উপরোক্ত মন্তব্য ও বক্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে আজকের একজন শিক্ষিত মুসলিমকে মুনাফিক বানানোর জন্য এর চেয়ে বড় পরামর্শ আর কি হতে পারে? উন্নত দেশের একজন খৃষ্টান বা অমুসলিম লোক যদি একজন মুসলিমকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা দেখিয়ে ইসলামের প্রতি ঘৃণা দেখায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি মুনাফিক হতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। বিশেষ করে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম তরুণ সমাজে তো এর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত ফলপ্রসু।

উদাহরণস্বরূপ- এইচ এ আর গিবের 'মডার্ণ ট্রেন্ট ইন ইসলাম' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। তরুণতর প্রাচ্যবিদ যারা ইসলাম-বিষয়ে কাজ করতে চান, তাদের কাছে এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য তথ্যসূত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এইজন্য ১৯৭২ সালে নিউইয়র্ক থেকে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হয়। এইচ এ আর গিবের গ্রন্থে সৈয়দ আমীর আলী ও আল্লামা ইকবালের অনেকগুলো উদ্ধৃতি টেনে ইসলামের আধুনিকীকরণের যথেষ্ট যুক্ততর্কের উপস্থাপন করা হয়েছে। এইচ এ আর গিবদের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু এটাই যে, আজকের মুসলমানকে আধুনিকতা শিক্ষা দেবার পরিবর্তে 'ইসলাম'কে আধুনিকীকরণ করা হোক। আল্লামা ইকবালের 'রিকন্‌ষ্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস্ থট ইন ইসলাম' গ্রন্থ থেকে এইচ এ আর গিব তার গ্রন্থে উদ্ধৃতি দেন, "আমি জানি ইসলামের উলামা সম্প্রদায় মুহাম্মদী আইনের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ততার দাবি করেন। কিন্তু সবকিছুই বদলাচ্ছে। মানবীয় ভাবনার সর্বতোমুখী অসাধারণ বিকাশে যে নবশক্তির মুক্তি ঘটেছে, তার সঙ্গে আজকের ইসলামী দুনিয়ার সংঘাত দেখা দিয়েছে। আর নবশক্তির প্রভাবও পড়েছে তার উপর। তাই ইসলাম অপরিবর্তনীয়- এই মনোভাব এখনও কেন ধরে রাখতে হবে, আমি তার কোন কারণ দেখতে পাই না। আমাদের মাজহাব প্রতিষ্ঠাতারা কি তাঁদের যুক্তিকারণাবলী ও ব্যাখ্যার চূড়ান্ততা কখনও দাবি করেছিলেন? কখনই না। আজকের উদারপন্থী মুসলিম প্রজন্মের দাবি হল, তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মৌলিক বৈধ নীতিগুলিকে পুনরায় ব্যাখ্যা করা। আর, আমার মতে, আধুনিক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত" (পৃঃ ১৫৯-১৬০)

এইচ এ আর গিব অন্যত্র সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'দ্যা স্পিরিট অফ ইসলাম" গ্রন্থ থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি টানেন, "মুহাম্মদ পর্দার সুবিধার কথা উপলব্ধি করেন। হতে পারে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপক শৈথিল্য লক্ষ করে তিনি স্ত্রীলোকের জন্য গোপনতা পালনের সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ এখনকার অস্থিতিস্থাপক রূপ পরিগ্রহ করুক, এটা কখনও তাঁর ইচ্ছায় ছিল, কিংবা তিনি কখনও স্ত্রীলোকের গোপনতা অবলম্বনের অনুমতি বা আদেশ দেন. এটা মনে করা তাঁর সংস্কার-উদ্যমের পরিপন্থী।" (পৃঃ ৯৫)

মারইয়াম জামীলা'র 'ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ' নামক পুস্তকে উল্লিখিত 'মডারেট ইসলাম'পন্থীদের মুখোশ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি প্রাচ্যের ষড়যন্ত্রের পর্দাও ফাঁস হয়েছে। অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, মুনাফিক প্রসঙ্গে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। যুক্তির দিক থেকে এই বিন্যাসটি অপ্রাসঙ্গিক না-ও হতে পারে। কারণ, মুনাফিক কিন্তু কাফির নয় তবে ইসলামের জাতশত্রু বলে বিবেচিত হয়। কারণ মুনাফিক ব্যক্তি সে নিজেই নিজের শত্রু। অর্থাৎ তার শত্রুতা ইসলামের জন্য নয়, বরং নিজের জন্য। সে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, অথচ প্রতারণা করে নিজের সাথে। যেহেতু- তার কথা ও কাজে মিল নেই বলে সে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এসো, ও রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।" (সুরা নিসা আয়াত- ৬১)

মহান আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন, "উহারা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে, না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। (সুরা নিসা আয়াত-১৪৩ অংশ বিশেষ)

মুমিন প্রসঙ্গঃ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৯)

উক্ত আয়াতখানার মাধ্যমে 'জিহাদ প্রসঙ্গ'-এর আলোচনা শুরু হয়েছিলো। একই আয়াতখানা দিয়ে 'মুমিন' সম্পর্কেও আলোকপাত করতে চাই। আয়াতখানা নাযিলের, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মুজাহিদদের আন্তরিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির উপলক্ষ্য আগেই আলোচিত হয়েছে। এমনকি, আয়াতের বাক্যগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, দূর ভবিষ্যতেও যদি কেউ সত্যিকার মুমিন হতে পারে তাহলে সে অবশ্যি জয়ী হবে। ওহুদ যুদ্ধের দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর পর আফগানিস্তানের মুজাহিদ বিপ্লবেও এর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার তাবৎ হক্কানী উলামায়ে কেরাম একমত যে, আশির দশকে সংঘটিত আফগানিস্তানের জিহাদ ছিলো পরিপূর্ণ ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তা রক্ষার সংগ্রাম। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে- মুমিনদের আজন্ম জিহাদে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়ের বাস্তবতা।

সুতরাং ইসলামে মুমিন ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়তো হবে না। তবু দু'চারটে কথা বলা উচিত।

প্রথম ওহী নাযিলের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু পাশে বসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন। নানা প্রশ্ন দেখা দিলো তাঁর অন্তরে। ইতোমধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর ঘুমে পড়ে গেছেন। তিনি ঘরের বাইরে এসে দু'দন্ড চিন্তা করলেন।

তারপর হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু দ্রুতপদে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের শরণাপন্ন হলেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফল তাঁর চাচাতো ভাই। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিলের বিস্তারিত ঘটনা ব্যক্ত করলে ওয়ারাকা বললেন, "যে মহা সত্তার নিকট আমার জীবন, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, হে খাদিজা! তুমি যা বলছো যদি সেভাবেই (জীবরাঈল আঃ) এসে থাকেন, তা হলে হযরত মূসার আলাইহিস সালাম নিকট যিনি এসেছিলেন তিনি সেই ফিরিশ্তা। তিনি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই উম্মতের নবী। তাঁকে বলে দাও, তিনি যেনো বিপদ-আপদে ঘাবড়ে না যান। তিনি যেনো অটল থাকেন।"

হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কণ্ঠে একটা আশার বাণী শুনে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো ঘুমুচ্ছেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘুমন্ত স্বামীর পাশে বসে পড়েন। প্রীতিময় দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেলো। পবিত্র কপাল মুবারক ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন। এ কম্পন ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিলের বিশেষ অবস্থা। এ সময় আয়াত নাযিল হলো।

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো, সতর্কবাণী প্রচার করো এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর তোমার ভূষণ পবিত্র করো। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। আর অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।" (সূরা মুদ্দাস্সির)

হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিশেষ অবস্থা দেখে খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আরাম করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিনীকে বললেন, "খাদিজা! ঘুম ও আরাম করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে তাঁর (আল্লহ্র) ইবাদত করার আহ্বান জানানোর জন্য, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। কিন্তু খাদিজা, আমি কিভাবে এই আহ্বান জানাবো? কে আমার এই আহ্বানে সাড়া দিবে?"

এ কথাগুলো শুনে হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আপনি অটল থাকুন। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত খাদিজার রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিচ্ছিদ্র ভালোবাসা, আন্তরিক বিশ্বস্ততা যখন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে বিকশিত হলো, এতে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন।

কিন্তু তারপরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে নানা প্রকার চিন্তা। কিভাবে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন ইত্যাদি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। খানায়ে-কা'বার পাশে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের সাথে দেখা হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওফলকে ওহী নাযিলের বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফল তাঁর কথাগুলো শুনে মন্তব্য করলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি এই উম্মতের রাসূল। যে নামূস বা জিবরাঈল ফিরিশ্‌তা মূসার আলাইহিস সালাম নিকট এসেছিলেন, তিনিই আপনার নিকট এসেছেন। মানুষ আপনাকে মিথ্যা প্রতিপণ্ন করবে। কষ্ট দিবে। এই শহর থেকে নির্বাসন করবে। আপনার সাথে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে সত্যের সহায়তা করবো।"

এই কথাগুলো বলে ওয়ারাকা ইবনে নওফল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ললাট মুবারকে চুমু দেন।

তারপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হচ্ছে কিন্তু ওহী আসছে না। তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ওহী নাযিল হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, ওহীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানানোর কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মহিমা! এ সময় ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কোনো পয়গাম বা খরব নিয়ে আসছেন না। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরবতা অবলম্বন করেন। তিনি মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দেন। তাঁর মন-মানসিকতায় অনেকটা ওহী নাযিলের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসে। প্রায় পৌনে তিন বছর সময় অতিবাহিত হলো, তবু ওহী আসছে না। হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানসিক অবস্থা দেখে একদিন বললেন, "আপনি কি মনে করছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে ভুলে গেছেন?"

হযরত খাদিজার রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় হিরা গুহায় চলে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন, "হে আল্লাহ্‌ ! রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে নির্বাচিত করে আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন?"

এদিকে হযরত খাদিজাও রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘরে বসে নানা চিন্তা-ভাবনা করছিলেন।

একদিকে, সমাজে বর্বরতার চুড়ান্ত পরিবেশ। মানুষ কেবল মানুষের আকৃতি নিয়ে জীব-জন্তু সদৃশ জীবন-যাপন করছে। অন্যদিকে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনের প্রারম্ভিক নির্দেশ। তারপর

আর কোনো নির্দেশনা, যোগাযোগ নেই। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ চিন্তিত। এই দিনগুলোতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো মৃত্যু কামনা করতেন। আবার কখনো রিসালাতের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে ধ্যানে মনোনিবেশ করতেন। হঠাৎ একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানসিক দুঃশ্চিন্তা মনদ্বন্দ্বের অবসান হলো। ওহী নাযিল হলো, "এবং পূর্বাহ্নের শপথ এবং রাত যখন নিঝুম হয় তার শপথ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি এবং তোমাকে আশ্রয়দান করেছেন। তিনি তোমাকে পথহারা (চিন্তামগ্ন) পান, অতঃপর পথ-নির্দেশ করেন।" (সূরা দু'হা)

ইসলামের দাওয়াত শুরু করার অনুমতি এসে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘরে নামায আদায় করছেন। এমন সময় বালক হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে নামাযের দৃশ্য দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি জীবনে কখনো এমন রুকু-সিজদার স্বরূপ দেখেন নি। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কার উদ্দেশ্যে সিজদা করছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী! আমরা মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সিজদা করছি। তিনি আমাকে নুবূয়ত দান করেছেন। তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, "হে আলী! তুমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করো। আমার নুবূয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। লাত, মানাত এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করো না।" এই সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন। এতে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, "আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার অনুমতি দিন।"

এ কথাগুলো বলে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। নানা মনোকল্পে সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো বালক হৃদয়ে অত্যন্ত রেখাপাত করলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা কথা চিন্তা করলেন। সকালে উঠেই তিনি নিজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, 'এ ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আবূ তালিবের (হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর পিতা) পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এই মহান আল্লাহ্র উপাসনার ব্যাপারে কেনো আমি আবূ তালিবের মতামত গ্রহণ করতে যাবো?'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমতঃ মুমিনের জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল সবচে বেশি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ নামায! নামায হচ্ছে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সামনে অবনত মস্তকে সিজদা করা। অর্থাৎ চিরস্থায়ী, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী একটি মতবাদ সৃষ্টির সর্বপ্রথম শপথ গ্রহণের স্বীকৃতি। তৃতীয়তঃ কারো সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা অন্য কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ করেন না। হযরত আলী (রা)-এঁর কণ্ঠে

যা উচ্চারিত হয়েছে।

অতএব মুমিন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় নসিহত বা পরামর্শ আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা তো স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, "নিঃসন্দেহে পরকাল ইহকালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" সুতরাং ইহকালের ঐশ্যর্য হাসিলের ধান্ধায় পরকাল নষ্ট করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে- পরকাল বাদ দিয়ে (বা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে) ইহকালের জীবন-যাপন অর্থ 'মুমিন' এর বিপরীত, অর্থাৎ মুনাফিকী। আর নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর সময় পরকালের চিন্তা এবং বাকী জীবনটা ইহাকালের ধান্ধায় কাটানোও মুমিনী জীবন-যাপন নয়। বরং এটাকে একপ্রকার ধোকা বলা যেতে পারে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতের মর্মবাণী এটাই যে, যারা শুধু ইহকাল চায়, তাদেরকে কেবল ইহকালই দান করা হয়। আর যারা ইহকাল ও পরকাল চায়, তাদেরকেও শুধু ইহকাল দেওয়া হয়। কিন্তু যারা একমাত্র পরকালের চিন্তা সারাক্ষণ মাথায় নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জন করতে চায়, তাদেরকে ইহ-পরকাল অর্থাৎ দু'টোই দান করা হয়। আর এরাই হয় প্রকৃত মুমিন।

আজকাল সভাসমিতিতে এক শ্রেণীর কিছুসংখ্যক আলিম-উলামা বক্তৃতা-বয়ানে উচ্চারণ করেন, "রাব্বানা আতিনা ফীদ্দুনিয়া হাছানা, ওয়াফিল আখিরাতি হাছানা।" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! আমাকে দুনিয়ার শান্তি দান করো এবং আখিরাতের শান্তিও দান করো।' এই দু'আ বাক্যের ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয় যে, 'আল্লাহ্ তআলাই মানুষকে আগে দুনিয়ার শান্তি এবং পরে আখিরাতের শান্তি চাওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আজকের মুসলমানগণ আগে দুনিয়াবী সুখ-শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে জীবন-যাপন করবেন এবং পরে আখিরাতে শান্তির কামনা-বাসনা রাখবেন।'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক এই দু'আ শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, "তিনি তোমাকে পথহারা পান, অতঃপর পথ-নির্দেশ করেন।" অর্থাৎ মানুষ যেনো দুনিয়ার শান্তি বলতে সুপথের দিশা কামনা করে, যাতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষগুলোকে পরকালের চিরশান্তিময় পথ দেখিয়ে দেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা একই আয়াতের প্রথমে বলেছেন, "তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

প্রত্যেক মুমিনের জন্য তো এই সন্তুষ্টি কামনা করাই সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে সন্তুষ্টির অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে পরকালের শান্তি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ।

কিন্তু আজকের মানুষ বিষয়টাকে ঘুরিয়ে দুনিয়ার চক্করে বিচরণ করছেন। এটা সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, মুমিন না হলে কোনোক্রমেই পরকাল কিংবা বিজয় লাভ করা যাবে না। জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে বিজয়ী হতে হলে মুমিন হতে হবে। এটাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন রাখে। এটা সংগত নয়, তোমরা শীগগিরই তা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীগগিরই তা জানতে পারবে। তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই

চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।” (সূরা তাকাছুর আয়াত ১-৮)

উক্ত আয়াতের কিছু কিছু শব্দ তো স্পষ্টই বলে দিচ্ছে, দুনিয়ার চক্করে মোহাচ্ছন্ন হওয়া সঠিক নয়। বরং দুনিয়াকে আখিরাতের পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এটাই মুমিনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফতের মিম্বরে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথম ভাষণ বলেন, “ভাইসব! আমাকে আপনাদের আমীর বা নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের উপর আমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আমি যদি ভালো কাজ করি, আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন। আমি যদি ভুল-ভ্রান্তি করি আমাকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করবেন। আপনারা মনে রাখবেন, সততা হলো আমানত আর মিথ্যার অপর নাম হচ্ছে ‘খেয়ানত’। আমার নিকট আপনাদের দুর্বল ব্যক্তিটিও শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য পাওনা দিতে পারি। আপনাদের শক্তিশালী লোকটিও আমার নিকট অত্যন্ত দুর্বল যতক্ষণ না দুর্বলের পাওনা তার থেকে আদায় করে দিতে পারি। (বন্ধুগণ) স্মরণ রাখবেন, যে জাতি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম থেকে সরে পড়ে, আল্লাহ্‌ সে জাতিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর অপ্রত্যাশিত বিপদ অবতীর্ণ করেন। (হে মুসলমানগণ) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত থাকি আপনারাও আমার অনুগত থাকবেন। আমি যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করি, আমার আনুগত্য থেকে আপনারাও মুক্ত। এখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।”

হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার এক’শ তেইশ বছর পর আব্বাসীয় শাসক আল-মনসুর রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জন করে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, “হে মানুষ! আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে আমাকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করেছেন। রাজ-ক্ষমতার দ্বারা আমি তোমাদের সোজা পথে পরিচালিত করতে পারি। আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর ধন-সম্পদের রক্ষক বানিয়েছেন। আমি তাঁর ইচ্ছা মতো তা খরচ করতে পারি। কারণ আল্লাহ্‌ই আমাকে এই অধিকার দান করেছেন। তিনি যদি চান আমি তাঁর দেয়া ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য খরচ করবো। আর যদি তাঁর ইচ্ছে না হয়, তাহলে আমি তা তোমাদের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবো।” (মহানবী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর জীবন চরিত পৃষ্ঠা ৭৬)

উপরোক্ত দু’টো বক্তব্যের তারতম্য নিজ থেকেই সুস্পষ্ট যে, একটি ছিলো- দুনিয়ার মানুষকে মুমিনী জীবন-যাপনের প্রতি উৎসাহিত করা। আর অপরটি ছিলো মুসলমাদের উপর অস্ত্রের ঝংকার দেখিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

এবার দেখা যাক চৌদ্দ’শ বছর পর আরেক নেতার বক্তব্যের স্বরূপ। তিনি তালিবান খিলাফতের মুজাহিদ আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, “চৌদ্দ বছরের সংগ্রামের বিনিময়ে আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আফগান মুজাহিদদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিলো না। আফগান নেতারা বিশেষ করে, বুরহানউদ্দিন

রব্বানী, হেকমতিয়ার, আহমদ শাহ্ মাসুদ এবং অন্যরা ক্ষমতার লোভে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান অশান্তির নিদর্শনে পরিণত হলো। বেআইনী কর্মকান্ড ও সংঘর্ষ চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে গেলো। বাইতুল্লাহ্‌র হরমে বসে যে চুক্তি করা হয়েছিলো, তা-ও অমান্য করা হলো। এই অবস্থায় কিছু উলামায়ে কেরাম কান্দাহারে সমবেত হলেন। শপথ করলেন- যেভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে ইখলাস ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে রাশিয়ার মতো পরাশক্তির সাথে জিহাদের সূচনা করেছিলেন, সেভাবে দেশের সন্ত্রাসী শক্তিগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। সমাজে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে, সাধারণ মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, নারীদের সম্ভ্রমের হিফাজত করতে এবং আফগানিস্তানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে আফগানিস্তানের মাটিকে ইসলামী শাসনের এক উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা এই সুন্দর নিয়তকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং অতি দ্রুত আল্লাহপাক আফগানিস্তানের প্রায় সবগুলো প্রদেশে তালিবানকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন। এর মাধ্যমে সন্ত্রাসী শক্তিগুলো এবং জালিম কমান্ডার ও শাসকদের হাত থেকে আফগান জাতি মুক্তিলাভ করেছে। মানুষ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারছে। শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তালিবানরা শরীয়তের পদ্ধতি অনুসারে দেশ শাসন করে যাচ্ছে। তালিবান শাসকগণ ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে শরীয়তের বিধানমতো আদালতের সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। শাসক কিম্বা প্রজা যে-ই অভিযুক্ত হোন না কেনো, ইসলামী বিধানমতো উভয়ই শাস্তির উপযুক্ত। ফলে, তালিবান শাসনের বাইরের এলাকা থেকে সাধারণ লোকেরা এসে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, তাদের অঞ্চলেও তালিবানরা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে- এতে তারা সর্বাত্মক সহযোগিতাও দিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে যে, তালিবানরা আইএসআই, সিআইএ অথবা পাকিস্তানী সৈন্যের গোপন সহযোগিতায় আফগানিস্তানে আন্দোলন শুরু করেছে। আসলে ইসলাম ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অসৎ ষড়যন্ত্র মাত্র। বাস্তবে আফগানিস্তানের সাবেক শাসকগোষ্ঠি তালিবানদের ইত্তেহাদ, বিজয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কর্মতৎপরতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। তারা আমাদের বাস্তব অবস্থা, দরিদ্রতা পর্যবেক্ষণ না করেই পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে উৎসাহিত করছে। সত্যিকার অর্থেই যদি আমেরিকা, বৃটেন কিংবা অন্য দেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ থাকতো, তাহলে আমাদের কাছে আজ সম্পদের পাহাড় থাকতো। আমরা যদি কারো এজেন্ট হতাম, তাহলে আমাদের কাছে অস্ত্রের ভান্ডার থাকতো। কিন্তু আমরা তো কোনো বিদেশী সাহায্য কিংবা সহযোগিতার তোয়াক্কা করি না। এমন কি সন্দেহজনক কারো সাথে দেখাও করি না। আমরা তো সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু-দের মতো দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য প্রদর্শন করে দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের সন্ত্রাসী শক্তিগুলোকে শেষ করে ইসলামের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তাময় শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আশাকরি দেশবাসী আমাদের সাথে থাকবেন এবং কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ

করবেন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।" (তালিবান পৃষ্ঠা, ৩৯-৪০)

উপরোক্ত তিনটি বয়ান দিয়ে কিন্তু কাউকে কারো সাথে তুলনা করা হচ্ছে না। বরং মুমিনী তৎপরতার স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মোল্লা উমরের বক্তৃতায় ঐ মর্মবাণীটি উচ্চারিত হয়েছে যা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম ভাষণে উচ্চারণ করেছিলেন, "যে জাতি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম থেকে সরে পড়ে, আল্লাহ্ সে জাতিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে, আল্লাহ্ তাদের উপর অপ্রত্যাশিত বিপদ অবতীর্ণ করেন।"

আজকের মুসলমানগণ মুমিনের দাবী করেন ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামের পথ প্রত্যাখ্যান করেন। ইল্‌ম ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে মুমিন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু হেকমতের ধূঁয়াতুলে জিহাদকে অস্বীকার করেন।

তাক্বওয়াহীন জিহাদ ও আজকের মুসলিম বিশ্ব

প্যালেষ্টাইন সমস্যাঃ

প্যালেষ্টাইনের মুজাহিদ শেখ ইয়াসিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্তর দশকের গোড়াতে একটি ভাষণে বলেছিলেন, "ফিলিস্তিনি জনতা যতোদিন পর্যন্ত তাকওয়াপূর্ণ জিহাদে আত্মনিয়োগ না করবে, ততদিন যুদ্ধ এবং রক্তপাত চলতেই থাকবে, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হবে না।" গত বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালের এক ফজর নামাযের সময় শেখ ইয়াসিনের উপর ইহুদীরা বোমা নিক্ষেপ করে। তিনি শহীদ হন।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর তাকওয়াপূর্ণ শাসনের বদৌলতেই প্যালেষ্টাইন মুসলমানদের করতলে আসে। এরপর থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যতোবার প্যালেষ্টাইন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছে, ততবারই মুসলানরা আবার জয় করে নিয়েছেন। কারণ, প্যালেষ্টাইন জাতি পৃথিবীর সবচে শিক্ষিত জাতি হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা উদ্বাস্তু জীবন-যাপন করলেও শিক্ষানুরাগ তাদের অস্থিমজ্জাগত ব্যাপার। বিশেষ করে, ইসলমী শিক্ষায় শিক্ষিত প্যালেষ্টাইনী-মাত্রেই এটা অনুধাবন করতে পারছেন যে, "আমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারছি না বলেই আমাদের দেশে আজ আল্লাহ্‌র লান্‌তপ্রাপ্ত শত্রুরা শাসন প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে।"

সুতরাং প্যালেষ্টাইনীদের উপর ইসরাঈলী ইহুদীদের প্রতিনিয়ত গণহত্যা মুসলিম বিশ্বের জন্য একপ্রকার প্রত্যাশিত বাস্তবতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। যখনই পত্রপত্রিকায় ইহুদীদের গণহত্যার কথা প্রচারিত হয়, তখনই বিশ্ব মুসলমান একটুখানি আফসোস করেন। একইভাবে-প্যালেষ্টাইনীরাও কিছুক্ষণ মাতম করে আগামী আক্রমণের অপেক্ষায় প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুমিন হওয়ার তাগিদকে গ্রহণ করতে যেনো অনেকেই রাজী নন। ১৯৪৮ সাল

থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ সাতান্ন বছরে ইহুদীদের নির্বিচার গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন অর্ধ কোটিরও বেশি প্যালেষ্টাইনী। আর উদ্বাস্তু হয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন কোটি।

প্যালেষ্টাইনী মুজাহিদ শেখ ইয়াসিনের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লিখিত বাক্যগুলো নিয়ে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে মুসলিম বিশ্বের সকল দেশেই এই কথা প্রযোজ্য। কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া, পূর্ব তিমুর, কসোভো বলতে গেলে সবগুলো মুসলিম দেশে আজ মুমিনের বড়ই অভাব। তাক্বওয়াপূর্ণ জিহাদ প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তারা সন্ত্রাসী জাতিতে পরিণত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মুসলিম এক জাতি।" আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না।" ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, বিশ্বের সকল মুসলমান একটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। কিন্তু আজকের প্যালেষ্টাইনে চলছে মুসলিম নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত বর্বরতা। অথচ দুনিয়ার বাদবাকি মুসলমান হয় তামাশা, নয়- আফসোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন দু'টো। কারণ, দীর্ঘ অর্ধশতাব্দিরও বেশি কাল ধরে প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদের উপর ইহুদী-খৃষ্টান কাফিরদের আক্রমণ চলছে, কিন্তু সেদেশের মানুষ কখনো এই আক্রমণকে জিহাদী ইবাদতের গুরুত্বে মূল্যায়ণ করে নি। বরং তারা যুদ্ধকে জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে" (সূরা বাকার, আয়াত- ২১৬)

অতএব 'ফরয' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো বাধ্যতামূলক নির্দেশ। যেহেতু 'ফরয' শব্দের বাংলা অর্থ নির্দেশ। আর নির্দেশ পালনের অর্থ হচ্ছে নিঃশব্দে আনুগত্য স্বীকার। আর- আনুগত্য স্বীকার বা পালন করার অর্থই ইবাদত।

অন্যদিকে- ইসলাম নামক পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থাটাই একটা ইবাদত। এই ইবাদতের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্তর ও শাখা-প্রশাখা। ইসলামের প্রধান যে পাঁচটি স্তম্ভ বা স্তর রয়েছে, সেগুলোর নির্যাস হচ্ছে, আল-জিহাদ। যে কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যদি জিহাদে বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন। (সূরা তওবা আয়াত-৩৯)

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না নিজে সে অপর মুসলমানের উপর জুলুম করবে, না তাকে কাফিরদের নিকট ছেড়ে আসবে।' (তথ্যসূত্রঃ মুজাহিদের আযান, মাওলানা মাসউদ আযহার, পৃষ্ঠা- ৮১)

কিন্তু আজকের বিশ্ব-মুসলমান ফিলিস্তিনীদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে ঠায় তামাশা প্রত্যক্ষ করছেন। একইভাবে, ফিলিস্তিনী মুসলমানরাও তাদের উপর কাফিরদের আক্রমণকে জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে একটি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন। অতএব জিহাদের সকল ফতোয়া ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও জিহাদী ইবাদতের আমল করতে পারছেন না কেউ-ই।

এ কারণে জিহাদী অনুপ্রেরণার অগ্নিমশাল, বিপ্লবের মূর্তপ্রতীক ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জিহাদী ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছুটে যান আফগানিস্তানে। ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যামের জন্ম ফিলিস্তিনে, আর উচ্চ শিক্ষা অর্জন মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্বদেশের জন্য তিনি সব সময় ভাবতেন। কিন্তু স্বদেশী মুজাহিদদের তাক্বওয়ার বড়ই অভাব। তিনি নিজের ভাষায় বলেন, "আমার মন ও সমগ্র জীবন

জুড়ে রয়েছে জিহাদ, জিহাদ প্রেমের আধিপত্য। এর কারণ সূরা তাওবা-যা জিহাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত বিধান, যা পাঠ করে আমার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষরণ, অনুভূত হয় অশেষ বেদনা ও আফসোস। কারণ, আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ্'র ব্যাপারে আমার ও উম্মাহর অমার্জনীয় উদাসীনতা।

'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ্' সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা অথবা তার অকাট্য বিধানাবলী থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরানোর দুঃসাহস যারা প্রদর্শন করেন, তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে সূরা তাওবার 'আয়াতুস সাইফ'। যে আয়াতে আল্লাহ্ সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, "আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও যুদ্ধ করেছে তোমাদের সাথে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (তাওবা, আয়াত ৩৫)"

ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যামের এই বাক্যগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ফিলিস্তিনে 'সমবেত মুত্তাকীদের' অভাবের কারণেই আফগানিস্তানে হিজরত করেন। আশির দশকে আফগানিস্তানে জিহাদ চলাকালীন তিনি উল্কার মতো ছুটে বেড়ান এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে জিহাদী উদ্দীপনায়। তারই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে সমস্ত বিশ্বজুড়ে জিহাদী চৈতন্যের এক নতুন হাওয়া প্রবাহিত হয়। তার সাংগঠনিক দক্ষতা, অসাধারণ বাগ্মিতা, সৃষ্টিধর্মী লেখা তাকে আফগান জিহাদের প্রাণ-পুরুষের আসনে সমাসীন করে। তিনি হয়ে যান আফগান জিহাদের অবিসংবাদিত নেতা। আফগান জিহাদের উপর তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার ৪৪টি ভিডিও এবং ৩শ'টি অডিও ক্যাসেট পৌঁছে যায় মধ্যপ্রাচ্যের ঘরে ঘরে। তার বক্তৃতা শুনে হাজার হাজার আরব নওজোয়ান যায় আফগান জিহাদের রণাঙ্গনে। অথচ যারা ফিলিস্তিনে জিহাদ করার কথা ছিলো।

আব্দুল্লাহ্ আয্যাম আজ পৃথিবীতে বেঁচে নেই। বিশ্ববিখ্যাত মুজাহিদ নেতা ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম ১৯৮৬ সালের ২০ এপ্রিল সোমবার বাদ আছর খ্যাতনামা আফগান মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর বাড়ীতে বসে লিখেছিলেন একটি ব্যক্তিগত চিঠি। যে চিঠিতে রয়েছে পারিবারিক কিছু কথাবার্তা ও স্ত্রী, পুত্র-কন্যার প্রতি অসিয়ত। এই চিঠিটি লেখার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম শহীদ হয়ে যান। পরবর্তীতে এই চিঠিখানি হয়ে যায় জিহাদপ্রিয় সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এক অমূল্য অসিয়তনামা। নিম্নে চিঠিখানি লিপিবদ্ধ করা হলো।

ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম লিখেন, "পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'অতপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাওবা, আয়াত-৫)

আল্লাহর পথে জিহাদে বের না হয়ে অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। বরং তা আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করার শামিল। এ জাতীয় কর্মকান্ডে যারা লিপ্ত, তাদের থেকে দূরে থাকাই কুরআনের নির্দেশ, আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায়

বলেছেন, “তাদেরকে পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকেরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।” (আন’আম, আয়াত- ৭০)

আমাদের মর্যাদার সুউচ্চ স্থানে আসীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। নিরেট আশা-আকাংখা দ্বারা কখনও মর্যাদা অর্জিত হয়নি এবং হবেও না। মর্যাদাশীল আত্মার অধিকারী হতে হলে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে অবশ্যই।

মনে রাখা উচিত, সবেচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল ইবাদত হচ্ছে জিহাদ। অন্য কোনা ইবাদত এর সমান মর্যাদার নয়। এমনকি মসজিদুল হারাম নির্মাণ ও তথায় নিয়মিত অবস্থানেও জিহাদের সমপরিমাণ পূণ্যের আশা করা যায় না।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদিন সাহাবীদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়, একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত আর মর্যাদাসম্পন্ন আমল নেই। অপরজন মসজিদুল হারাম নির্মাণকে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আমল বলে দাবী করেন। তাঁর উক্তি খন্ডন করে তৃতীয় জন বললেন, আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর রাহে জিহাদই বড় আমল। অতঃপর সাহাবীদের এই ভিন্ন ভিন্ন মতামত অবসানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত, “তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করে আল্লাহ রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বয়ং তাঁদের পরওয়ারদিগার- দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।” (তওবা, আয়াত- ১৯-২০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে জবাই করা হচ্ছে আর আমরা দূর থেকে ‘লা-হাওলা’ এবং ‘ইন্না-লিল্লাহ্’ পাঠ করেই আপন দায়িত্ব পালন করছি বলে আত্মতৃপ্ত হচ্ছি। জুলুম প্রতিরোধে এক পা-ও এগুতে আমরা প্রস্তুত নই। এটা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কি। এ আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদেরকে ঈমানী দায়িত্ব পালন থেকে যুগ যুগ ধরে গাফিল করে রেখেছে।

কবির ভাষায়-

পাপিষ্ঠ কবলে মুসলিম রমণী
আর্তচিৎকারে কম্পিত ধরনী,
ব্যর্থতার কপোলতলে-
শায়িত মুসলমান নিদ্রার কোলে,
এটা কি সম্ভব?
অকরুণ মুসলমানী।

আল্লামা ইবনে তাইমীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘ঈমানের পরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব দায়িত্ব হচ্ছে আক্রমণকারী শত্রুর প্রতিরোধ করা, যার হাতে আমাদের ইহ ও পরকালীন

স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে আমার অভিমত হচ্ছে-

ক) সালাত (নামায), যাকাত ও সিয়াম পরিত্যাগকারী ও কিতাল পরিত্যাগকারীর মধ্যে পার্থক্য নেই।

খ) জিহাদ থেকে বিরত থাকার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য; তালিম, তারবিয়াত, দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনাসহ কোন কাজই জিহাদের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয় না।

গ) দুনিয়ার প্রায় সকল মুসলিম আজ জিহাদ পরিত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত, তারা বন্দুক বহন না করার অপরাধে অপরাধী। নিতান্ত অক্ষম লোক ছাড়া যারাই আজ বন্দুক ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্যে যাবে, তারা পাপী হিসেবেই আল্লাহর সম্মুখে নীত হবে। কারণ, এরা কিতাল করেনি। কিতাল এখন ফরযে আইন। রোগাক্রান্ত ও অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকল মুসলিম এ ফরয আদায়ে বাধ্য।

ঘ) আমার বিশ্বাস, আল্লাহর কাছে জিহাদ হতে অব্যাহতি পাবে শুধু চার প্রকারের মানুষ- (১) অন্ধ (২) বিকলাঙ্গ (৩) অসুস্থ এবং (৪) যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। এরা ছাড়া বাকী সকল মুসলমানকে জিহাদ ত্যাগের কারণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। চাই এ জিহাদ আফগানিস্তানে বা ফিলিস্তিনে (বা আরাকানে) হোক অথবা পৃথিবীর যেকোন ভূমিতে হোক, যা কাফির দ্বারা অপবিত্র হচ্ছে।

ঙ) আমি মনে করি, জিহাদে যোগাদান করতে আজ পিতা, স্ত্রী কিংবা কর্যদাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে কোন উস্তাদ বা নেতার সম্মতি নেয়াও ওয়াজিব নয়। অতীত ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে উপরোক্ত বিষয়ে উলামার ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। আজ যদি এ বিষয়ে কেউ ভুল বুঝানোর অপচেষ্টায় মেতে উঠে, তবে তা হবে জুলুম এবং তা হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একে গুরুত্বহীন মনে করা কিংবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ এখানে নেই।

চ) আফগানিস্তান তথা সমস্ত বিশ্বের নির্যাতিত প্রতিটি মুসলিমের রক্ত ও লাঞ্ছিতা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য আমরাই দায়ী। শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হইনি। আমাদের উচিৎ ছিল, তাদের জন্য অস্ত্র, অন্ন ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ করা এবং যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করা।

দাসুকী-শরহুল কাবীরের টীকায় লিখিত হয়েছে, 'যদি কারও কাছে অতিরিক্ত খাদ্য থাকে এবং কোন অভুক্ত ব্যক্তিকে দেখা সত্ত্বেও সে তাকে খেতে না দেয় এবং সে যদি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হবে। যদি খাদ্যের মালিক এ কথা মনে করে অনাহারী ব্যক্তিকে খাদ্য না দিয়ে থাকে যে, আমি আমার এ খাদ্য না দিলে সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করবে না। অতঃপর যদি অনাহারী ব্যক্তি এ কারণেই মৃত্যুবরণ করে, তবে কি তার কোন শাস্তি হবে? এ প্রসঙ্গে আলিমগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেনঃ

(১) উক্ত ব্যক্তি তার সম্পদ হতে মৃত ব্যক্তি দিয়াত আদায়ে বাধ্য থাকবে।

(২) আর কারও মতে, উক্ত ব্যক্তির শাস্তি 'কিসাস' তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে খাদ্য

না দেয়ার কারণে লোকটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেছে। হায়, নিজেদের মনোবৃত্তির জন্য অর্থের অপচয় করছে অথচ অনাহারী মুসলমানদের জন্য তারা সামান্য অনুদান দিতেও কুণ্ঠিত।

হে মুসলমান!

তোমাদের জীবন মানেই জিহাদ, তোমাদের সম্মান মানেই জিহাদ। জিহাদের সাথেই জড়িত তোমাদের অস্তিত্ব।

হে দাওয়াত কর্মীগণ! তোমাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং কাফির, অত্যাচারী ও তাগুতের জনপদ বিরান করে দিতে হবে। নতুবা এ আকাশের ছায়ায় তোমাদের কানাকড়ির মূল্যও থাকবে না।

যাদের ধারণা, কিতাল, জিহাদ ও রক্ত দেয়া ছাড়াই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। দ্বীনের মর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তারা অবগত নন। কিতাল ব্যতীত দাওয়াত কর্মীর প্রতাপ, দাওয়াদের প্রভাব ও মুসলমানের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ শত্রুর হৃদয় হতে তোমাদের প্রভাব দূরীভূত করে দেবেন। আর তোমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ঠ করিয়ে দেবেন 'ওয়াহান'। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহান' কি? তিনি বললেন, দুনিয়া-প্রীতি ও মৃত্যু-ঘৃণা।' অন্য বর্ণনা মতে 'ওয়াহান' মানে কিতালের প্রতি অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা। কুরআনের ঘোষণা- "হে রাসূল, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদের উৎসাহিত করতে থাকুন, শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি সামর্থ খর্ব করে দিবেন। আর আল্লাহ শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।" (নিসা, আয়াত-৮৪)

কিতালের অনুপস্থিতিতে শিরক ও ফিতনার সয়লাব বয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে শিরকের বিজয় পতাকা। এই জন্যই আল্লাহ বলেছেন, "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (আনফাল, আয়াত-৩৯)

জিহাদই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র গ্যারন্টি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ যদি এক কে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।" (বাকারা, আয়াত ২৫১-এর অংশবিশেষ)

জিহাদই ইবাদতখানা ও পবিত্র স্থানসমূহের সম্মান নিশ্চিত করতে পারে এবং এর অবমাননা রোধ করতে পারে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। যেগুলোয় আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।" (হজ্ব, আয়াত- ৪০)

অতএব হে মুসলিম! মসজিদসমূহের পবিত্রতা ও আপন অস্তিত্বের স্বার্থেই তোমাদের জিহাদ করতে হবে।

হে ইসলামের মহান দায়ী (আহ্বানকারী)!

আকাংখী হও, পাবে তুমি অমর জীবন, আশা ও বিলাস প্রতারণার শিকার হয়ো না, আর আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানের প্রবঞ্চনা হতে বেঁচে থাক। নফল ইবাদত ও কিতাব অধ্যয়ন যেন কিতাল সম্পর্কে তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। সাবধান! বিলাসিতা যেন তোমাকে এ মহান দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আল্লাহ বলেছেন, "আর তোমরা কামনা করছিলে তা, যাতে কোন রকম কণ্টক নেই।" (আনফাল, আয়াত-৭)

জিহাদের ব্যাপারে কারও অন্যায়-অনুসরণ করো না। জিহাদের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিতে নেতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। নিশ্চয় জিহাদ দাওয়াতী মিশনের স্তম্ভ, তোমার ধর্মের মজবুত আশ্রয় কেন্দ্র ও তোমার শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী।

উলামায়ে ইসলামকে বলছিঃ

আপন প্রভূর পানে ফিরে আসতে চায় এ প্রজন্ম। এদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসুন। দুনিয়ার আসক্তি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন। সাবধান! তাগুত ও খোদাদ্রোহী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না। তাহলে আপনার হৃদয়ালোক ছেঁয়ে যাবে অমানিশায়, আপনার আত্মার ঘটবে অপমৃত্যু এবং জনগণ ও আপনার মাঝে সৃষ্টি হবে বিচ্ছিন্নতার বিশাল প্রাচীর।

হে মুসলমান! অলসনিদ্রায় কেটেছে তোমাদের বহু যুগ। তোমাদের জন্মভূমিতে আজ পাপিষ্ঠদের পদচারণা, তারা আবৃত্তি করছে বিজয়ের গান।

কবি কত সুন্দর উক্তি করেছেন-

গ্লানির নিদ্রা দীর্ঘ আমাদের-
কোথায় সেসব বাঘের হুংকার?
খোদার শত্রুরা বিজীত আজ-
দাসত্ব আমাদের করুণ প্রাকার!
আমরা সবাই বন্দিশালায়
শিকল-বেড়ী ক্ষত-বিক্ষত
এখনো ভাঙ্গতে পারি জেলের তালা-
তবু কেনো আমরা ক্লান্ত পরাহত?

আমি শুনতে পাই, মানবতার কারাগারে বন্দী নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ কবির সাথে সুর মিলিয়ে বলছে, মুক্তি চাই! মুক্তি চাই।

হে মহীয়সী নারী সমাজ! আপনারা বিলাসপ্রিয় হবেন না, যা একান্ত প্রয়োজন তাই করুন। অল্পে তুষ্ট থাকুন। আপনার সন্তানকে নির্ভীক, দুর্জয়, সাহসী মুজাহিদরূপে গড়ে তুলুন। আপনার ঘর যেনো হয় সিংহ-শাবকের লালনভূমি। তাকে ভীরু মুরগীর চারণক্ষেত্রে পরিণত করবেন না- যারা তাজা ও পুষ্ট হয় অন্য জীবের উদরপূর্তির জন্য। আপনার সন্তানের মাঝে সৃষ্টি করুন জিহাদপ্রেম, তারুণ্যের তেজ ও দিগ্বিজয়ের দূরন্ত নেশা। মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকুন, আপনার জীবনে সপ্তাহের একটি দিন অন্ততঃ এমনভাবে কাটান, যা মুহাজিরীন ও

মুজাহিদীনের জীবনাচারের পরিচয় বহন করে। তাদের ন্যায় শুকনো রুটি ও সামান্য তরকারী আপনি আহার করুন। এভাবে ঘরে বসেও আপনি লালন করতে পারেন জিহাদী চিন্তা, বিজয়ীর চেতনা।

ওহে শিশু কিশোর দল! তোমরাই আগামী দিনের তরুণ যুবক, মিল্লাতের আশা-আকাংখার প্রতীক, আজ হতে সামরিক প্রশিক্ষণ নাও। রপ্ত কর যাবতীয় সমর কৌশল। ট্যাংক ও অস্ত্রই হোক তোমার খেলনা। বিলাসবহুল জীবন নয়, তোমার প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু মুক্ত বিহঙ্গের জীবন। এড়িয়ে চল ফুলশয্যা, বরণ কর কন্টকপূর্ণ গৃহাঙ্গন। সংগীতের সুরের চেয়ে তরবারীর ঝংকার হোক তোমার প্রিয় বিষয়। তবেই ছুড়তে পারবে শত্রুর প্রতি চ্যালেঞ্জ। একদিন তোমার দ্বারা সূচিত হবে মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক বিজয়।

(ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যামের এই চিঠিখানির কিয়দংশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হলেও আধুনিক সমাজে মুজাহিদ জীবনের একটি শিক্ষা লক্ষণীয়, তাই পাঠক সম্মূখে তুলে ধরা হলো।)

সুপ্রিয়া! হে মোর সহধর্মিনী!

১৯৬৯ এর সে কষ্টকর সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের ঘরে ছিল দু'কিশোর ও এক শিশুসন্তান, কাঁচা ইটের তৈরী ছিল আমাদের আবাসঘর। ছিল না কোন আলাদা রান্নাঘর। তোমার উপরই ন্যস্ত করেছিলাম পুরো সংসার। একদিন সন্তানরা বড় হল, আমাদের পরিচিতিও বৃদ্ধি পেল, অতিথিতে সরগরম হয়ে উঠল আমাদের ঘর। আর তুমি ছিলে তখন সন্তান-সম্ভবা। তোমার কষ্ট ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু সবকিছুই তুমি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি, লক্ষ্য ছিল আমার সহায়তা করা। আল্লাহ তোমাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। সত্যিই আল্লাহর দয়া ও তোমার ধৈর্য না হলে আমার একার পক্ষে এ বিরাট বোঝা উঠান সম্ভব ছিল না।

হে প্রিয়া আমার!

এ জীবনে তোমাকে দেখেছি দুনিয়াবিমুখ, পার্থিব বস্তুর প্রতি ছিল না তোমার কোন অনুরাগ, দরিদ্রতার প্রতি ছিল না তোমান কোন অভিযোগ। আর স্বচ্ছল সময়েও দেখিনি তোমাকে বিলাসিতায় ডুবে থাকতে। দুনিয়াকে সব সময় তুমি রেখেছিলে হাতের মুঠোয়, হৃদয়ে ছিল না দুনিয়ার কোন স্থান।

মনে রাখবে, জিহাদী জীবনই আনন্দ ও সুখের জীবন। জীবনকে বিলাসিতার গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ায় কোন সুখ নেই। কষ্ট ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করা মহত্ত্বের পরিচয়। তাই দুনিয়ার মোহ বর্জন কর, আল্লাহর ভালবাসা পাবে। মানুষের সম্পদ দেখে লোভ কর না, তারা তোমায় ভালবাসবে।

আল-কুরআন মানব জীবনের সেরা সাথী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। রাত্রির নামায, নফল রোযা ও গভীর রজনীর ইস্তিগফার অন্তরলোকে আনে স্বচ্ছতা, সৃষ্টি করে ইবাদতের অনুরাগ এবং পূণ্যবানদের সৎসঙ্গ, স্বল্প সম্পদ, দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকা এবং ভনিতা থেকে বিরত

থাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

হে প্রিয়া!

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, জান্নাতুল ফিরদাউসে পুনঃ আমাদের মিলন হোক, যেমনিভাবে দুনিয়াতে মিলিত হয়েছিলাম আমরা দু'টি প্রাণ!

হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততি!

মন ভরে কোন দিন তোমাদেরকে সঙ্গ দিতে পারি নি। আমার শিক্ষা ও তারবিয়াত তোমাদের ভাগ্যে কমই জুটেছে। অধিকাংশ সময় আমি তোমাদের থেকে বহু দূরে থেকেছি, কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। তোমরা জান, মুসলমানদের উপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে, যার গর্জনে দুগ্ধদানকারী মায়ের কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ভয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। উম্মতের সংকটের ব্যাপকতা চিন্তা করলে কিশোর ললাটেও ভেসে উঠছে বার্ধক্যের বলিরেখা। মুরগীর ন্যায় তোমাদের নিয়ে আমি খাঁচায় বাস করিনি। মুসলমানদের অন্তর বেদনায় জ্বলবে আর আমি আরামে বিশ্রাম নিব, সংসারসুখ উপভোগ করব? দুর্দশায় মুসলমানদের হৃদয় বিদীর্ণ হবে, নির্যাতনে জ্ঞান বিলুপ্ত আর আমি ঘরে বসে থাকব? তা আমার পছন্দ নয়। কোনদিন আমি কামনা করিনি বিলাসী জীবন, সুস্বাদু ভুনা গোশ্‌ত এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সংসার-সুখ উপভোগ।

তোমাদের প্রতি আমার অসিয়তঃ

ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা আঁকড়ে থাকবে।

খ) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে ও কুরআন হিফ্‌য করার চেষ্টা করবে।

গ) জিহ্বার হিফাযত করবে, সংযত কথা বলবে।

ঘ) নিয়মিত সালাত ও সিয়াম পালনসহ সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে।

ঙ) জিহাদী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। মনে রাখবে, কোন নেতার অধিকার নেই তোমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার। অথবা দাওয়াত ও ইরশাদের সাথে জড়িত রেখে তোমাকে ভীরু কাপুরুষ ও জিহাদবিমুখ করার। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ব্যাপারে কারও অনুমতির অপেক্ষা করনে না। হাতে অস্ত্র তুলে নাও। ঘোড়সওয়ার হও। তবে ঘোড়সওয়ারীর চেয়ে তীরন্দাযী আমার অধিক প্রিয়।

চ) শরীয়তের উপকারী ইল্‌ম অর্জন করবে।

ছ) তোমরা সদা তোমাদের বড় ভাই মুহাম্মদকে মান্য করবে, তাকে সম্মান করবে, পরস্পর পোষণ করবে গভীর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভালবাসা।

জ) তোমরা তোমাদের দাদা-দাদীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, তোমাদের দু' ফুফু উম্মে ফইজ ও উম্মে মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করবে। আল্লাহর পরে তাদের অনুগ্রহ আমার উপর অনেক।

ঝ) আমার রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমার পরিবারের সাথে নেক আচরণ করবে এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায় করবে।

আবার দেখা হবে বেহেশ্তের পুষ্পকাননে।” (সূত্র- মুজাহিদের আযান দ্রষ্টব্য)

-আব্দুল্লাহ আয্যাম

উল্লেখ্য, চিঠিখানি লেখার মাত্র কয়েকদিন পরই ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম আফগান রণাঙ্গনে শহীদ হন। তাঁর এই চিঠির ভাষায়ই অনেকটা স্পষ্ট, তিনি যে শহীদ হবেন- হয়তো জানতেন। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যামের এই চিঠিই ছিলো জীবনের শেষ লেখা।

জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্ঃ

জিহাদ শব্দের বাংলা অর্থ চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো ইত্যাদি শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা, আয়াত- ২৪৪)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, “আমরা ছোট জিহাদ (অস্ত্রের যুদ্ধ) হতে বড় জিহাদে (প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ) ফিরে এসেছি।”

প্রসিদ্ধ কবি আবুল আতাহিয়া’র একটি কবিতার চরণের প্রথমাংশ হচ্ছে, ‘সর্বাপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ধাতব অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।” (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২০৪)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, ‘আপনার ধর্মে সফর ও বনে জঙ্গলে বাস করার অনুমতি আছে? আপনি কি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বৈরাগ্যকে বৈধ মনে করেন? তিনি জবাবে বললেন, “আল্লাহ্ তাআলা বৈরাগ্যের বদলে আমাদেরকে জিহাদ ও হজ্জের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন।” (ইমাম গাযযালী, তাছাউফ ও মৌলিক শিক্ষা, পৃষ্ঠা- ২১৩)

ঈমান আনার পর মুসলিম ব্যক্তির উপর- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত (ধনীদের উপর) ফরয হয়। এগুলোর ঠিক পরবর্তী বড় ফরয হচ্ছে, জিহাদ। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইন্নাল জান্নাতা তাহতা যিলালিস সুয়ূফ। অর্থাৎ তরবারীর ছায়ার নীচেই বেহেশত।” (বুখারী)

পবিত্র কুরআন শরীফে অন্তত উনাশি (৭৯) বার জিহাদ ও ক্বিতাল শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। তাওহীদ সম্পর্কিত আলোচনার পর, সবচে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে জিহাদ। পবিত্র কুরআনের জিহাদ বিষয়ক আয়াতগুলো যেনো মুমিন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নির্ভীক সৈনিক বানাতে চায়। সে সকল সৈনিকেরা জিহাদের মাঠে শুধু আল্লাহ্র জান্নাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। একইভাবে রাতের বিশ্রামের সময়টুকুও তাদের বিছানায় কাটে না। বরং তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে।” (সূরা সেজদা- ১৬)

অর্থাৎ কাফিরের প্রতি তাঁরা যেমন কঠোর, তেমনি মানবিক দুর্বলতাজাত কুপ্রবৃত্তির প্রতিও

নির্দয়। প্রকৃত অর্থে এঁদেরকেই বলা হয় মুমিন। পবিত্র কুরআনের একটি নির্দেশ হচ্ছে, 'সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমরা মুমিন না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' একইভাবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশমতে প্রথমে তাওহীদ এবং পরে জিহাদ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মুসলমানকে মুমিন হতে হলে, প্রথমে তাওহীদের পূর্ণ আমল করতে হয় এবং জিহাদ হচ্ছে মুমিনের পরিপূর্ণতার স্বরূপ।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম জিহাদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১) আত্মার বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। ২) শরীরিক জিহাদ। ৩) আর্থিক জিহাদ। ৪) ইল্‌ম বা জ্ঞান চর্চার জিহাদ। ৫) অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদ। (তথ্যসূত্রঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রচিত প্রবন্ধ- সুবহে সাদিক, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) স্মারকগ্রন্থ ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৭-২২)

আত্মার সাথে জিহাদঃ

আত্মার বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি জীবনে দুনিয়ার সুখ-বিলাসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পরকালীন চিরশান্তির মোহে আচ্ছন্ন থাকা। মানুষ যখন ইহকালের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে পরকালের চিন্তা-গবেষণায় মগ্ন থাকে, তখন অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র প্রতি ভীতি থাকার নামই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উত্তম পন্থা। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আমি তাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি অর্জনের পথসমূহ উম্মুক্ত করে দেই।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৬৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আত্মার সাথে জিহাদ করে।" (মিশকাত)

মুহাম্মদ ইবনে শুজা ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জনৈক শিষ্যের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, একবার ইমাম সাহেবকে কেউ বললো, আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মুনসুর আপনাকে দশ হাজার দিরহাম দিতে আদেশ করেছেন। ইমাম আযম এতে সম্মত হলেন। যেদিন এই দিরহাম আসার কথা ছিলো, সেদিন ইমাম সাহেব ফজরের নামায আদায় করে মুখ ঢেকে নিলেন এবং কারও সাথে কোনো কথা বললেন না। খলীফার দূত হাসান ইবনে কাহতাবা যখন সে অর্থ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, তখনও তিনি কিছুই বললেন না। উপস্থিত এক ব্যক্তি দূতকে জানালো, তিনি আমাদের সাথেও কম কথাই বলেন; অর্থাৎ কথা না বলাই তাঁর অভ্যাস। আপনি এই অর্থ এই থলের মধ্যে ভরে গৃহের কোণে রেখে দিন (তাই করা হলো)। থলেটি সেখানেই পড়ে থাকলো। দীর্ঘদিন পরে ইমাম সাহেব যখন তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ওসিয়ত করেন, তখন পুত্রকে বললেন, আমার মৃত্যু ও দাফনের পর এ থলেটি হাসান ইবনে তাহতাবার কাছে নিয়ে যাবে এবং বলবে, এটা আপনার আমানত, যা আপনি আবূ হানীফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাছে সোপর্দ করেছিলেন। ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র ওসিয়ত অনুযায়ী থলেটি পৌঁছে দিলে হাসান ইবনে কাহতাবা বললেন, আপনার পিতার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত হোক। তিনি ধর্ম-

কর্মের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন।' (সূত্রঃ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন; পৃষ্ঠা- ৬৯)

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরোজায় খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চরের এমন উৎকৃষ্ট একটি পাল দেখলাম, যা আমি কোনোদিন দেখিনি। আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, কি চমৎকার পাল! তিনি বললেন, আবু আব্দিল্লাহ্! এ পাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপঢৌকন। আমি বললাম, আপনি নিজে সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি রেখে দিন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ করি, যে মাটিতে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন, সে মাটি আমার ঘোড়া পদদলিত করবে? তিনি একসাথে সবগুলো ঘোড়া ও খচ্চর দান করে দিয়েছিলেন। (সূত্রঃ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন; পৃষ্ঠা- ৬৭)

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে খলিফা হারুনুর রশীদ প্রশ্ন করেন, আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন, না। খলিফা তাঁকে একটি বাড়ী ক্রয় করার জন্যে তিন হাজার দীনার দিলেন। তিনি তা রেখে দিলেন, ব্যয় করলেন না। অতঃপর খলিফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় ইমাম মালিককে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি আপনার হাদীসগ্রন্থ মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই, যেমন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাবে বললেন, মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে পৌঁছে গেছেন এবং হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ।' এখন রইলো আপনার সাথে যাওয়ার বিষয়টি। এটাও হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি মদীনাবাসীরা বুঝে, তবে মদীনা তাদের জন্যে উত্তম।' তিনি আরো বলেন, 'মদীনা তার ময়লা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কর্মকারের রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয়।' আপনার দীনার যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রাখা আছে। ইচ্ছা হলে নিয়ে যান, ইচ্ছা হলে রেখে যান। অর্থাৎ আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করাতে চান এই বলে যে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি দীনারকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনার উপর অগ্রাধিকার দেই না। (সূত্রঃ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন; পৃষ্ঠা- ৬৬-৬৭)

কলমে-কাগজে খুবই সুন্দর করে উপদেশবাক্য নিয়মনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা যায়। কিন্তু বাস্তবজীবনে রূপান্তর ঘটানো কঠিন ব্যাপার। মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে এ অবস্থা যেমন অতীতেও ছিলো, তেমনি আজকের যুগেও লক্ষণীয়।

অতীতের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযতর শাকিক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শিষ্য হযরত হাতিম আসাম্মীর দীর্ঘ তেত্রিশ বছর উস্তাদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে মাত্র আটটি জিনিসের শিক্ষালাভ করেন।

হযরত হাতিমের শিষ্য আবু আব্দিল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমি উস্তাদ হাতিমের সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম। আমাদের কাফেলায় ছিলেন তিন'শ বিশ জন লোক। আমাদের কারো সাথে

কোনো খাবারের থলে ছিলো না। খাবারের সময় আল্লাহ্ তাআলাই আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আমরা 'রায়' নামক প্রদেশে উপস্থিত হলাম। সেখানে হযরত হাতিমের এক সাগরিদ আমাদেরকে রাতের মেহমানীর দাওয়াত করলেন। আমরা সেখানে রাত যাপন করলাম। সকালে তিনি হযরত হাতিমকে বললেন, আমি একজন অসুস্থ ফিকাহ্‌বিদকে দেখতে যাবো। হযরত হাতিম বললেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া তো সওয়াবের কাজ। আর অসুস্থ ফিকাহ্‌বিদকে দেখতে যাওয়া তো ইবাদত। আমিও তোমার সাথে যাবো। অসুস্থ ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন 'রায়' প্রদেশের বিচারপতি মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল। তারা যখন তাঁর ঘরের দরোজায়া পৌঁছলেন, তখন কুরসীবিশিষ্ট সুরম্য দরজা দেখে হযরত হাতিম বিস্মিত হলেন। তারপর ঘরবাড়ি ঐশ্বর্যপূর্ণ কাটপালঙ্ক দেখে চোখ দু'টো ছানাবড়া হয়ে গেলো। যখন অসুস্থ বিচারপতির বিছানার পাশে গেলেন, তখন আর ধৈর্য স্থির রাখতে পারলেন না। বিচারপতি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বসবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। বিচারপতি তখন প্রশ্ন করলেন, কি জন্যে এসেছেন? হযরত হাতিম বললেন, একটা মাসআলা জানতে চাই। বিচারপতি বললেন, বলুন। তিনি বললেন, আপনি যদি উঠে বসতে পারেন- তাহলে বলবো। বিচারপতি উঠে বসলেন। তিনি বললেন আপনি কার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? উত্তরে বলা হলো, হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে। প্রশ্ন করলেন, হক্কানী উলামাগণ কার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? বিচারপতি তিনি বললেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। হযরত হাতিম বললেন, তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের, নাকি ফেরাউন ও নমরূদের অনুসরণ করছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ এরকম ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন-যাপন করেন নাই। বিচারপতি ইবনে মুকাতিলের মানসিক অসুস্থতা আরো বেড়ে গেলো। ঘটনাটি সাত-তাড়াতাড়ি সমস্ত রায় শহরে ছড়িয়ে গেলে কিছু লোক হযরত হাতিমের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, রায় শহরের কাযভীনে তানাকেসী এই বিচারপতির চেয়েও অধিক জাঁকজমকপ্রিয় লোক। হযরত হাতিম তাঁর সাথে দেখা করে বললেন, আমি একজন অনারব লোক। আমি আপনার কাছে ধর্মের সূচনা এবং নামাযের চাবি অর্থাৎ ওযু শিখতে চাই। তানাকেসী বললেন, বেশ ভালো কথা। তিনি ভৃত্যকে ওযুর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। পানি আনা হলো। মনোরম একটি কাটে বসে তিন তিন বার অঙ্গগুলো ধূয়ে তিনি ওযু করলেন, আর হযরত হাতিম পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর হরযত হাতিম বললেন, আমি ওযু করি আপনি একটু দেখুন! হযরত হাতিম চার বার করে অঙ্গ ধূইয়ে ওযু করলেন। তানাকেসী বললেন, জনাব! আপনি তো পানি অপচয় করেছেন। হযরত হাতিম বললেন, আমি তো তিন বারের পরিবর্তে চার বার অঙ্গ ধূয়ে কয়েক ফোটা পানি অপচয় করেছি মাত্র। কিন্তু আপনি যে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনে এতো সম্পদের অপচয় করছেন, সেটা কি মুমিনের দাবী? হযরত হাতিমের কথা শুনে তানাকেসী লজ্জা পেয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন না।

হযরত হাতিম মদীনা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। শহরের উপকণ্ঠে ঢুকেই দেখতে পেলেন, লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে পথ্যিমধ্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি প্রশ্ন

করলেন, এটা কোন্ মদীনা? উত্তরে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা। হযরত হাতিম বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে নামায পড়বো। উত্তরে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো কোনো প্রাসাদ ছিলো না! তাঁর বাসগৃহও খুব নিম্নস্তরের। হযরত হাতিম বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের প্রাসাদই দেখিয়ে দিন! লোকেরা বললো, সাহাবীগণেরও রাদ্বিআল্লাহু আনহু কোনো প্রাসাদ ছিলো না। তাঁদের বাসগৃহ তো ভূমি সংলগ্ন ছিলো! হযরত হাতিম বললেন, তাহলে এটা কি ফেরাউনের শহর? লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গ্রেফতার করলো এবং সুলতানের কাছে নিয়ে গেলো। হযরত হাতিমের উপর মামলা দায়ের করা হলো যে, এই অনারব ব্যক্তি পবিত্র ভূমি মদীনা শরীফের অবমাননা করেছেন। সুলতান লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কিভাবে মদীনার অপমান করলেন? হযরত হাতিম তখন সব ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের চমৎকার আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আযহাব)

এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, 'আপনারা কার অনুসরণ করছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না ফেরাউনের? ফেরাউন সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দ্বারা দালান নির্মাণ করেছে।' মদীনার শাসনকর্তা নিরুত্তর হয়ে হযরত হাতিমকে মুক্ত করে দিলেন।

প্রবৃত্তি বা আত্মার সাথে জিহাদের অর্থ কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে নির্ধন বা দরিদ্র থাকা নয়। বরং দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে কেবল ধন আর ঐশ্বর্যের পিছনে দিনাতিপাত করাও সঠিক নয়। এই জন্যই আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মধ্যম পন্থা হচ্ছে উত্তম পন্থা।'

আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয় যে, একবিংশ শতাব্দির এই মানবসভ্যতায় পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্র বহুল প্রিয়তা লাভ করেছে। বিশ্বের অধিকাংশ সচেতন মানুষ পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রীয় শান্তির একমাত্র সোপান হিসেবে মূল্যায়ণ করতে শুরু করেছেন। সমাজে অশান্তি, অন্যায় আর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রীয় দারিদ্রতাকে দায়ী করেন। তাদের এই পুঁজিতান্ত্রিক ধারণাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করতে বিশ্ব মিডিয়াকে হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে, আজকের অধিকসংখ্যক সমাজ-সচেতন উলামায়ে কেরামও এই সুরে সুর মিলিয়েছেন। তারাও মনে করেন, 'একবিংশ শতাব্দিতে ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে, ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধি প্রথম শর্ত।' তাই তারা আত্মা বা প্রবৃত্তির জিহাদকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করে হেকমতের শ্লোগান দিচ্ছেন।

অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো।" (সূরা ২৮, আয়াত-৭৭)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম করো এই ভেবে যে, এখানে তোমাকে চিরকাল জীবিত থাকতে হবে। আর পরকালের জন্য আমল করো এই কল্পনা করে যে, আগামীকালই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।" (মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত, পৃষ্ঠা-৩০৩)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, "অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব না করা পর্যন্ত যারা খাবার-দাবার স্পর্শ করে না, আমরা হচ্ছি সে শ্রেণীর লোক। পেটে ক্ষুধা থাকতেই আমরা খাওয়া থেকে উঠে পড়ি।" (মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত, পৃষ্ঠা-১৫০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একবার প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সুন্নাত কি? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মা'রিফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে আমার সম্পদ, যুক্তিজ্ঞান হচ্ছে আমার ধর্মের বুনিয়াদ, প্রেম-প্রীতি আমার কাজের ভিত্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা হলো আমার বাহন, আল্লাহ্র যিকির আমার সাথী, বিশ্বাস আমার কোষাগার, চিন্তা আমার জীবন পথের বন্ধু, ইল্ম বা জ্ঞান হচ্ছে আমার হাতিয়ার, ধৈর্য আমার চাদর, সন্তুষ্টি আমার সম্পদ, দারিদ্র আমার গর্ব, কৃচ্ছ্রতা আমার ভূষণ, ইয়াক্বীন হচ্ছে শক্তি, সততা আমার সুপারিশকারী, ইবাদত আমার প্রাচুর্যের উপকরণ, সংগ্রাম আমার স্বভাব এবং নামায হচ্ছে আমার প্রশান্তি।" (মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত, পৃষ্ঠা-৩০৪)

শারীরিক জিহাদঃ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে লড়াই করো, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

উপরোক্ত আয়াতের শব্দ ও বাক্যগুলোই বলে দিচ্ছে- শারীরিক জিহাদ কখন, কিভাবে এবং কার সাথে করতে হয়।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু কোনো এক জিহাদে একজন মুশরিক বীরের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। মুশরিক বীর লোকটি যুদ্ধরত অবস্থায় যখন অনুমান করলো যে, সে হেরে যাবে! তখন সে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর মুখের উপর থুথু মেরে দিলো। সাথে সাথে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে ছেড়ে দেন এবং তরবারী ফেলে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মুশরিক বীর হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আলী! কি হলো! আমাকে নাগালে পেয়েও হত্যা না করে তরবারী ফেলে দিলে যে? হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, তোমার সাথে যুদ্ধ করা চলে না। কারণ, কাল হাশরের মাঠে আল্লাহ্ আমাকে যদি প্রশ্ন করেন, তুমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে বীরত্ব দেখাতে পারো নি, বরং প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করেছো!

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর কথা শুনে মুশরিক ব্যক্তি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যান।

আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আল্লাহর বাহিনী হিসেবে। অর্থাৎ এই বাহিনীর কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে, পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অপকর্ম দূরীভূত করা। সুতরাং পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ করতে হয়। কারণ- শত্রুরা কখনো সত্য ও ন্যায়ের পরিবেশ সহ্য করতে পারে না, তাই বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে- অস্ত্র দিয়ে তা দমন করতে হয়। যেমন, ষষ্ঠ

হিজরীর হজ্ব মৌসুমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪শ' সাহাবী'র এক বিরাট বহর নিয়ে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা করেন। মক্কা শরীফের অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলে, মক্কার কাফির শক্তি তাঁদের বাধা দেয়। যেহেতু এটা পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই কাফিরদের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তাঁরা হজ্জ এবং উমরা পালন না করেই মদীনায় ফিরে আসেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরীতে যখন আবার হজ্জে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যদি এবার তারা চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে কি করা? কারণ- পবিত্র মাসগুলোতে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

এই কারণেই বলা হয়, ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বা 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' ফরযে কিফায়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে আইন। অর্থাৎ শত্রুরা যখন ইসলামের সত্য ও ন্যায় গুড়িয়ে দেবার জন্য কোন দেশ কিংবা সমাজের উপর সমরাক্রমণ চালায়, তখন ঐ দেশ কিংবা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের উপর সশস্ত্র প্রতিরোধ করা 'ফরযে আইন' হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে।' উদাহরণস্বরূপ- ফিলিস্তিন, চেচনীয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, আজারবাইজান, সোমালিয়া, তাজিকিস্তান ইত্যাদি দেশে আজ অব্যাহতভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না।" (সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫৪)

এই জন্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করবেন এবং প্রশ্ন করবেন- তোমাদের আর কোনো খাইশ বা অভিপ্রায় আছে কি? 'তখন শহীদগণ উত্তরে বলবেন, আমরা আবার দুনিয়াতে যেতে চাই এবং বার বার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে চাই।' যদিও এটা সম্ভব নয়।

আশির দশকে সংঘটিত আফগান জিহাদের ইতিবৃত্তে উক্ত আয়াতের অনেকগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আর্থিক জিহাদঃ

আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জনের পাশাপাশি ধন-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করাও ফরযে কেফায়া এবং প্রয়োজনে ফরযে আইন।

তাবুক যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতিপর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ধন-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। আদেশ করা মাত্রই হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বীয় অর্জিত সম্পদের সবটুকুই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করেন। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর অর্জিত সম্পদের অর্ধেক এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম উল্লেখযোগ্য অংকের সম্পদ দান করেন। মহিলা সাহাবীগণের অলংকারাদির

বিরাট এক স্তুপ জমা করা হয়েছিলো হুজুর সাল্লাল্লামের সামনে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর তোমাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো।" (সূরা আছ-ছাফ, আয়াত- ১০)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উত্তম জিহাদ হলো নিজের মাল ও জান দ্বারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।" (মিশকাত)

আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ার সকল উন্নয়নশীল দেশ ও জাতির টার্গেট হচ্ছে- ইসলাম। ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করাই হচ্ছে পূঁজিতান্ত্রিক মানবতার একমাত্র লক্ষ্য। তাই আজকের প্রচার মাধ্যমগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাসী তৎপরতা, মানবতা বিধ্বংসী নীতি, বিশ্ব শান্তির অন্তরায় ইত্যাদি অনেক কথাই বলছে। তাদের এসব কথা ও প্রোপাগান্ডা বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেও সক্ষম হয়েছে। আর তা হয়েছে কেবলমাত্র পূঁজিতান্ত্রিক সমৃদ্ধির কারণে।

ফলে একদল বিজ্ঞ আলিম ইদানিং বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদের পক্ষাবলম্বন করে বর্তমান যুগকে 'মিডিয়া জিহাদ'র যুগ বলে অভিহিত করছেন। তাদের দৃষ্টিতে প্রচার মাধ্যমে হোক উত্তরাধুনিক যুগের অভিনব জিহাদ। তাই এই যুদ্ধের হাতিয়ার হচ্ছে, বুদ্ধি-বিবেচনা, বিচক্ষণতা, সমাজ-সচেতনতা ও শিক্ষানুরাগ ইত্যাদি। আর এগুলোর জন্যে চাই সামাজিকভাবে বস্তুবাদী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পরকালীন মুক্তি, সাফল্য ও উন্নতি লাভ করাই যার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা- আল্লাহ তাআলা তার পার্থিব প্রয়োজনের যাবতীয় চিন্তার জামিনদার হন এবং সকল সমস্যা সমাধান করেন।" (ইবনে মাজাহ্)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একেকটি ফিৎনা ও পরীক্ষার বস্তু ছিলো। আমার উম্মতের পরীক্ষা ও ফিৎনার বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ।" (মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো না, যা তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা হলো তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এইই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে!" (সূরা সাফ্ফ, আয়াত ১০-১১)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদ ব্যক্তির সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয়, সেও জিহাদ করে। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের বাড়ীতে পাহারাদার হয়, তারও জিহাদে অংশগ্রহণ করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, "এই দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত লড়াইয়ে নিমগ্ন থাকবে।" (মুসলিম)

ইল্‌ম বা জ্ঞান চর্চার জিহাদঃ

পবিত্র কুরআনে ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জন সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের শুরুতেই ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বর্ণনা করেন, "ফেরেশ্‌তাকুল ও মধ্যপন্থী আলিমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্‌তাকুলের সাথে আলিম বা জ্ঞানীদের মর্যাদার সমতা রক্ষা করেছেন। কারণ, ফেরেশতাকুল আল্লাহ্‌ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করেন, আর জ্ঞানীগণ কিতাব অধ্যয়ন বা ইল্‌মের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দেন। ফলে, মর্যাদার দিক থেকে দু'দলই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য মানুষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন, "বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলিমরাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, "আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি। এগুলো তারাই বুঝে, যারা জ্ঞানী।" (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে- পয়গম্বরগণ, অতঃপর জ্ঞানী লোকগণ ও শহীদগণ।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

এই হাদীস দ্বারা জ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, এটা নবুওয়তের পরে এবং শাহাদতের অগ্রে। অথচ শাহাদতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

যেমন- একটি হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধের ময়দানে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা জান্নাতী মুজাহিদ দেখতে চাও? উত্তরে বলা হলো হ্যাঁ! তিনি একটি লোকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথচ লোকটি কাফির দলের যোদ্ধা, অত্যন্ত বীর বলে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার জন্যে যুদ্ধ করছেন? উত্তরে বলা হলো- এক আল্লাহর জন্যে! যিনি ইহকাল ও পরকালের মালিক। তুমি আমি সকলের পালনকর্তা। লোকটি প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করলে কি হবে? উত্তরে বলা হলো, ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি। লোকটি বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তরবারী নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শহীদ হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখলে তো! লোকটি একটু আগে ছিলো কাফির, এইমাত্র মুসলমান হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা সিজ্‌দা দেবারও সময় পেলো না, জান্নাতে পৌঁছে গেলো।

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ এটাই যে, ব্যক্তির অন্তরে এবং কণ্ঠে যখন ঈমানের সাক্ষ্য উচ্চারিত হয়, তখন এটাকে সত্যের জ্ঞান বলে। আর এ জ্ঞানের প্রতিফল হচ্ছে- আল্লাহর জান্নাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলার ইবাদত কোন কিছুর মাধ্যমে ততটুকু সমৃদ্ধ হয় না, যতটুকু দ্বীদের জ্ঞানের মাধ্যমে হয়। একজন দ্বীনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজার ইবাদতকারী অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফিকাহ্ (দ্বীনি ইল্ম)।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "জ্ঞানী ব্যক্তি রোযাদার, ইবাদতকারী ও জিহাদকারী অপেক্ষা উত্তম। আলিম ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইসলামে এমন শূন্যতা দেখা দেয়, যা তার উত্তরসূরী ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "জ্ঞানী লোকদের লেখার কালি এবং শহীদদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশি হবে।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "হে লোকসকল! জ্ঞান অর্জন করো জ্ঞানকে তুলে নেয়ার পূর্বে। জ্ঞান তুলে নেয়ার অর্থ জ্ঞানী লোকদের মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তারা জ্ঞানী লোকদের মাহাত্ম্য দেখে আকাংখা করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জ্ঞানী অবস্থায় পুনরুত্থিত করলেই ভালো হতো। কেউ জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়।" (হরযত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ও তাঁর ফিকাহ্- ডঃ হানাফী রাযী)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ইবাদতকারী ও জিহাদকারীদেরকে বলবেন, 'জান্নাতে যাও। আলিম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন, ইলাহী! তারা আমাদের জ্ঞানের বদৌলতে ইবাদত ও জিহাদ করেছে; অর্থাৎ সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমরা।' (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

উপরোল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও বাণীগুলো প্রত্যক্ষ করে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে, জিহাদ অপেক্ষা জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট। আসলেও তাই। কিন্তু কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয় এবং দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে শহীদ হয়, তাহলে মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছে?

কিয়ামতের দিন পয়গম্বর, জ্ঞানী ও শহীদ সমান মর্যাদার অধিকারী। একইভাবে, কিয়ামতের দিন যখন জ্ঞানীর কলমের কালি এবং শহীদের রক্ত পাল্লায় ওজন করা হবে, তখন 'রক্ত' যদি হয় ঐ 'আলিম' শহীদের, তাহলে সম্মান ও মর্যাদা কতগুণ বেশি হতে পারে?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।" (মিশকাত)

কারণ, "সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক সম্পর্কে জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন, আল্লাহ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হলো, আমরা আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, আপনি ইল্‌ম সম্পর্কে বলছেন! তিনি বললেন, ইল্‌মের সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়।" (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)

অতএব- দুনিয়াবী জীবনের মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভ। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ ও পাথেয়। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ ও পাথেয় আবিষ্কার করার নাম হচ্ছে জ্ঞানার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা বা জিহাদ।

অন্য কথায় এটাও বলা যায়, 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আল্লাহকেও চিনতে পেরেছে।' অর্থাৎ নিজেকে চেনার জন্য জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, আর অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহকে চিনতে হলে আমলের প্রয়োজন এবং আমলের বাহ্যিক রূপ হচ্ছে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্। (মুজাহিদের আযান জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ- মাওলানা মাসউদ আজহার)

অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদঃ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৯)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাবার আগে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতাংশ হচ্ছে, "কালা লাও আন্না লী বিকুম কুওওয়াতান আও আবী ইলা রুকনিন শদীদ।" মর্মার্থ হচ্ছে, 'যদি আমার শক্তি থাকতো তাহলে আমি তোমাদের সাথে লড়াই করতাম।'

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রতি সর্বপ্রথম পুরুষদের মাঝে ঈমান এনেছিলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লুত আলাইহিস সালাম এবং মহিলাদের মাঝে হযরত সারাহ আলাইহিস সালাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শেষ জীবনটা শাম দেশেই অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি একটি মেহমানখানা তৈরী করেন এবং প্রতিদিন কোনো পথিক মেহমানকে নিয়ে খাদ্য-খাবার গ্রহণ করতেন। এটা ছিলো তাঁর অভ্যাস। মাঝে মধ্যে কোনদিন কোনো মেহমান না এলে তিনি রোযা রাখতেন। একবার তাঁর বাড়ীতে সাতদিন পর্যন্ত কোনো মেহমান এলেন না। তিনিও সাতদিন পর্যন্ত রোযা রাখলেন। আল্লাহ্ তাআলা তখন হযরত জিবরাঈল, হযরত ইসরাফীল, হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালাম-সহ বারোজন ফেরেশ্‌তাকে মানুষের বেশে পাঠালেন তিনটি দায়িত্ব দিয়ে। এক) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এঁর রোযা ভঙ্গ করানো। দুই) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পুত্র ইসহাকের ঔরসে নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এঁর জন্ম নেবার সুসংবাদ দান। তিন) হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এঁর দুষ্কর্মে লিপ্ত সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মেহমানরূপী ফেরেশ্‌তাদের চিনতে ভুল করেন নাই। তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তাদের সাথে যেতে চাইলেন। এতে ফেরেশতাগণ তাঁকে বাধা

দিলেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি হয়তো মানসিকভাবে সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। কিছুটা পথ (দেড় ক্রোশ) অতিক্রম করেই ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি এখানেই থাকুন। আপনার জন্য সামনে অগ্রসর হবার অনুমতি নেই।

ফেরেশতাগণ মুসাফিরের বেশে হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। হযরত লূত আলাইহিস সালাম তখন নির্জন ঘরে ইবাদতে লিপ্ত। তাই মুসাফিরদের ডাকে তাঁর কন্যাগণ দরোজার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি চান? উত্তরে বলা হলো, আমরা মুসাফির! রাত্রি যাপনের জন্যে ঠাঁই খোঁজছি! হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর কন্যাগণ বললেন, আমাদের আব্বা হুজুর এখন নির্জন ঘরে ইবাদত করছেন। আমরা এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবো না। তিনি ইবাদতখানা থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন। মুসাফিররূপী ফেরেশতাগণ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত লূত আলাইহিস সালাম ইবাদতখানা থেকে বের হয়েই দেখলেন, কয়েকজন উজ্জ্বল চেহারার সুদর্শন যুবক তাঁর বাড়ির বাইরে অপেক্ষমাণ। তাদের পরিধেয় সুগন্ধযুক্ত মসৃণ পোষাক-পরিচ্ছদ। তারা সকলেই তরুণ-যুবক বয়সের ভিনদেশী অপরিচিত লোক। হযরত লূত আলাইহিস সালাম ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাদেরকে ঘরের ভিতর ঢুকতে বললেন। কারণ, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এতোই জঘন্য দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলো যা ভাষায় প্রকাশ করা তাঁর জন্যে কষ্টকর। তিনি আল্লাহর নবী অথচ তাঁরই আশে-পাশের লোকেরা জঘন্য প্রকারের অসামাজিক, অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো। তিনি এ জাতীর কল্যাণের জন্যে সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। এমনকি তাঁর সহধর্মিনীও ঐসকল দুষ্কর্মশীলদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ কানে নিতো না। এই সম্প্রদায়ে ছিলো মোট ছয়টি গোত্র। হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতে একমাত্র 'সাদুম' নামক গোত্রটিই নবীর দেখানো সৎ পথে পরিচালিত হয়। সাদুম গোত্রের লোকেরা অন্যান্য পাঁচটি গোত্রের সাথে উঠা-বসা, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করে দেয়।

মেহমানরূপী ফেরেশতাদের এক প্রশ্নের জবাবে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম- বলেছিলেন, এই স্থান ও এ জাতির লোকেরা দুষ্কৃতিকারী, অশ্লীল কাজে লিপ্ত। এদের পুরুষ নারী নির্বিশেষে সবাই সমকামী। এরা পথিক মুসাফির নির্বিশেষে সব লোকের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। যারা এ রকম রাহাজানি, সন্ত্রাসী ও অশ্লীল গর্হিত অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে- তাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হবে। এদের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

হযরত লূত আলাইহিস সালাম মুসাফিরদের ঘরে ঢুকিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, 'আমার গৃহে আগত মেহমানরা সবাই কম বয়স্ক, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ঠ সুদর্শন লোক। আল্লাহ না করুন, দুষ্কর্মশীল এ সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি টের পায় এবং তাদের সাথে অশোভনীয় করে, তখন আমি কি করবো? ইত্যাদি চিন্তাভাবনা করে হযরত লূত আলাইহিস সালাম অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তাঁর দুশ্চিন্তার বিবরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

“আর আমার প্রেরিতরা লূতের নিকট পৌঁছলো, তাদের আগমনে তিনি শংকিত এবং মন-ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন, আজকের দিনটি বড়ই কঠিন এবং লূতের সম্প্রদায় হন্তদন্ত হয়ে দৌঁড়ে তাদের কাছে এলো, এরা পূর্ব থেকেই দুষ্কর্মশীল সম্প্রদায়।” (সূরা হুদ, আয়াতাংশ ৭৮)

হযরত লূত আলাইহিস সালাম মেহমানদের ঘুরে ঢুকিয়ে যা চিন্তা করেছিলেন, তা-ই হলো। তাঁর স্ত্রী দুষ্কর্মশীলদের গোপনে জানিয়ে দিলো যে, তাদের ঘরে মেহমানরূপী বারোজন সুদর্শন যুবকেরা অবস্থান নিয়েছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র দুষ্কর্মকারী দৌঁড়ে এলো হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর বাড়িতে। এসে বললো, আপনার ঘরে যে বারোজন মেহমান এসেছে, তাদেরকে আমাদের কাছে অর্পণ করুন। তিনি তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা হুবহু পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “হে আমার সম্প্রদায়! আমার এই মেয়েরা সমুপস্থিত, তারা তোমাদের জন্য পবিত্রও বটে, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে আমার মেহমানদের কাছে অপমানিত-লজ্জিত করো না; তোমাদের মাঝে কি একজনও ভালো মানুষ নাই!” (সূরা হুদ, আয়াতাংশ ৭৮)

যদিও কাফিরদের সাথে বিবাহ-বন্ধন সর্বকালেই হারাম ছিলো। তবু হযরত লূত আলাইহিস সালাম নিজের মেয়েদেরকে কাফিরদের সাথে বিয়ে দিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র আতিথেয়তা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু দুষ্কর্মশীলরা সম্মত হলো না। হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর প্রস্তাবের জবাবে সমকামীরা যে মন্তব্য করেছিলো, তা-ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, “তুমি তো জানো তোমার মেয়েদের প্রতি আমাদের কোনো দাবী নাই এবং আমরা কি চাই তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।” (সূরা হুদ, আয়াতাংশ ৭৯)

তখন হযরত লূত আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, “যদি তোমাদের উপর আমার কোন শক্তি থাকতো অথবা কোনো সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম” (সূরা হুদ, আয়াতাংশ ৭৯) মর্মার্থ হচ্ছে, ‘যদি আমার শক্তি থাকতো তাহলে আমি তোমাদের সাথে লড়াই করতাম। কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় পার্থনা করছি যেনো তিনি তোমাদের দুষ্ট আচরণ থেকে আমার মেহমানদেরকে সুরক্ষা করেন।’

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হযরত লূত আলাইহিস সালাম কর্তৃক তিন বার অভিযোগ না এলে লূত সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের পরিচয় দিবেন না। তাই মেহমানরূপী ফেরেশতাগণ গৃহাভ্যন্তরে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময়ের জন্য।

দুষ্কর্মকারীরা হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর ঘরের দরোজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকার চেষ্টা করলে, তিনি মেহমানদের গিয়ে বললেন, আমি এসব দুষ্কৃতকারী অভিশপ্তদের সমশক্তির অধিকারী নই যে, তাদের দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে এবং আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারি! তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নাই। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি মেহমানদের নিকট এই অভিযোগ করছিলেন। তখন দুষ্কৃতকারী ঘরে ঢুকে হযরত লূত আলাইহিস সালাম-কে গালাগালি করে, এমনকি ঠেলাধাক্কা দিয়েও তাঁর সাথে বেআদবীপূর্ণ ব্যবহার দেখায়, যাতে তারা মেহমানদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। নিরুপায় হয়ে তিনি মেহমানদের কাছে স্বীয় অক্ষমতার কথা বিবৃত

করেন। হযরত লূত আলাইহিস সালাম এভাবে তিনবার নিজের অক্ষমতা ও অভিযোগ মেহমানদের কাছে ব্যক্ত করলে, মেহমানরূপী ফেরেশতাগণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভাষায় বলেন, "হে লূত! আমরা আপনার রবের প্রেরিত, এরা কখনই আপনার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, সুতরাং রাতের কোনো অংশে আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, আর আপনাদের কেউ যেনো পেছনে ফিরে না দেখে, কিন্তু আপনার স্ত্রী এখানেই থাকবে, তার উপরও সেই আপদ আপতিত হবে যা অন্যদের উপর হবে, নিশ্চয়ই তাদের আযাবের ওয়াদাকৃত সময় হচ্ছে ভোর রাত, ভোর রাত কি নিকটে নয়?"

হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর সাথে ফেরেশতাদের পরিচয় পর্ব ও কথাকথনের সময় দুষ্কৃতকারীরা রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরের ভিটি খুঁড়তে শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য, মেহমানদের জোর করে ছিনিয়ে নেবে। তাদের এই অভিপ্রায় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "আর নিশ্চয়ই তারা অসদুদ্দেশ্যে লূত হতে মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নেয়ার সংকল্প করেছিলো, অতএব, আমি তাদের চোখ তুলে ফেললাম, সুতরাং এখন আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শনের স্বাদ আস্বাদন করো। অতঃপর তাদের প্রতি চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হলো ভোর রাতে, সুতরাং আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো।"

দুষ্কৃতকারীদের যারা হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর ঘরে ঢুকে ছিলো, তাদের লক্ষ্য করে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ফুঁক দিলে তাদের চোখ, মুখ, কান একাকার হয়ে যায়। এতে তারা হাউ মাউ করে চিৎকার করে বলতে থাকে, লূত আলাইহিস সালাম জাদুকরদেরকে নিজের ঘরে স্থান দিয়েছেন। তখন তারা বললো, তোমার জাদুকরদের বলো আমাদের চোখ ভালো করে দিতে, তখন আমরা দুষ্কর্ম থেকে তওবা করবো। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম স্বীয় হাত তাদের চেহারায় বুলিয়ে দিলে তারা সুস্থ হয়ে গেলো। এভাবে তিনবার তাদেরকে প্রত্যক্ষ শাস্তি প্রদান করা হলো এবং সুস্থ করা হলো। কিন্তু তাদের পূর্ববত সংকল্প ঠিকই। তৃতীয়বার সুস্থ হয়ে তারা শহরের সকল নগরতোরণ ও রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়, যাতে মেহমানরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে না পারে। এই অবস্থা দৃষ্টে ফেরেশতাগণ হযরত লূত আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আবাসস্থলে পৌঁছে দেন। আর এদিকে, ফেরেশতগণ ভোর হতে না হতেই লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটি গোত্রের অবস্থানস্থলকে উল্টে দেন। লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনের সময় ফেরেশতাদের বিকট চিৎকার কয়েকশ' মাইল দূর থেকে হযরত লূত আলাইহিস সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুনতে পান। এক পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বেহুশ হয়ে পড়েন। কিন্তু আল্লাহর কুদরত- লূত সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতকারীরা টুশব্দটিও টের পায় নি। সমস্ত জনপদ মাটির সাথে মিশে যায়। মহান আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সেই ধ্বংসস্তুপের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এভাবে, "অনন্তর যখন আমার আদেশ এসে পৌঁছে তখন আমি সে জনবসতির উপর দিককে নীচে করে দিলাম এবং আমি তার উপর উপর্যুপরি ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম।" (সূরা হূদ, আয়াত ৮২)

এখানে উল্লেখ্য যে, সামুদ গোত্রের লোকেরা পূর্ণভাবে ঐ আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

কারণ, পূর্ব থেকেই দুষ্কর্মশীলদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ছিলো বলে আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করেন। যদিও হযরত লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলো।

তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ কি? এর অর্থ হচ্ছে, সমাজে যখন অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, তখন এইগুলো বন্ধ করার দায়িত্ব বর্তায় সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের উপর। আর সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গ বলতে এদেরকেই বুঝানো হয়, যারা জ্ঞানে-গুণে-শিক্ষায়-বুদ্ধিবৃত্তিতে অগ্রসর। অর্থাৎ শিক্ষিত বা আলিম সমাজ। কিন্তু সমাজের আলিম সমাজ যখন হেলাফেলা এবং কৌশলের পথ ধরে সমাজের অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেও পাশ কাটিয়ে চলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব পতিত হয়। হযরত লূত আলাইহিস সালাম কিন্তু স্বীয় চেষ্টা-সাধনায় অক্ষম ছিলেন না, বরং সমাজের অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ ছিলো তাঁর চেয়ে প্রবল। আর আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো চিরতরে বন্ধ করা। সুতরাং গজব দিয়ে দুষ্কর্মকারীদের ধ্বংস করা হয়েছে। (কাসাসুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, আজকের মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদে অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লিপিবদ্ধ করতে গেলে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে পৃথিবীর সুশ্রী নামক দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়ার আচে প্রদেশে পতিত হলো সুনামী নামক আল্লাহর একটি গজব। পানি এসে সমস্ত জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। ঘর-বাড়ি দালান-কোঠা চুরমার করে দিলো, অথচ আল্লাহর ঘর মসজিদ রইলো অক্ষত। সমীক্ষায় জানা গেছে, সুনামী আঘাতে প্রায় দু'লক্ষাধিক লোক মারা গেছে। তাদের মাঝে তিন চতুর্থাংশ ছিলো মুসলিম। কিন্তু কেউ রক্ষা পায় নি। কারণ, বিশ্বের জঘন্যতম বেশ্যাবৃত্তির প্রাণকেন্দ্র বলে খ্যাত যতোগুলো শহর আছে, তার মধ্যে ঐ এলাকাটিও ছিলো একটি। আল্লাহ তাআলা এসব অপকর্ম সহ্য করেন না।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যা হয়। কোটি কোটি টাকার ক্ষতিসহ লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, অর্ধাহারে এবং নানা অসুখ-বিসুখে মারা যায়। কিন্তু এগুলো যে আল্লাহর গজব নয়! তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কারণ- আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে লড়াই করো, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাকে অধিকাংশ লোক সশস্ত্র যুদ্ধের জন্যে বাছাই করে রেখে দিয়েছেন। অথচ আজকের পশ্চিমা শত্রুশক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের আগে বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তারা জানে, মুসলিম সমাজে যখন অবাধ যৌনতা, সমকামিতা, মিথ্যা, অহংকার ও মুনাফিকী বৃদ্ধি পাবে, তখন আকাশ থেকেই পতিত হবে আযাব- ধ্বংসাত্মক তান্ডব। সুতরাং পাপাচার নামক ঘুণপোকা যখন মুসলিম শরীরকে অন্তর্ঘাতে লিপ্ত করবে, তখন আর আধুনিক বোমারু বিমান দিয়ে বিধ্বস্তখেলায় মেতে উঠার প্রয়োজন থাকে না। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আজকের মুসলিম সমাজে।

মৃত্যু থেকে পলায়ন এবং জিহাদের আহ্বানঃ

সূরা বাকার ২৪৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, “তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি- মৃত্যু বিভীষিকাকে এড়াবার জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন- তোমরা মরো; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন; নিশ্চয় মানবগণের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।”

পরবর্তী আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে, “তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করো এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।”

উপরোক্ত দু’টো আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়েছে, ‘হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা চার থেকে (মতান্তরে) চল্লিশ হাজারের মতো ছিলো। তারা ‘যাওয়ারদান’ কিংবা মতভেদে ‘আযরাআত’ নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলো। প্লেগ রোগে মারা যাবার ভয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে দু’জন ফেরেশতার বিকট চিৎকারে তারা সবাই মারা যায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অস্থিগুলোও চুনে পরিণত হয়। ঘটনাক্রমে বনী-ইসরাঈলের একজন নবী ‘হিযকীল আলাইহিস সালাম সে স্থান দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি এই জনবসতির জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দেন, ‘তুমি বলো- হে গলিত অস্থিগুলো! আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও।’ অতঃপর প্রত্যেকটি শরীরের গোশ্ত, শিরা-উপশিরা ও রূহকে পর্যায়ক্রমে নির্দেশ করা হলো আর মানুষেরা জীবিত হয়ে গেলো। সবাই একসাথে জীবিত হয়েই উচ্চারণ করলো, “সুবাহানাকা লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।” অর্থাৎ ‘আপনি পবিত্র। আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই।’ কিয়ামতের দিন ঐ দেহের সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আত্মার উত্থিত হওয়ার এটা দলিল।

মুসনাদ-ই-আহমদের হাদীসে রয়েছে, ‘যখন হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সিরিয়ার দিকে গমন করেন এবং সারাবা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রভৃতি সেনাপতিদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা তাঁকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ায় আজকাল প্লেগ রোগ রয়েছে। এখন তাঁরাও তথায় যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যখন এমন জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছো, তখন তোমরা তার ভয়ে পলায়ন করো না। আর যখন তোমরা কোন জায়গায় বসে তথাকার সংবাদ শুনতে পাও তখন তোমরা তথায় যেও না।’ হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে আল্লাহ্র প্রশংসা করতঃ তথা হতে ফিরে যান। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এটা আল্লাহ্র শাস্তি যা পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো। অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘ঐ লোকদের পলায়ন যেমন তাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে

পারলো না, তদ্রূপ তোমাদেরও যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৃথা। মৃত্যু ও আহার্য দু'টোই ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নির্ধারিত আহার্য বাড়বেও না কমবেও না। তদ্রূপ মৃত্যুও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আসবে না বা পিছনেও সরে যাবে না।' (তাফসীর ইবনে কাসীর প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৮৩-৬৮৪)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথমটির ভাবার্থ হচ্ছে, 'যারা মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।' ঠিক পরের আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো"

কারণ অন্যস্থানে বলা হয়েছে, 'তারা বলে- হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করেছেন কেনো? কেনো আমাদেরকে সামান্য কিছুদিনের জন্য অবসর দিলেন না? তুমি বলো- ইহলৌকিক জগতের পুঁজি সামান্য এবং যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্যে পরকালই উত্তম এবং তোমরা এতটুকুও অত্যাচারিত হবে না।' (তাফসীর ইবনে কাসীর প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৮৩-৬৮৪)

এতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, পারলৌকিক উত্তমতা অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ফরয। যেহেতু মৃত্যু থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। এটা ভাগ্যে নির্ধারণ করা হয়ে গেছে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র এই নির্দেশগুলোর মর্মার্থ এটাই যে, তোমরা যখন মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পলায়ন করছো, এবার তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো। যাও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করো। পৃথিবীর যেখানেই কুফরী প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই আক্রমণ করো। পৃথিবীর যেখানেই ফিতনা সৃষ্টি হবে, সেখানেই যুদ্ধ ঘোষণা করো। কারণ, তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্যে। এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা বা ইবাদত পৃথিবীতে চলবে না। পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতা ছাড়া আর কোনো বিচার-আদালত প্রতিষ্ঠা চলবে না। অতএব, সমাজে কুফরী, মুনাফিকী, ফিতনা ইত্যাদি ধ্বংস করার লক্ষ্যে অস্ত্র ধরো। যুদ্ধ করো। মনে রেখো, এই দুনিয়াটা ক্ষণিকের এবং পরকাল চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবন পরীক্ষা কেন্দ্র, আর পরকাল ফলাফল লাভের স্থান। পরীক্ষা দিতে এসে পৃথিবীতে যারা ফিতনা সৃষ্টি করে, তাদের মূল উৎপাটন করাই মুমিনদের সর্বোত্তম ফরয- জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ্।

অতএব বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালন করতে হলে, মুসলমানকে মুমিন হতে হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ দিতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। আর মুত্তাকী হওয়ার অর্থই দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি। অর্থাৎ যে কারণে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

শিশু শিক্ষার গুরুত্ব ও বর্তমান মুসলিম সমাজের অক্ষমতা

ঈমান দুই প্রকার, ১) ঈমানে তাহক্বিক্বী ২) ঈমানে তাক্বলিদী। ঈমানে তাক্বলিদী নিরাপদ কিন্তু নিম্নস্তরের। ঈমানে তাহক্বিক্বী উচ্চস্তরের তবে বিপজ্জনক।

আলোচ্য বিষয়ের নামকরণ হয়েছে, 'শিশু শিক্ষার গুরুত্ব ও বর্তমান মুসলিম সমাজের অক্ষমতা'। বিষয়সূচিতে এসেছে- 'তাহক্বিক্বী ঈমান' ও 'তাক্বলিদী ঈমান' সম্পর্কে। অর্থাৎ দু'টো ভিন্ন অর্থের বিষয় নিয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির আলোচনা করতে চাই।

তাহক্বিক্বী ঈমানঃ

আজকের দুনিয়ার তাবৎ মুসলিম এটা মোটামুটিভাবে অবগত আছেন যে, পৃথিবীতে নবী রাসূল পাঠানো হয়েছে আদর্শ শিক্ষাদানের জন্য। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে সেই পদ্ধতি শেখানোর জন্যই নবী-রাসূলদের মনোনয়ন। মানুষের মধ্য থেকেই যুগে যুগে নবী-রাসূল জন্ম নিয়েছেন এবং তাঁরা বিশ্বমানবতাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সুপথ প্রপ্তির শিক্ষাদান করেছেন। এটাই ছিলো নবী-রাসূলদের একমাত্র দায়িত্ব। সমসাময়িক মানুষের সাথে নবী-রাসূলদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। নবী-রাসূলদের সাথে আত্মঘাতি আক্রমণ পর্যন্ত চালানো হয়েছে। এমনকি নবী-রাসূলদের হত্যাও করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন, আল্লাহ্‌র একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে জীবন-যাপন করো। যেহেতু সবাইকে একদিন আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহী করতে হবে। মৃত্যু সবার জন্যই অবধারিত। নবী-রাসূলদের সমসাময়িক যারা বুঝেছে, তারা কামিয়াব বা উত্তীর্ণ হয়েছে। আর যারা নবী-রাসূলদের সময়ে ও পরবর্তীতে বিরোধিতা করেছে, তারাই শস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হবে।

একই কথা বা মূলমন্ত্র আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেও। তিনি নিঃসন্দেহে শেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবী ও রাসূল আসবেন না। তাই তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ রেখে গেছেন আমাদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্র হিসেবে।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ বাণী ও নির্দেশ। যা পালন বা আমল করা প্রতিটি মানুষের জন্য ফরয বা অবশ্যকরণীয়। একইভাবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হচ্ছে, তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনের কথা, কর্ম ও সাহাবীদের কথা এবং কর্মের সমর্থন। এখানে একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনেও কুরআনের বাইরে কোনো কথা বলেন নি এবং কোনো কাজ করেন নি। এমনকি নুবুয়াতী প্রাপ্ত হওয়ার আগে ও

পরে তিনি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। তিনি যা করেছেন, সব কুরআন বা আল্লাহ্র নির্দেশভিত্তিক। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জীবন-যাপন ও চলাফেরা করে এবং তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি, ওয়াজ-নসিহত, আদেশ-নিষেধ প্রত্যক্ষ করে সাহাবায়ে কেরামও শিক্ষা নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামগণের সেই সুশিক্ষার ফসলকে অত্যন্ত কাছে থেকে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন- তাবিঈগণ। তাবে-তাবিঈগণও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাবিঈদের ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতি রপ্ত ও প্রত্যক্ষ করেছেন।

সুতরাং অত্যন্ত সুক্ষ্ণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সকল ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণের পক্ষ থেকে ইসলামের পরিপূর্ণ ইল্‌ম ও জ্ঞান, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করেছেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইল্‌মের অর্থ হচ্ছে, ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআনের জ্ঞান, হাদীসের রাবীসহ মূল বাক্য ও মর্মার্থ জানা এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে যেকোনো সমস্যার সমাধান দানের ক্ষমতা রাখার মতো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে 'তাহক্বিক্বী ঈমান'-এর দাবীদার বলা যায়। অবশ্য, পরবর্তীতে যুগে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ইসলামের সর্বস্তরের বিদ্যার্জনে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরকেও প্রকৃত তাহ্‌ক্বিক্বী ঈমানের দাবীদার বলা অত্যন্ত কঠিন ও সুক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অনুসরণীয় যুগের দূরত্বের দরুণ হাদীসের রাবীদের সংখ্যা এতো বেড়েছে, যা পূর্ণ সঠিক নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। এই কারণেই 'তাহক্বিক্বী ঈমান' উচ্চস্তরের হলেও বিপজ্জনক বলা হয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের একটি বাক্যও যদি ভুল কিংবা মিথ্যারূপে আক্বিদার সাথে মিশে যায়, তাহলে ঈমানের সমস্ত ইমারতটা ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে, তাবে-তাবিঈ যুগের পরবর্তীকালের কোনো বিজ্ঞ আলিমই নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা ঈমান-আমলের দায়িত্ব পালন করতে সাহস করেন নি। বরং পূর্বসূরী কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করে আমল করেছেন। এ ক্ষেত্রে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলকারী ইমামগণও মুজতাহিদ ইমামদের তাক্বলিদ বা অনুসরণ করতেন।

তাক্বলিদী ঈমানঃ

ইসলামের প্রতি পূর্ণ হক্ক বা সত্যপন্থী কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি অনুসরণ করে ঈমান গ্রহণ করার নাম- তাক্বলিদী ঈমান। অর্থাৎ মাযহাবের অনুসরণ করে জীবন-যাপন করা। আমাদের মাযহাব বিষয়ের আলোচনায় এ ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

বিশুদ্ধ নিয়তঃ

উপরোল্লিখিত বিষয়সূচির বক্তব্যে যাবার আগে 'নিয়ত' সম্পর্কীয় বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা

সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে (উদ্দেশ্যে) তার হিজরত (পরিগণিত) হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ করা অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় তারই নিয়তে, যার নিয়তে সে হিজরত করেছে।" (বুখারী ও মিশকাত)

আলোচ্য বিষয়সূচিতে দুই প্রকার ঈমানের স্বরূপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং 'নিয়ত'-এর হাদীস উল্লেখ করার একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ, চৌদ্দশ' বছর পরের বংশপরম্পরায় ঈমান পাওয়া আজকের মুসলমানদের একটা জিনিষ জানা আছে যে, এই 'নিয়ত'-এর হাদীসটি 'সর্বপ্রথম হাদীস' হিসেবে বুখারী শরীফে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল বুখারী শরীফের সাতটি অধ্যায়ের প্রথমেই নিয়ত বা সংকল্পের হাদীসটি সাত বার উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কেও বিরাট ভূমিকা লেখা হয়েছে। স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ভূমিকায় 'নিয়ত'-এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং ঐ আলোকে বলা যায়, আমরা যারা একবিংশ শতাব্দির মুসলমান, আমাদের নিয়তের স্বরূপ কি? আমরা কোন্ নিয়তে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে চাই? নিয়তের স্বরূপ উন্মোচন করতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা নিয়ে রয়েছে বিরাট প্রশ্নবোধক। আজকের মুসলমান সমাজ নিয়ে যদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে প্রথমেই দুর্বল নিয়তের বিশাল ফিরিস্তি পরিলক্ষিত হবে।

উপমাস্বরূপ বলা যায়, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন শিশু বয়স অতিক্রম করে কৈশোরে পা-রেখেছেন, তখন তাঁর মা হযরত মরিয়ম তাঁকে উস্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন শিক্ষা গ্রহণের জন্য। মায়ের আদেশে ঈসা আলাইহিস সালাম মক্তবে গিয়ে অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে বসলেন। উস্তাদ তাঁকে পড়তে বললেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কি পড়বো?

উত্তরে বলা হলো- পড়ো, আলিফ।

তিনি উস্তাদকে প্রশ্ন করলেন, আলিফ অর্থ কি?

উস্তাদ বললেন, আলিফ শব্দের অর্থ জানার আগে তো শিখতে হবে!

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, অর্থ না জেনে, না বুঝে শিক্ষাগ্রহণ তো নিরর্থক? অতএব আলিফ-এর অর্থ আগে বুঝিয়ে দিন।

উস্তাদ এহেনো কিশোরের প্রশ্ন শোনে বিস্মিত হয়ে বললেন, বাবা! তুমি জানো আলিফ-এর অর্থ কি?

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ! আমি জানি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এঁর কণ্ঠে আলিফ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শোনে উস্তাদ অত্যন্ত হতচকিত সুরে বললেন, বাবা ঈসা! আমি তোমাকে শিক্ষা দিতে পারবো না। বরং তুমি নিজেই এই মানব সমাজের শিক্ষক। (মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ বিলালী'র ওয়াজের অডিও ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত, অডিও ক্যাসেট এখনো সংরক্ষণে আছে।)

এই উদাহরণের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি মানবশিশু জন্ম থেকেই শিক্ষিত হয়। বরং নবী-রাসূলগণ সাধারণ সমাজ থেকে একটু আলাদা। কারণ, তাদের অন্তরে জন্মলগ্ন থেকেই

অলৌকিক শিক্ষা জন্ম নেয় বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, আর তাঁরা সাধারণ সমাজে সেই শিক্ষার বিস্তার ঘটান। ফলে, সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপর ফরয দায়িত্ব হয়েছিলো যে, নবী-রাসূলদের নির্দেশিত শিক্ষা গ্রহণ করা। ইতিহাসে দেখা গেছে, একটি সুসংঘটিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো কোনো নবী-রাসূলগণ হাজার বছর জীবিত ছিলেন। এর কারণ, তারা শুধু বুড়োদের শিক্ষা দেবার জন্য নয়! বরং নুবুয়তী জীবনের ভিতর যারা জন্ম নিয়েছে, তারা যেনো সেদিন থেকেই দ্বীনি বা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে সুশিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এই অভিপ্রায়। তিনিও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর এই আদেশ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাঁর এই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা বিশ্বের সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের উপর ফরয। ফলে, তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ রেখে গেছেন দৈনন্দিন শিক্ষালাভের জন্য।

উপরোল্লিখিত 'নিয়ত'-এর হাদীসেও এই জিনিসটি পরিলক্ষিত। হাদীসের ভাষ্যে হজ্জের উল্লেখ রয়েছে। শাব্দিক অর্থগত দিক থেকে যদি হজ্জ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যায়- মানুষের জীবনে হজ্জ মাত্র একবার। সুতরাং এই হজ্জের ইবাদতটা যেনো সহীহ্ বা বিশুদ্ধ নিয়তে পালিত হয়। অন্যদিকে, হজ্জ সম্পর্কিত নিয়ত প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, মানুষের জীবনে হজ্জ যেমন একবার, তেমনি বাল্যজীবনও একবার। একটি শিশু যখন কৈশোরে পা-রাখে তখন থেকেই সে তারুণ্যের পর যৌবনের পথে চলতে শুরু করে। অতএব তখন থেকেই যদি পিতা-মাতার বিশুদ্ধ বা সহীহ্ নিয়ত এবং বিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃংখলা ও নির্দেশনার ভিতর শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে, তাহলে সে ইসলামী সমাজ গঠনে উপযুক্ত।

একইভাবে, হজ্জ ফরয করা হয়েছে মুসলিম সমাজের ধনী বা সামর্থ্যবানদের উপর। যারা দরিদ্র বা হজ্জের খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য নেই, তাদের উপর হজ্জ ফরয নয়। এদিক থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ করা যেমন ফরয, তেমনি সমাজে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্নদের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন করাও ফরয। একইভাবে, হালাল পথে খরচ করাও ফরয, আপন সন্তান-সন্ততিদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়াও ফরয। আর ইসলামী জীবন গঠনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাও ফরয। অতএব, 'নিয়ত'-টা যদি বংশপরম্পরার শুরু থেকেই নেওয়া হয়, তাহলে ইসলামী সমাজ গঠন মোটেই অসম্ভব নয়।

'নিয়ত'-এর হাদীসের ভাষ্যে 'বিবাহ' শব্দটিও উচ্চারিত হয়েছে। বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের জীবনে 'বিবাহ' একটি পবিত্র বন্ধন। তারুণ্যের পথ অতিক্রম করে যৌবনের অমোঘ আনন্দ কেবল বিবাহই দান করতে সক্ষম। আর বিবাহ যদি সহীহ্ বা শরীয়ত সম্মত হয়, পাত্র-পাত্রী যদি পুতপবিত্র নিয়তে, একটি সুন্দর ও সুশীল বংশপরম্পরা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিলিত হয়, তাহলে অবশ্যই তারা উত্তীর্ণ। অর্থাৎ এখানেও মহাকালের একটি সুবিশাল সমাজ গঠনের ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত। আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম তো এভাবেই বিশাল এই মানব সমাজের জন্ম দিয়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে, আজকের মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করতে চান। যেহেতু তা সকলের উপর ফরয। বিশেষ করে- শরীয়তি বিধান অনুযায়ী যাদের উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয, তাদের উপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কারণ, একদিকে তারা ধনী, দ্বিতীয়ত- আজকের সমাজের ধনীরাই বেশি জ্ঞানী ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন থাকেন। তৃতীয়ত- সমাজের চারিধারের দরিদ্র জনসাধারণের ভরণপোষণের দায়িত্বও (ক্ষেত্র বিশেষে) ধনীদের উপর দান করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সমাজের ধনী সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গই সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্ণ হক্বদার। অর্থাৎ তাদের উপর ফরয। এখন তারা যদি এই ফরয দায়িত্ব পিছনে রেখে, শুধু ঐশ্বর্য হাসিলের ধান্ধায় দিনাতিপাত করেন, তাহলে যেমন তারা দায়ী হবেন, তেমনি তাদের জন্য শুভনীয়ও নয়। কারণ- ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম মাত্রেই ফরয। কিন্তু দরিদ্ররা অধিক মেধাবী হলেও ব্যক্তিজীবনের চাপে থাকেন সর্বক্ষণ। অন্যদিকে, ধনী ব্যক্তিবর্গ ধন-দৌলত ও মেধা এই দু'দিক থেকেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রাপ্ত।

অতএব 'নিয়ত' বিষয়টাকে যদি মুসলিম ব্যক্তির জন্মলগ্ন থেকে ধরে নেই। তাহলে দেখা যাবে, আজকের মুসলিম ঘরে ঘরে শিশু শিক্ষার মারাত্মক অবণতি ঘটে চলেছে। সেদিকে অনেকেরই খেয়াল নেই। আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজের দিকে লক্ষ্য করে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ একরকম, আর সমাজ আরেক রকম। বিলেতের সরকারী স্কুলগুলোতে উপস্থিতির জন্য শিশু-কিশোরেরা পাগল হয়ে যায়। একটু দেরী হবার ভয়ে তারা ভোর থেকেই প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে। কিন্তু কেনো? কি এমন মধু তাদের স্কুলগুলোতে?

বিজ্ঞজনেরা হয়তো বলবেন, সরকারী স্কুলগুলোতে শিশুতোষ খেলাধূলা, নানাবিদ ছবি চিত্র তাদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করছে! যে কারণে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা স্কুলে যাবার জন্য এতো উন্মুখ থাকে।

এখন যদি বলা হয় যে, এদেশের সরকারী স্কুলগুলোর পাশাপাশি তো মাদ্রাসা, মক্তব তৈরী হয়েছে। সেগুলোতে কেনো মুসলিম ছেলে-মেয়েরা ঐ আগ্রহ নিয়ে যেতে চায় না? মাদ্রাসা মক্তবের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয় না? যদিও যায়, তাও একমাত্র পিতা-মাতার অনুরোধ, তোষামোদী ও শাসনের ভয়ে। কিন্তু সরকারী স্কুলগুলোর মতো মাদ্রাসায় সেই পরিবেশ নেই কেনো?

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার মাদ্রাসা মক্তব খোলা হয়েছে। আর সে সকল ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের শতকরা নিরান্নব্বই জন শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কেবল দুঃখী দরিদ্রের সন্তানেরা। পিতা মাতার ফরয দায়িত্ব আদায় আর তাদের দায়িত্ব পালনের ভয়ে তারা মাদ্রাসা, মক্তবে হাজিরা দেয়। বাকীদের যারা পিতা-মাতার অনুরোধ, তোষামোদী ও শাসনের ভয়ে লেখাপড়া করে টাইটেল আর ডিগ্রী লাভ করে, তাদের সামাজিকতা এলিয়্যানের মতো। অর্থাৎ না তারা সমাজে নিজেকে মানাতে পারে। আর না তারা সমাজে টিকে থাকতে পারে। সোজা কথায়, ইসলামী শিক্ষিতদের শিক্ষাগ্রহণ একরকম, আর সমাজ আরেক

রকম। দুই ভিন্ন মেরুর টানাটানি যেনো তাদের দৈনন্দিন জীবনে....।

সুতরাং বিলেতের সরকারী স্কুল-কলেজ আর মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে যদি জরীপ করা যায়, তাহলে আকাশ-পাতাল তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই বিষয়গুলো নিয়ে বর্তমান উলামায়ে কেরামের কঠোর ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, কাগজের পৃষ্ঠায় এসব বিষয়গুলো সুন্দর এবং সাবলিল ভাষায় লেখালেখি সহজ, কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই কঠিন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃটেনের প্রাইমারী স্কুলে চার বছর বয়সের শিশুরা যখন ভর্তি হয়, তখন শিক্ষকরা তাদের অভিভাবকতুল্য আন্তরিকতার কারণে এই শিশুদের মন জয় করে নেয়। এমনকি একটি শিশু যদি কাপড় চোপড় অপবিত্র করে ফেলে, তখন শিক্ষকরা পিতামাতার অপেক্ষা না করেই তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন। ফলে, পিতা মাতা সদৃশ এই আদর অনুধাবন করে শিশুটির হৃদয়ে এক প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যে কারণে তাদের মন মগজে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং ধারাবাহিকভাবে তা চলতে থাকে। আজকের অক্সফোর্ড, হার্ভারড, ক্যাম্ব্রিজ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ইত্যাদি ঐ সকল শিক্ষকদেরই ফসল।

মুসলিম মাত্রেই এটা জানেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল কাজই হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। আর সকল ভালো কাজই- অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো, শেখানো সবকিছুই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিতর। একইভাবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো শেখানো পথে অতিক্রম করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈ, তাবে-তাবিঈ ও পরবর্তী উলামাগণ। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে এই পথে চলার মধ্যেই রয়েছে- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

এই কারণেই সহীহ্ বুখারী শরীফের সাতটি অধ্যায়েই 'নিয়ত'-এর হাদীসটি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদিও হাদীসের মূল ভাষ্য এবং ব্যাখ্যায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে। যে ঘটনার মূল কারণ ছিলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিজরত করা। মক্কা বিজয়ের পূর্বে কেউ কেউ রমনী বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করে ছিলেন। এইজন্য 'নিয়ত' পরিশুদ্ধতার প্রশ্ন এসেছে। একইভাবে ইসলামী জীবন-যাপন করার ক্ষেত্রেও নিয়ত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া ইসলামের ইবাদত-বন্দেগীতেও প্রথমে নিয়ত বা সংকল্প নির্ণয় করা ফরয।

নব্য বাতিল ফির্কাগুলো জন্ম নেয়ার কারণ

এক) এটা সূর্য ও নক্ষত্রের মতো সত্য যে, মুসলিম বিজ্ঞ সমাজ যেদিন থেকে কুরআন-হাদীসের গবেষণা ছেড়ে দিয়েছেন, সেদিন থেকেই মুসলমানরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য ও হতোদ্যম জাতিতে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে একটি মাসআলা আবিষ্কার করলেন। মাসআলাটি হচ্ছে- চার রাকআত নামায আরম্ভ করে কেউ যদি দুই রাকআতের বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পাঠ করার পর ভুলবশত দরূদ পড়া শুরু করে দেয় এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে 'মুহাম্মাদ' শব্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

তাহলে তাকে সিজদায়ে সহু করতে হবে।

এই মাসআলাটি যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন সমাজে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হলো। বিভিন্নভাবে আলোচনা পর্যালোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'দুই সিজদার মধ্যখানে কেউ যদি ভুল করে দরূদ পড়া আরম্ভ করে 'মুহাম্মাদ' বলে, তাতে সিজদায়ে সহু কেনো? দরূদ তো নামাযেরই অংশ?' ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- দুই সিজদার মধ্যখানে আত্তাহিয়াতু পাঠ করা আল্লাহ্র বিধান। সুতরাং ভুল করলে এক থেকে তিন শব্দ পর্যন্ত সুযোগ দেয়া যেতে পারে, এর বেশি হলে তো আরেকটি অর্থবহ বাক্য তৈরী হয়ে যায় এবং বিধান লঙ্গনের আইন বলবৎ হয়! ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র সিদ্ধান্ত শোনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হাসি দিয়ে বললেন, 'তোমার সিদ্ধান্ত (কিয়াস) সঠিক।'

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদে নববীতে কিছু সংখ্যক ছাত্রদেরকে হাদীসের শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা চলছে যে, 'কবর মুবারকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত না মৃত।' মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য দিয়ে 'কবর মুবারকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত' হিসেবে প্রমাণ করলেন। কিন্তু একজন ছাত্র বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছেন না। এই ছাত্রও গবেষক হিসেবে উচ্চতর ডিগ্রী হাসিলের লক্ষ্যে এখানে অধ্যয়ণ করছেন। শুরু হলো তথ্যবহুল বিতর্ক। যেহেতু বাস্তবতার দিক থেকে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া যুগটাও আধুনিক। ফলে, ছাত্র ও শিক্ষক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তর্কবিতর্কে দু'জনেই ঘর্মসিক্ত হয়ে গেছেন। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ে মসজিদে নববীর ছাদের উপর। দেখা যাচ্ছে, সবুজ গম্বুজের স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। তিনি অপলক তাকিয়ে রইলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মুবারকের দিকে। (চেরাগে-মুহাম্মদ (সাঃ) পৃঃ ৫০০)

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সারমর্ম হচ্ছে- ঐ জাতীয় গবেষণা আজকের মুসলমানরা অধিক ক্ষেত্রেই ছেড়ে দিয়েছেন।

দুই) আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মা'রিফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে আমার সম্পদ।" (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান) অথচ আজকের মুসলিম সমাজে আধ্যাত্মিকতা বা মা'রিফাত একপ্রকার ভন্ডামীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই গ্রাম্য প্রবাদের মতো- কেউ একজন ভুলবশত পান-সুপারীর সাথে মাত্রাতিরিক্ত চুন খেয়ে জিহ্বা পুড়েছিলো বলে, দই দেখলেও এখন ভয় পায়। অর্থাৎ মা'রিফাত বা আধ্যাত্মিকতার নামে মুনাফিকরা ভন্ডামী করেছিলো বলে, শরীয়তপন্থী কিছু সংখ্যক আলিম-উলামা ইসলামী বুনিয়াদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন।

উদাহরণস্বরূপ- ইহুদী-খৃষ্টানরা ভালো করেই জানেন যে, খাঁটি মুসলিম ব্যক্তি মরে গেলেও আল্লাহ্র সাথে কুফরী করবে না। তারা এটাও জানেন যে, কাফিরের চেয়ে মুনাফিকরা হবে

নিকৃষ্টতম জাহান্নামের বাসিন্দা। তাই ইহুদী-নাসারাচক্র মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে মুনাফিকীর দিকেই উৎসাহিত করছে প্রতিনিয়ত। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা কথা বলা পাপের নয় বরং পূণ্য বা বুদ্ধিমত্তার কাজ হিসেবে বিশ্ববরেণ্য অভিধায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব-প্রচলিত অর্থনীতিতে, মুনাফার নামে সুদ, উপঢৌকনের নামে ঘুষ এবং 'ডাইলুট'-এর নামে মিশ্রণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অথচ মুসলমানরা লাভ বা মুনাফাকে ইন্টারেস্ট বা সুদের সাথে একাকার করে ফেলেছেন। ঘুষ দানকে হারাম জানেন ঠিকই, কিন্তু হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ হাসিল করেন। ডাইলুট বা মিশ্রণ পদ্ধতি যদিও ভালো অর্থে ব্যহৃত হওয়ার কথা, কিন্তু ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে দুধের সাথে পানি মেশানো হয়ে থাকে। ফলে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে অধিকাংশ মুসলমান আজ কবীরা গোনাহ্ ও মুনাফিকীর চক্করে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

তিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি (ইসলামের জন্য) জিহাদ করা এবং না করার দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার মৃত্যু একপ্রকার মুনাফিকীর উপর গণ্য হয়।" (মুসলিম)

কিন্তু আজকের কিছু সংখ্যক মুসলমান সমাজের ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করবেন কি- করবেন না, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে নতুন মাসআলা আবিষ্কার করতে দারুণ উদ্যোগী। তাদের মতে ইঙ্গ-মার্কিন জোটসহ বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো ইসলামের শত্রুতায় নতুন অভিধায় ঐক্যবদ্ধ। যখন-তখন যে কোনো একটি দেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে তারা দেশটিকে তছনছ করে দেয়। যে কোনো অজুহাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। জাতিসংঘ নামক বিশ্বসংস্থার নাম নিয়ে যে কোনো দেশ ও জাতিকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কোটি কোটি মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতে কারো টু-শব্দটি করার শক্তি ও সাহস নেই। এক্ষেত্রে আজকের মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি বলেন, 'ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম এবং এটাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে উৎখাত করতে হবে' তাহলেই হলো। আর কারো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। 'ইসলাম অর্থ সন্ত্রাস' একথা সত্য হোক মিথ্যা হোক আমেরিকা যা-বলছে তা-ই। আর কেউ এতে নাক-গলাতে পারবে না।

সুতরাং বর্তমান বিশ্বের এই আক্রমণাত্মক পরিবেশে, ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তির সামনে সত্যের কথা, ন্যায়ের কথা, মানবতার কথা, ইসলামের কথা বলা কি সঠিক হবে? হয়তো হবে না। আর যদি কেউ ঈমানী সাহস নামক পাগলামীতে লিপ্ত হয়! তাহলে তার দশা হবে, উসামা বিন লাদিন, মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ, মুআম্মার গাদ্দাফী ইত্যাদি ব্যক্তিদের মতো। যাদের কেউ নজরবন্দী, কেউ কারাগারে, আর কেউ এখন মাটির গর্তে প্রাণ রক্ষার পথ খুঁজছেন। অতএব বর্তমান যুগে জিহাদের পথ পরিবর্তন করা যায় কি-না, জিহাদকে ভিন্ন নাম দেয়া যায় কি-না, জিহাদের মাসাআলাকে হেকমতের সাহায্যে পরিবর্তন করা যায় কি-না, তা আবিষ্কার করাই সময়ের দাবী!

অথচ তাফসীর ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়েছে, "হযরত হাজার ইবনে উদ্দী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলামের শত্রুদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময়ে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে

কেউই মারা যায় না।' এসো- এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ করো। একথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নামিয়ে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শত্রুদের কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে- এরা তো পাগল। এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করে না। কাজেই চলো আমরা পলায়ন করি। নতুবা এরা খেয়ে ফেলবে। শত্রুরা পালিয়ে গেলো।" (৪র্থ খন্ডঃ পৃঃ ১৭৯-১৮০)

তাফসীর ইবনে কাসীরে আরো বর্ণিত হয়, "যার কার্য শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর পরকাল লাভের যার উদ্দেশ্য থাকে সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়াতেও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে থাকে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে, 'পরকালের ক্ষেত্র যাঞ্চাকারীকে আমি আরও বেশি দিয়ে থাকি। আর ইহকালের ক্ষেত্র যাঞ্চাকারীকে আমি তা প্রদান করি বটে, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।' এ জন্যেই এখানেও আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি।' এরপর আল্লাহ তাআলা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন, 'ইতিপূর্বেও বহু নবী তাঁদের দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্তে, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।' (৪র্থ খন্ডঃ পৃঃ ১৮০)

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, 'যদি তোমরা তাদের কথামতো চলো তবে তোমরা ইহ ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়।' অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'আমাকেই তোমরা তোমাদের প্রভূ ও সাহায্যকারী রূপে মেনে নাও, আমার সাথেই ভালোবাসা স্থাপন করো, আমার উপরেই নির্ভর করো এবং একমাত্র আমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।' (৪র্থ খন্ডঃ পৃঃ ১৮৩)

ইসলামে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ক্ষণিকের জন্য হোক বা দীর্ঘকালের জন্যই হোক, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইসলামের তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারের নামই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ তাছাউফ তত্ত্ব বা সুফীতত্ত্ব। বর্তমান এই উত্তরাধুনিক যুগে বিজ্ঞানের জৌলুসপূর্ণ আবিষ্কারের ময়দানে কেবলমাত্র ইসলামী শরীয়তের মাসায়েল দিয়ে কখনো ইসলামকে বিজয়ী করা যাবে না। এমনকি 'ইসলাম' শুধুমাত্র 'শরীয়ত' নয়। ইসলামের ভিতর যেমন শরীয়ত রয়েছে, তেমনি আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে ভিত্তিমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অতএব- সভ্যতার সংঘাতের (ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন) এই যুগে ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে, ইসলামের আধ্যাত্মিকতা তথা সুফীতত্ত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শরীয়ত হচ্ছে

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধি-বিধান। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, যা ব্যক্তির উপর সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। আর আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ব্যক্তির মনের গভীরে লুক্কায়িত কঠিন কিছু প্রশ্নের গঠনমূলক জবাব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী দাওয়াতে সর্ব প্রথম উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। সাথে সাথে তাঁদের উপর নামাযের বিধান বলবৎ হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘরে নামায আদায় করছেন। এমন সময় বালক হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে নামাযের দৃশ্য দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি জীবনে কখনো এমন রুকু-সিজদার স্বরূপ দেখেন নি। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কার উদ্দেশ্যে সিজদা করছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আলী! আমরা মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সিজদা করছি। তিনি আমাকে নুবূয়ত দান করেছেন। তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, "হে আলী! তুমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করো। আমার নুবূয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। লাত, মানাত এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করো না।" এই সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন। এতে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, "আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার অনুমতি দিন।" (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতঃ পৃঃ ১৭৪-১৭৫)

এ কথাগুলো বলে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। নানা মনোকল্পে সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো বালক হৃদয়ে অত্যন্ত রেখাপাত করলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা কথা চিন্তা করলেন। সকালে উঠেই তিনি নিজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, 'এ ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আবূ তালিবের (হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এঁর পিতা) পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এই মহান আল্লাহ্‌র উপাসনার ব্যাপারে কেনো আমি আবূ তালিবের মতামত গ্রহণ করতে যাবো?' (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতঃ পৃঃ ১৭৪-১৭৫)

এটা সকলেই জানেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন নুবুওয়াত প্রাপ্ত হয়ে ইসলামে অন্তর্ভূক্তির দাওয়াত শুরু করেন, তখনকার লোকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। কারণ, লোকেরা চিন্তা করেছেন যে, এই লোক আমাদের মধ্য থেকে জন্ম নিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পন করেছেন। অথচ জীবনে একটি মিথ্যা বাক্যও বলেন নাই। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে একটি বিচার-আদালতও নেই। অতএব তিনি যা বলছেন, তা সত্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষের এই যে বিশ্বাস এবং প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরের সাক্ষ্য, এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথ্য ও তত্ত্ব

আবিষ্কারের নামই সুফীতত্ত্ব বা তাছাউফ তত্ত্ব। সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন তাছাউফতত্ত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পথ। যে পথ দিয়ে চলতে গিয়ে তাঁরা সীরাতুল মুস্তাকিমে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে।" (সূরা ফাতহ-২৯)

রুকু সেজদায় অবনত থাকেন তাঁরাই, যারা সারাদিন দুনিয়াদারী করে রাতের নিদ্রার সময়টুকু সেজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে কাঁদেন। যাদের কাছে দুনিয়ার মূল্য ও মর্যাদা অত্যন্ত তুচ্ছ ছিলো, যাদের সামনে দুটি কাজ উপস্থিত হলে আগে আখিরাতের কাজ সম্পাদন করতেন। যারা নবুওয়তি কোলে লালিত-পালিত হয়ে আল-কুরআনের ভিতর-বাহির, ইসলামের ভিতর-বাহির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন। তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একটি বর্ণনা আছে যে, "তাবুক জিহাদের প্রস্তুতিপর্বে ধনধৌলতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের দান খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। এতে সকল সাহাবীগণই যার যার ঘরে গিয়ে তাওফিক অনুযায়ী সম্পদ এনে হাজির করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এনেছো? তিনি বললেন, আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেকটা ঘরে রেখে বাকি সব দান করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে একই প্রশ্ন করলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার ঘরে শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে বাকি সব ধনসম্পদ এখানে দান করেছি।"

নিজের ঘরে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাখার অর্থ হচ্ছে ঈমানের উচ্চ শিখরে পৌঁছা ও আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, ভরসা, বিশ্বাস ও সান্নিধ্যলাভই হচ্ছে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর তাছাউফ তত্ত্বের মূলমন্ত্র। এ জন্যই পরবর্তী যুগের কেউ কেউ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তাছাউফতত্ত্বের আবিষ্কারক বলেন। আত্মবিশ্বাসের প্রতি তিনি ধারণাতীত দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। এ জন্য পাশ্চাত্যের প্রাচ্যশিক্ষাবিশারদ ও ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই মত প্রকাশ করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পরে যদি নবুওয়তির ধারা প্রচলিত থাকতো, তাহলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে অবশ্যই নবুওয়তি দান করা হতো। (সূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা) [এ উক্তিটি পশ্চিমা অমুসলিম শিক্ষাবিদদের। হাদীসের ভাষায় হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে নবুওয়তি দান করা হতো বলে উল্লেখ রয়েছে।]

হাদীসের ব্যাখ্যানুযায়ী এটাও জানা যায় যে, হাশরের বিচারের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর সকলের ঈমান এক পাল্লায় এবং অন্য পাল্লায় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর ঈমানকে

তুলে ওজন করা হবে। এতে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর ঈমানের পাল্লা ভারী হবে।

পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণনায় আছে, মুসলিম জাতির পিতা হরযত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সাল্লাম-কে যখন নমরূদের আগুনে ফেলা হলো, তখন ফেরেশ্‌তাগণ এসে বললেন, আপনি নির্দেশ করুন আমরা নমরূদের আগুন ও তার দলবলসহ সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেই! ইবরাহীম আলাইহিস্‌সাল্লাম বললেন, 'না! আমি তো এমন কোনো অন্ধ আল্লাহ্‌র ইবাদত করি না, যিনি তাঁর বান্দার দুঃখকষ্ট দেখেন না!।' এই যে আত্মবিশ্বাস। এটাকে তাছাউফের শক্তি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

অতএব হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবুযর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম যেমন বাহ্যিক জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও বাদশাহ্‌ ছিলেন। এই জন্যেই তাছাউফতত্ত্ব বা সুফীতত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের থেকেই তাছাউফতত্ত্বের জন্ম। (সূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

উপমাস্বরূপ আরো বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে। তাঁদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাঁদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। (সূরা ফাতহ-২৯)

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসীর ও তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচে প্রিয় এবং অতি তাড়াতাড়ি গ্রহণযোগ্য ইবাদত হচ্ছে নামায। নামাযের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশোধন করে এবং গোপনে ভালো কাজ করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার মুখমন্ডলে ও জিহ্বার ধারে তা প্রকাশ করে থাকেন। অতএব অন্তরের দর্পণ হলো চেহারা। সুতরাং অন্তরে যা থাকে, তা চেহারায় প্রকাশিত হয়।

হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এঁর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি বলেন- যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন, তখন তথাকার খৃষ্টানরা তাঁদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে ওঠেঃ "আল্লাহ্‌র কসম! এঁরা তো হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সাল্লামের হাওয়ারীগণ (হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সাল্লাম-এঁর ১২জন সঙ্গীকে হাওয়ারী বলা হয়।) হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।" (সূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

অতএব সাহাবায়ে কেরামের রুকু ও সেজদায় অবনত থাকা এবং তাঁদের তাকওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রতিচ্ছবি পবিত্র চেহারায় বিকশিত হওয়ার অর্থ কি তাছাউফ নয়? সাহাবায়ে কেরামের তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন-যাপনের আত্মিক দিক নির্ণয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে তাছাউফতত্ত্ব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

তাছাউফ বা সুফীতত্ত্ব কিঃ

ইসলামের বিজ্ঞ আলিমগণ ইসলামী আইন ও শরীয়তকে নিয়ে চার পদ্ধতিতে বা ভাগে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং এখনো করছেন।

একঃ মাসায়েল ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিস্তারিত চিত্র ও ইসলামী শরীয়তের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি। এটা ফিকাহ্ শাস্ত্র। এই শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'ফকীহ্' বা ফিকাহ্‌বিদ বলা হয়।

দুইঃ মাসায়েল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় ও শাখা প্রশাখার পিছনে যে নীতি, আইনগত প্রাণসত্তা ও সামগ্রিক রীতিনীতি কর্মরত আছে, সেগুলোর অনুসন্ধান চালানো। একে উছুল (নীতিশাস্ত্র) বলে। এই শাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে উছুলী (নীতিশাস্ত্রবিদ) বলা হয়। আর ফিকাহ্ এবং উছুলের জ্ঞানে পরিপূর্ণতা অর্জনকারী ব্যক্তিকে বলা হয় মুজতাহিদ।

তিনঃ শরীয়ত ও ফিকাহর খুঁটিনাটি বিষয়াদিকে যুক্তি, বুদ্ধি ও দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করাকে বলা হয় ইলমুল কালাম (কালাম শাস্ত্র)। কালাম শাস্ত্রে যারা বিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাদেরকে বলা হয় মুতাকাল্লিমীন (মুসলিম দার্শনিক)। তাঁরা শরীয়ত, ফিকাহ্, উছুল ও দর্শনের মধ্যে মিল ও যোগসূত্র সৃষ্টি করেন। ধর্মের জন্যে এমন যুক্তিগত ও চিন্তাগত পরিমাপযন্ত্র সরবরাহ করেন, যা মনের সন্দেহ ও সংশয় দূর করে এবং ধর্মীয় ও চিন্তাগত অস্থিরতার জন্যে একপ্রকার সান্ত্বনা ও স্থৈর্যের কারণ হয়।

চারঃ ইসলামের মাসায়েল, আচার প্রথা, ইবাদত ও চারিত্রিক বিষয়াদিতে বাতিনী রূহ ও প্রাণের সন্ধান এবং দর্শন চিহ্নিত করা। যে দর্শনের সম্পর্ক মস্তিষ্কের উপরি পৃষ্ঠের সাথে নয়, বরং অন্তরের গভীর তথা গহীন অবস্থার সাথে। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত রুচিবোধ ও আনন্দ উপলব্ধির যেসব মিল রয়েছে, সেগুলোকে সুস্পষ্টরূপে জনসমক্ষে উদ্ভাসিত করা। যে বিষয়গুলোকে দ্বীনের সুবাস অথবা দ্বীনের প্রাণ আখ্যা দেওয়া যায়।

উপরোল্লিখিত চারটি বিষয়ের উপর সম্যক জ্ঞানলাভ ও উপলব্ধির স্বীকৃত স্বরূপকেই বলা হয় তাছাউফ। আর তাছাউফ লব্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলা হয় সুফী। সহজ কথায় পরিপূর্ণ ঈমান, বহুমূখি ইল্‌ম বা জ্ঞান ও পরিপূর্ণ আমলের কষ্টিপাথরে যাছাই বাছাই করে যিনি তাছাউফের চিন্তায় লিপ্ত হবেন, তাকেই সুফী বলা যেতে পারে। এখানে ভন্ডামীর কোনো স্থান নেই। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

তাছাউফ তত্ত্ব বা সুফীতত্ত্বের ধারাঃ

আগেই বলা হয়েছে, সুফীতত্ত্বের জন্ম সেই অনুস্মরণীয় সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে। তবে সুফীতত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু কোন্ সাহাবী বা কাদের কাছ থেকে নির্গত হয়েছে সেটা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনের যুগ ধরে হিজরী দ্বিতীয় শতকের ইতিহাসে জানা যায় যে, একদল লোককে মানুষ সুফী নামে আখ্যায়িত করতেন। যাঁদের মাঝে

ধার্মিকতা ও সংসারের প্রতি উদাসীনতা নিয়মিত একটি জীবনদর্শন হিসেবে রূপ লাভ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে এই দলটি সমাজে একটি নির্দিষ্ট দল হিসেবে স্বীকৃত হয়। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই জীবনদর্শন সমস্ত বিশ্বজুড়ে কেবল ইসলামী দাওয়াতের প্রসারতাই অর্জন করেনি, বরং তাবলীগী প্রচেষ্টাসমূহে একটি সংগঠনের আকৃতি লাভ করে। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে সুফীগণ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বসমূহকে পুস্তকাকারে প্রচার করা শুরু করেন। ঠিক ঐসময় তাদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন একশ্রেণীর লোকও সমাজে আবিষ্কৃত হয়, যাদের ধার্মিকতা, তাছাউফ ও ইসলামের বুনিয়াদী আকাঈদের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এরা বিশুদ্ধ বিশ্বাসী সুফীগণের দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তাদের ধারাবাহিকতা আজো চলছে। হয়তো কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ফলে, ইবনে সীনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ইশারাত গ্রন্থে লেখেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদ ও সুস্বাদু বস্তুসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে বিশেষভাবে 'যাহেদ' (সংসারবিমুখ) বলা হয়। যে নামায-রোযার মতো ইবাদত অবলম্বন করে, তাকে 'আবিদ' নামে ডাকা হয়। যে চিন্তাভাবনার শক্তিকে সর্বশক্তিমানের দিকে নিবিষ্ট করে, হকের রহস্যাবলী থেকে আলো গ্রহণ করে এবং বাতিনকে পরিপাটি করে, তাকে 'আরিফ' (বিভুজ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ কারণে বুঝা উচিত নয় যে, এই দলগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা টানা যায়, বরং তারা পরস্পরে একে অপরের সাথে মিশ্রিতও হয়ে যায়।" এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশুদ্ধ হক্কানী সুফীদের মাঝে বিরুদ্ধবাদীরা মিশে গিয়ে ছিলো। কিন্তু তাদের চাল-চলন এবং লেবাসে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন ছিলো। এদের মাধ্যমেই ভন্ডামীর উদ্ভব হয়। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

ইসলামের ইতিহাসে খ্যাতনামা ছুফীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

সুফীগণের মধ্যে যাদের কর্ম ও চিন্তার উপর ভিত্তি করে তাছাউফের ইমারত নির্মিত হয়েছে সেই প্রথম যুগের কয়েকজন সম্পর্কে একটুখানি আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু- ১৪৪ হিজরী)

তিনি ছিলেন খোরসানী চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা। তাছাউফ গ্রন্থসমূহে তাঁর উক্তির প্রায়ই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তিনি কিভাবে রাজ সিংহাসন ছেড়ে পবিত্র ও সংসারবিমুখ জীবন অবলম্বন করলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে একটি কাহিনীতূল্য ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি খোরাসান রাজপরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার চাল-চলন উঠাবসা রাজকীয় অহংকারিতায় পূর্ণ ছিলো। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। ইতিহাসের বর্ণনানুযায়ী একটি হরীণ বা খরগোশ তার চোখে পড়লো। তিনি শিকারের পিছনে দৌড় দিলেন। শিকারটির প্রতি নিশানা ঠিক করার প্রস্তুতি নিতেই পিছন থেকে একটা অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলেন। কে যেনো বলছেন, "ইবরাহীম! তোমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি।" তিনি আওয়াজটি শুনেও না শুনার ভান করে শিকারের পিছনে ধাওয়া করছেন। আবারও একই আওয়াজ তাঁর মনোযোগ

আকৃষ্ট করলো। তিনি এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয়বার যখন আওয়াজটি শ্রুত হলো এবং অন্তরের গভীরে গিয়ে নাড়া দিলো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর মনের ভিতর একপ্রকার পরিবর্তন শুরু হলো এবং কল্পনা ও চিন্তা পাল্টে গেলো। জঙ্গলে পাওয়া এক রাখালের সাথে নিজের রাজকীয় পোশাক পরিবর্তন করে আল্লাহ্ সন্ধানে হাঁটতে শুরু করলেন। বাদবাকী জীবন তিনি এভাবেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে কাটিয়ে দিলেন।

পরবর্তী যুগে সুফীগণ তাঁর এই ঘটনাটি সনদ সহকারে অধিকাংশ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে ঐতিহাসিক মর্যাদায় ঘটনাটি পূর্ণ সন্দেহমুক্ত নয়। কারণ, খোরাসান এলাকায় দীর্ঘকাল বৌদ্ধ সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রভাব ছিলো। সুতরাং অবাস্তব নয় যে, এই কাহিনী যাবতীয় বিবরণসহ হুবহু বুদ্ধের কাহিনীর অপভ্রংশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্রই হয়তো গত শতাব্দির কিছু সংখ্যক ইসলামপন্থী লেখক পুরো সুফীতত্ত্বকেই প্রত্যাখ্যান করার প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে ইল্‌মে লাদুনী প্রাপ্ত একজন হক্কানী আলিম ছিলেন, তাতে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের কোনো দ্বিমত নেই। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

আবুল ফযল যুন্নুন মিছরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ২৪৬ হিজরী)

তিনি সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্ তস্তবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উস্তাদ এবং মুহাসেবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলেন। আল্লাহর মহব্বত সম্পর্কে তাঁর উক্তি, “আল্লাহ্র মহব্বতের অন্যতম আলামত এই যে, তাঁর হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণ করা, তাঁর চরিত্র, ক্রিয়াকর্ম, আদেশাবলী ও সুন্নত সব কিছুতে।”

যুন্নুন মিছরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে ফিকাহ্বিদগণ ‘যিনদীক’ (আল্লাহ্র একত্বে অবিশ্বাসী) মনে করতেন। কারণ মাঝেমধ্যে তিনি বলতেন, ‘ওহদাতুল ওজুদ’ অর্থাৎ সকল সৃষ্টবস্তুতে আল্লাহ তাআলার এক অস্তিত্ব মানা। এ কারণে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের কাছে যুন্নুন মিছরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অবিশ্বাসীসূলভ আকাঈদের অভিযোগ করা হলে খলিফা তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি খলিফার দরবারে হাজির হয়ে এমন দরদভরা হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য দিলেন, কাঁদতে কাঁদতে খলিফার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতে লাগলো। অতঃপর সসম্মানে তাঁকে মিসরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

আবু আলী ফুযায়ল ইবনে আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ১৮০ হিজরী)

তাছাউফে তিনি ছিলেন ইরাকী চিন্তাধারার বাহক। তাঁর পেশা ছিলো মানুষের ধন-সম্পদ লুট করা, অর্থাৎ নামকরা ডাকাত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে তওবা ও আন্তরিকতার নিয়ামতে ভূষিত

করেন। পরে তিনি ইল্‌মে মারিফাতের ভান্ডারে ডুব দেন। আবু আলী রাযী বলেন, আমি ত্রিশ বছর তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তাঁকে কখনো হাসতে দেখিনি। একবার তাঁর কলিজার টুকরা ছেলে আলী মারা গেলো। তিনি তখন হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি হাসলেন কেনো? তিনি উত্তরে বললেন, আমার মওলা যখন আলীকে পছন্দ করেছেন, তখন আমি আনন্দ প্রকাশ করবো না কেনো?

দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা এই যে, "যদি দুনিয়া তার সকল চিত্তাকর্ষণসহ আমাকে প্রদত্ত হয় এবং এর উপর কোনো হিসাব নিকাশেরও আশংকা না থাকে, তবুও আমি তাকে এমনই নাপাক মনে করবো, যেমন তোমরা মৃতকে নাপাক মনে করো।" দুনিয়ার ঐশ্বর্য তাঁর কাছে এতোই তুচ্ছ ছিলো। (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ২৬১ হিজরী)

বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। তিনি একজন খ্যাতনামা ছুফী ছিলেন। তাঁর নিজস্ব একটি উক্তি হচ্ছে, তোমরা কোন ব্যক্তিকে শূন্যে আরোহণ করার মতো কোন কারামত প্রাপ্ত হতে দেখলে প্রতারিত হয়ো না। বরং লক্ষ্য করো যে, আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে তার কর্মপন্থা কি? সে কতটুকু খোদায়ী সীমানার হেফাযত ও অনুসরণ করে এবং শরীয়তের দাবীসমূহ কতটুকু পুরণ করে? (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

আবু আলী শকীক ইবনে ইবরাহীম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি ছিলেন হাতিম আছাম্মের শাইখ ও উস্তাদ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দির একজন উঁচু দরের ছুফী। তাঁর পেশা ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্য। একবার এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, এই অভাব-উৎপীড়নের মাঝে কিভাবে জীবন-যাপন করবেন? রিযিক ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কোন্ পথ অবলম্বন করবেন? ইতোমধ্যে এক গোলামকে আনন্দ নাচানাচি ও রং তামাশা করতে দেখে বললেন, দুর্ভিক্ষ এবং দুশ্চিন্তার এই দিনগুলোতে তোর এতো আনন্দ-উল্লাস কেনো? তোর কি খাওয়া-পরার চিন্তা নেই? লোকটি জবাবে বললো- না! আমার মালিকের একটি উন্নয়নশীল গ্রাম আছে, তাতে আমরা অভাবমুক্ত।

গোলাম ব্যক্তির কথা বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, এই সমস্ত সৃষ্টির যিনি রাব্বুল আলামিন! তাঁর চোখের সামনে জীবন-যাপন করতে গিয়ে আমার দুর্ভিক্ষ আর খাওয়া-পরার চিন্তা কেনো?

হযরত বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, মুমিন ব্যক্তির তাকওয়ার পরিচয় জানতে হলে- তিন জিনিসের প্রতি নজর দেওয়া উচিত।

এক) মুমিন ব্যক্তি কি কি বিষয় অবলম্বন করেন। দুই) তিনি কি কি বিষয় থেকে বিরত থাকেন। তিন) কি কি বিষয়ে কথা বলেন? (তথ্যসূত্রঃ ইমাম গাযযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা)

তাছাউফ তত্ত্বকে বিভ্রান্ত বলার অর্থ পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

সাড়ে সাতশ' বছর আগে মাওলানা জালাল-উদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার আভ্যন্তরিণ দিকটা লুক্কায়িত থাকে; যেরূপ বিভিন্ন ঔষধের মধ্যে তার উপকার লুকানো রয়েছে।" এই উপকারের স্বরূপ আবিষ্কারই হচ্ছে তাছাউফ। তিনি আরো বলেন, "মোতাযিলীদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস-মতবাদের সূত্র হলো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়। খাঁটি মুসলমান সুষ্ঠু জ্ঞানের দর্শন-সাহায্যে সত্যকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আর কেবল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের বেষ্টনে আবদ্ধ ব্যক্তি বস্তুত মোতাযিলী; যদিও সে খাঁটি মুসলমান হবার দাবী করে- এটা তার ভণ্ডামী।" এই জন্যই মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়া আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়গুলোর তুলনা করলে বাহ্যিকগুলো হবে পিতল তুল্য এবং অপরগুলো হবে খাঁটি স্বর্ণতুল্য। যেমন, দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলোর খোরাক হলো অন্ধকারময় দ্রব্যাদি; (কারণ, মাটি, পানি, বায়ু, তাপ এইসব জড়পদার্থের কল্যাণে জন্ম পচনশীল উদ্ভিদের নির্যাস থেকে গৃহীত উপাদানে ঐ ইন্দ্রিয়গুলো পুষ্টিলাভ করে।) পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়সমূহ মহান সৃষ্টিকর্তার নূর ও আলো হতে শক্তিলাভ করে। এই জন্যই বলা হয়েছে, "মান্ আরাফা নাফ্সাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু।"

কঠিন সাধনার মধ্যদিয়ে কেউ যদি নিজেকে জানার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ্কে চেনা তার জন্য সহজ হয়। একই সুরে সুর মিলিয়ে দুনিয়ার তাবৎ সুফীগণও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "মানুষ আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, হে নবী! আপনি বলুন- রূহ আমার প্রভূর নির্দেশ।" (সূরা বনী-ইসরাঈল - ১৩) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পরমসত্যবহ একটি নির্দেশ প্রত্যেকটি মানুষের শরীর-বেষ্টনীতে লুক্কায়িত রয়েছে। আর শয়তান সেটাকে আড়াল করে রেখেছে বলেই আল্লাহর সাথে মানুষের আত্মিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে।

সুফীগণ কঠোর সাধনায় নিমজ্জিত হয়ে শয়তানের আবরণকে দূর করে নিজের মধ্যে আল্লাহর নূরকে প্রজ্জ্বলিত করা ব্রত মনে করেন। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এঁর দরোজায় অনেকগুলো খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চর দেখতে পেলাম। আমি বললাম, এগুলো ভারী সুন্দর তো জনাব! তিনি বললেন, আবু আবদুল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি! এগুলো সব তোমার জন্য আমার তরফ থেকে উপঢৌকন। আমি বললাম, আপনি নিজে সওয়ার হওয়ার জন্য অন্তত একটি রেখে দিন। তিনি জবাবে বললেন, যে মাটির গহ্বরে আল্লাহর নবী (সাঃ) শুয়ে আছেন, সে মৃত্তিকা আমার অশ্ব পদদলিত করবে! আল্লাহর দরবারে আমার জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জার কি থাকতে পারে! তিনি নিজের জন্য একটি বাহনও না রেখে সবগুলোই আমাকে দান করলেন। তাঁর এই দানশীলতার মধ্যদিয়ে যেমন দুনিয়ার অনাসক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এঁর প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ দেখা গেছে। একই সাথে মাদীনার মাটিকেও পরম সম্মান করা হয়েছে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখেছিলেন, "হুজুর (সাঃ)-এঁর পবিত্র লাশ মোবারকের চারিদিকে অসংখ্য মাছি এসে উড়াউড়ি করছে।" এই স্বপ্নের বর্ণনায় তখনকার উলামা-মাশায়েখগণ বলেছেন, "বর্তমান যমানায় হুজুর (সাঃ)-এঁর বাণী অর্থাৎ হাদীসগুলোকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা চলছে। এইজন্যই ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে নবী করীম (সাঃ) হাদীস সংগ্রহ করার স্বাপ্নিক নির্দেশ দিয়েছেন।" ফলে হাদীস সংগৃহীত হয়েছে।

এরপর মাত্র শত বছরের মাথায় অর্থাৎ হিজরী তৃতীয় শতকের দিকে শরীয়তের পতাকাতলে একশ্রেণীর ভ্রান্ত সম্প্রদায় আবার ইসলাম বিধ্বংসী তৎপরতা শুরু করলো। তারা কাদরিয়া, মুরজিয়া, মু'তাজিলা, রাফেজী ইত্যাদি নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামের রক্ষক হিসেবে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝিতে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। ফলে এদের মিশন বিনষ্ট হয়ে গেলো।

কুরআন-হাদীসের অনেক উদাহরণ দিয়ে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিবাদের সিলসিলাকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রকৃত সুফি বলতে ঐ ব্যক্তিকেই চিহ্নিত করেছেন, 'আল্লাহর সাথে যার সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যিনি চলতে পারেন। তিনিই সত্যিকারের সুফি।' আল্লাহ্ তাআলার সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ তাআলা যখন মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সাল্লামকে বলেছিলেন, "ইজ ক্বা-লা লাহু রাব্বুহু- আছলিম, ক্বা-লা আছলামতু লিরাব্বিল আ-লামীন।" অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নিষেধের মোকাবেলায় নিজের সকল আশা-আকাংখা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিলীন করে দেয়াকে বোঝায়। আর সৃষ্টজীবের সাথে সৎসম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে, অন্যের প্রয়োজনে এমনকি আশা-আকাংখার মোকাবেলায় নিজের ইচ্ছা ও আকাংখাকে প্রধান্য না দেয়া। তবে শর্ত হলো, অন্যের সেই সমস্ত ইচ্ছা বা আকাংখা যেনো শরীয়তবিরোধী না হয়। কেননা, যদি কেহ শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয়ের প্রতি সমর্থন পোষণ করে, কিংবা সহযোগিতা দেখায় তাহলে সেই ব্যক্তি কখনও সুফিগণের পর্যায়ভূক্ত হতে পারবে না। যদি এরূপ কোন লোক নিজেকে তাছাউফপন্থী হিসেবে প্রকাশ করে তবে মনে করতে হবে সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী। (তথ্যসূত্রঃ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খন্ড)

ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুঃ

বর্তমানে খুবই প্রচলিত একটি শ্লোগান হচ্ছে, 'মডারেট ইসলাম'। বিংশ শতাব্দির গোড়াতে এই অত্যাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির 'মডারেট ইসলাম' শব্দটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিষয়টি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখালেখি শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথম দশকে। এ সম্পর্কে পশ্চিমা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক-গবেষকের একজন- উইলফ্রেড কেন্টওয়েল স্মিথ। তার দীর্ঘ লেখালেখি ও গবেষণাকর্মের ফসল, 'ইসলাম ইন্ মডার্ণ হিস্টরী' প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ জার্সি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি তার গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে

লেখেন, “নব্য ইসলাম নবীন আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন রূপ ও অভিব্যক্তির সন্ধান করছে। এমন লোকের কাছে পুরাতন কাঠামো, লৌকিকতা, বিকৃতি, অপ্রয়োজনকে আহ্বান করার প্রশ্ন নয় এটি। এটি স্রেফ পুরাতন। তারা সম্ভবত খুবই আধুনিকতার সঙ্গে এবং পর্যাপ্ত ভাবে পুর্বতন প্রজন্মের জন্য ইসলামের সত্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু আধুনিক মানুষ এমন এক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যেখানে এগুলি আর আন্তরিকও নয়, পর্যাপ্তও নয়, যেখানে তারা আর ঐ সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। অতএব তারা প্রত্যাখ্যাত হয়, এমন কী ঐ সব লোকের দ্বারা, যারা উৎসাহভরে বুঝে নেয় যে, সেখানে সত্য রয়েছে। আর তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আধুনিকতাকামীদের কাজটি সূক্ষ্ম এবং দায়িত্বপূর্ণ। কেননা এ কাজ সৃজনাত্মক। এটা কেবল ধর্মীয় ইতিহাসের পূর্বেকার বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপার নয়। বরং আবিষ্কার করা ও ঘা মেরে নবীন মূল্যবোধ বার করে আনার জন্য চলতে থাকার বিষয়। সেই মূল্যবোধ নিয়ে আসা, যা উত্তরাধিকারসূত্রে সুরক্ষিত। (ইসলাম ইন্ মডার্ণ হিস্টরী পৃষ্ঠা- ১৭৭)

“ইসলাম তিন প্রকার; কুরআনের ধর্ম, উলামাগণের ধর্ম, আর জনগণের ধর্ম। এই শেষটি হলো কুসংস্কার, গোড়ামী, অন্ধ অনুসৃতি। দ্বিতীয়টি অপ্রচলিত; বৈধতার সমূহ ওজন সমেত পঙ্কে (কাদা) নিমিজ্জত। একটি ফতোয়া পাওয়াকে জরুরী মনে করে, দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে কারও দাঁত পূর্ণ করার আগেই সে এক অসম্ভব পেটুকের মতো খায়। তুরস্ক দ্বিতীয়টির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এটিকে দূর করে দেওয়ার সময় ছিল। এভাবে আমরা মুসলিম দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছি। এই দিক দিয়ে তুরস্ক রয়েছে ইসলামী দুনিয়ার অগ্রভাগে। (ইসলাম ইন্ মডার্ণ হিস্টরী পৃষ্ঠা- ১৭৬-১৭৭)

মিঃ স্মিথ অন্যত্র লিখেন, “আরও বিতর্ক হয় হোক, যে সমস্ত সুপারিশ বা অনুমান করা হয়েছে, তার মধ্যে এমন উদ্যম বা প্রয়াসকে চিহ্নিত করা যাবে যে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলির জায়গায় সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুনদের নিয়ে আসতে হবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন নামায পড়া ও মসজিদে ইবাদতসহ ইসলামের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের আমুল পরিবর্তনের কাজ চলছে, তখন এ বিষয়ে যথারীতি সরকারী আলোচনা হয়। কামালপন্থীরা এইসব প্রস্তাব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। ইসলাম তার সময়কালে প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু এর মধ্যে সময় ও পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। প্রথম দিকে যেসব যুক্তিকে আশ্রয় দিয়ে মানুষের ধর্মনিষ্ঠার প্রকাশ ঘটতো এখন আর সে সব চিন্তা পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। ভাবের আদান-প্রদানের ফলপ্রসু মাধ্যম বলেও গণ্য হবে না। অতএব, তারা অনুভব করে, যদি ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মকে নিজে থেকে বুঝতে হয়, তাহলে তা কেবল শিক্ষিত মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হোক। তাহলে দেখা যাবে, ঐ সব প্রস্তাব সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে উঠছে।” (ইসলাম ইন্ মডার্ণ হিস্টরী পৃষ্ঠা-- ১৮৭)

‘ইসলাম ইন্ মডার্ণ হিস্টরী’ নামক গ্রন্থের উল্লিখিত মন্তব্যগুলো পাঠ করে যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান বিদ্যমান রয়েছে, তিনিও রাগান্বিত না হয়ে পারবেন না। বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম যারা ইসলামের উত্তরসূরী, তারা তো জিহাদ ঘোষণা করবেন। অথচ আজকের বিশ্বে ওদের ‘মডারেট ইসলাম’ নিয়েই সবচে বেশি গবেষণা হচ্ছে। এমনকি মুসলিম সমাজের দুই

তৃতীয়াংশ লোক আন্তরিকভাবে এই মডারেট ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

সুতারাং উল্লিখিত মন্তব্যগুলোর জবাব দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং বিজ্ঞ ও সচেতন মুসলমানদের অবহেলার কারণে বহির্শক্তির নেটওয়ার্ক যে কত বিশালতা ধারণ করেছে, সেটা দেখানোই সংকল্প। এ কারণেই হয়তো ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন কিতাবের ভূমিকা পরিচ্ছেদে ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "হে নিন্দুক ও গাফিল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অন্যতম, অধিকতর অস্বীকৃতি ও নিন্দা জ্ঞাপনকারী! তোমার আত্মম্ভরিতার অবসান কামনা করি। কারণ আল্লাহ তাআলা আমার জবান থেকে নীরবতার গিঁঠ তুলে নিয়েছেন এবং আমার গলায় কথা ও যুক্তির মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে সে কথা বলতে হলো যাতে তুমি নিরত। অর্থাৎ, ন্যায় ও সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে অন্যায়ের সহায়তা ও মুর্খতার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করছো। যদি কোনো লোক সৃষ্টির নিয়ম নীতি থেকে সামান্যও সরে আসতে চায়, কিংবা নীতির অনুবর্তিতা পরিহার করে জ্ঞানানুসারে কাজ করতে আগ্রহী হয় এমন আশায় যে, নফসের পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহ যে ইবাদত বলে গণ্য করেছেন, তা হাসিল করতে পারবে এবং সারাটা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার প্রতিকারে যত্নবান হবে। যেসব আলিম সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন তাদের সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তক হযরতে ফখরুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন সে আলিমই সর্বাধিক কঠিন আযাবের সম্মূখীন হবে যাকে আল্লাহ তাআলা ইলমের কোনো উপকারিতা দান করেন নি।" (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১ম খন্ড)

তুমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দাও, অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অস্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ির কারণ তোমার এ রোগ ছাড়া আর কিছু নয় যা অধিকাংশ লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। বরং বলা যায়, সারা বিশ্ব ব্যপ্তি লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য অবলোকনে মানুষ দিন দিন অপারগ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতেই পারছে না বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও অভিযান বিরাট। আখিরাত ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু নিকটবর্তী এবং যাত্রা দীর্ঘ। পাথেয় অল্প অথচ প্রয়োজন বিপুল। পথও বন্ধ। বহুবিধ ধ্বংসাত্মক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আখিরাতের পথচলা কোনো পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এ পথের পথপ্রদর্শক সেসব আলিমই হতে পারেন যাঁরা নবী-রাসূলগণের যথার্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। অথচ দুনিয়া এসব লোক থেকে শূন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রথাগত লোকই রয়ে গেছে। আবার এদেরও বেশির ভাগের উপরই শয়তান প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ঔদ্ধত্য তাদেরকে পথহারা করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের সাময়িক লাভের পেছনে পড়ে আছে। এ কারণেই তারা অধিকাংশ ভালো বিষয়কে মন্দ ও মন্দ বিষয়কে ভালো বিবেচনা করে। এমনকি দ্বীনি ইল্‌ম পুরানো হয়ে গেছে, হেদায়েতের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। তারা মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ইল্‌ম হয় হবে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ ইতর-চন্ডালদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহায্য গ্রহণ করে, আর না হয় হবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিতর্ক, যাতে করে দাম্ভিক অহংকারীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদের বিজয়ী করার উপায় বানাবে। অথবা ইল্‌ম হবে সেসব ছন্দপূর্ণ মসৃণ

সংলাপ, যেগুলো ওয়ায়েযরা সাধারণ মানুষকে পদস্খলিত করার অবলম্বন সাব্যস্ত করবে। কারণ, এই তিন প্রকার ইল্‌ম ছাড়া তারা হারাম এবং দুনিয়াদারদের মালামাল আয়ত্ত করার আর কোনো ফাঁদ খুঁজে পায় নি।” (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খন্ড)

অন্তত হাজার বছর আগে ইমাম গয্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে কথাগুলো লিখেছিলেন, আজকের সমাজেও সেই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। মুসলামানদের সামাজিক অবস্থার প্রক্ষিতে একটি বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন হয় নি। ফলে, ইতর-চন্ডাল জাতীয় আজকের লেখক-গবেষকরা ইসলাম নিয়ে পুতুল খেলার সুযোগ পেয়েছে।

আমি কেনো মুসলমান?

প্রশ্নের জবাবে এই কথাই বলা যায়, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, “আমি কি তোমাদের রব নই?” আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, “আমি মুসলমানদেরকে সাক্ষী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি।” অন্যত্র বলা হয়েছে, “তোমরা মুমিন না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” আরেক স্থানে বলা হয়েছে “অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে জাহান্নাম।” অন্যত্র বলা হয়েছে, “বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মনোরম জান্নাত।” এসব কথার মূল উদ্দেশ্য একটাই যে, ‘পরকাল ইহকালের চেয়ে উত্তম।’ অর্থাৎ আজকের পূঁজিতান্ত্রিক মানবসভ্যতায় জীবন-যাপন করতে গিয়ে পরকাল ভুলে যাওয়া বা প্রত্যাখ্যান করার অর্থই জাহান্নাম। আর জাহান্নাম হচ্ছে কাফির ও মুনাফিকদের নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। সুতরাং ইজ্জতের সাথে বাঁচা বা দুনিয়ার জীবন-যাপন এবং কালিমা বা ঈমানের সাথে মৃত্যুর আশা রাখি বলেই আমি মুসলমান।

ঈমানের (৭৭) সাতাত্তরটি শাখা

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত, নবী ছোয়াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ঈমানের শাখা সত্তরের ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো- ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

ক. অন্তরের দ্বারা ৩০টি। খ. যবানের দ্বারা ৭টি। এবং গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ৪০টি।

ক. অন্তরের দ্বারা ৩০টি। (৯টি আক্বিদা বিষয়ক এবং ২১টি আমল বিষয়ক)

আক্বিদা বিষয়ক ৯টি

০১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর বিশ্বাস আনা।

০২. আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই (আল্লাহ্‌র) তাঁর সৃষ্টি ইহা বিশ্বাস করা।

০৩. ফিরিশতাদের উপর ঈমান আনা।

০৪. আল্লাহ্ তাআলার সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা।

০৫. সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনা।
০৬. তক্বদীরের (ভাল-মন্দের) উপর ঈমান আনা।
০৭. কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনা।
০৮. বেহেশতের উপর ঈমান আনা।
০৯. দোযখের উপর ঈমান আনা।

আমল বিষয়ক ২১টি

১০. আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত রাখা।
১১. আল্লাহ্‌র দুস্তের সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুস্তি রাখা তাঁর দুশমনের সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুশমনি রাখা।
১২. নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মহব্বত রাখা।
১৩. যেকোন নেক কাজে ইখলাছ তথা একনিষ্ঠতা বজায় রাখা অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকা।
১৪. গোনাহ্‌র জন্য খালিছ তওবা করা।
১৫. অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় রাখা।
১৬. সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখা।
১৭. অন্যায় বা গোনাহের কাজে লজ্জাবোধ রাখা।
১৮. শোকর আদায় তথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।
১৯. ওয়াআদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা।
২০. ছবর বা ধৈর্য ধারণ করা।
২১. তাওয়াযু’ বা নম্রতা অবলম্বন করা।
২২. জীবের প্রতি দয়া দেখানো।
২৩. রেযা বিল ক্বাযা বা তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা।
২৪. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা।
২৫. খোদ পছন্দী তরক করা অর্থাৎ নিজেকে বড় এবং ভাল মনে না করা ।
২৬. কীনা অর্থাৎ মনোমালিন্য না রাখা।
২৭. হাসাদ বা হিংসা বিদ্বেষ বর্জন করা।
২৮. রাগ দমন করা।
২৯. কারো অহিত চিন্তা না করা।
৩০. দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের মহব্বত বেশি রাখা।

খ. মুখ অর্থাৎ জিহ্‌বা দ্বারা ৭টি

৩১. কলিমা পড়া।
৩২. কুরআন শরীফ (বিশুদ্ধভাবে) তিলাওয়াত করা।

৩৩. দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা।
৩৪. দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া।
৩৫. দুআ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা।
৩৬. যিক্‌র করা।
৩৭. বেহুদা ও নাজাইয কথা থেকে যবানকে বাঁচিয়ে রাখা।

গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ৪০টি

শরীরের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি কাজ সমাধা করতে হয়। তন্মধ্যে **১৬**টি নিজে, ৬টি নিজের লোকদের সাথে এবং **১৮**টি সাধারণ লোকদের সাথে।

নিজের পক্ষে ১৬টি

৩৮. পবিত্রতা অর্জন করা।
৩৯. নামায কায়েম করা।
৪০. যাকাত আদায় করা।
৪১. ফরয রোযা রাখা।
৪২. হজ্জ করা।
৪৩. ই'তিকাফ করা।
৪৪. ঈমান ও ধর্ম রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ তথা হিজরত করা।
৪৫. মান্নতের পর (ওয়াদাকৃত কোন কিছু ইহা) আদায় করা।
৪৬. কসম খেয়ে ঠিক থাকা বা কসম খেয়ে ইহা ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা আদায় করা।
৪৭. কাফ্‌ফারা (অন্য বিষয়ের থাকলে) আদায় করা।
৪৮. ছতর ঢেকে রাখা (নামাযের ভিতর বা বাইরেও)।
৪৯. কুরবানী করা।
৫০. মানুষের মৃত্যুতে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।
৫১. ঋণ পরিশোধ করা।
৫২. জাইয ও সততার সাথে ব্যবসা করা।
৫৩. সত্য ঘটনা জানলে ইহা গোপন না রেখে সাক্ষ্য দেয়া।

নিজের লোকদের সাথে ৬টি

৫৪. বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে নফসের খাহিশ দমন করা।
৫৫. পরিবারবর্গের হক আদায় করা (চাকর-নওকরদের সাথে ভাল ব্যবহার রাখা)।
৫৬. পিতা-মাতার সেবা করা এবং তাঁদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।
৫৭. ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করা।
৫৮. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
৫৯. চাকরের প্রভু ভক্ত হওয়া।

জনসাধারণের সাথে ১৮টি

৬০. ন্যায় বিচার করা।
৬১. আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে সত্যপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে থাকা।
৬২. মুসলমান বাদশার হুকুম পালন করা।
৬৩. লোকজনের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে দেয়া।
৬৪. সৎ কাজে সাহায্য করা।
৬৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।
৬৬. হদ (ধর্মীয় শাস্তি) কায়েম করা।
৬৭. জিহাদ করা।
৬৮. আমানত অবিকল তদ্রুপ পৌঁছিয়ে দেয়া।
৬৯. অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে করজে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ দেয়া।
৭০. পাড়া প্রতিবেশীর সাথে (অমুসলিম হলেও) সদ্ব্যবহার করা।
৭১. কারবারের মধ্যে লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
৭২. অপব্যয় থেকে মুক্ত থাকা।
৭৩. সালামের জওয়াব দেয়া।
৭৪. হাঁচি দাতার জবাবে (আলহামদুলিল্লাহ শুনার পর) ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ বলা।
৭৫. পরের ক্ষতি না করা ও কাউকে কষ্ট না দেয়া।
৭৬. ক্রীড়া-কৌতুক, রং-তামাশা, নাচ-গান থেকে দূরে থাকা।
৭৭. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (মল-মূত্র হলেও) সরিয়ে ফেলা।

তথ্যসূত্রঃ

ইসলাম ও মওদূদীবাদের সংঘাত — মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারূক

সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং — সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসঊদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ্‌ — মূলঃ ডঃ হানাফী রাযী
অনুবাদঃ আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি (সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) — মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধ — সাহাদত হোসেন খান

আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিশ্বরাজনীতি — সংযোজন ও সম্পাদনাঃ মোরশেদ শফিউল হাসান

আল ফারুক — মূলঃ আল্লামা শিব্‌লী নোমানী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

আল কোরআনের বিষয় অভিধান — আসাদ বিন হাফিজ

আসান ফেকাহ্ ১ম খন্ড — মূলঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ আব্বাস আলী খান
আসহাবে বদর — শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবিবুর রহমান
ইতিহাসের কাঠড়গড়ায় হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু — মাওলানা মুহম্মদ তকী উসমানী
অনুঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
ইনসাইড 'র' ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায় — মূলঃ অশোকা রায়না, অনুবাদঃ লেঃ (অবঃ) আবু রূশ্‌দ
ইমাম গাযালী তাছাউফ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা — মূলঃ মাওলানা মুহম্মদ হানীফ নদভী
অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ — মূলঃ ড. মুসতাফা হুস্‌নী আস্‌-সুবায়ী
অনুবাদঃ এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
ইসলামের রাজনৈতিক অবদান — মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ (UNJUST WAR) — সিরাজুর রহমান
ইযাহুত্ তানবীর ফী উসূলিত্ তাফ্‌সীর (আরবী-বাংলা) — মূলঃ মাওলানা মুফতী সায়্যিদ আ'মীমুল ইহসান,
অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নেছার উদ্দীন গং
মুজাহিদের আযান জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ- — মাওলানা মাসউদ আজহার
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খন্ড — মূলঃ ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান .
কাছাছুল কুরআন (২য় খন্ড) — মূলঃ মাওলানা হিফযুর রহমান (রঃ) অনুবাদকঃ মাওলানা নূরুর রহমান
কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খন্ড — মূলঃ ইমাম গাযযালী (রঃ), অনুবাদঃ মাওলানা নূরুর রহমান
চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লার অস্তিত্ব — সম্পাদনা ঃ জন ক্লোভার মোনজ্‌মা
অনুবাদ ঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান
চেরাগে মুহাম্মদ — মূলঃ মাওলানা জাহেদ আল হুসাইনী (রঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
তাফসীর ইব্‌নে কাসীর (১ম- ১৮শ খন্ড) — মূলঃ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
তাহরীকে দেওবন্দ — মাওলানা মুশতাক আহমদ
দর্শনের কথা — মুহম্মদ আবদুল বারী
দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায় — মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী
অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ বেলাল
দেশ-বিদেশে মহিলা সমাবেশের প্রশ্নোত্তরে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী — সংকলনে আবদুর রহমান হান্নান
প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন — ডক্টর আমিনুল ইসলাম
মাযহাব কি ও কেন? — মূলঃ মাওলানা তাকী উছমানী, অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ
মাযহাব মান্‌বো কেন? — মুফ্‌তী মোঃ আব্দুল্লাহ্
মারেফত তত্ত্ব — শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ

হোসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

রূহ কি এবং কেন? — মূলঃ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা এ, কে, এম ফজলুর রহমান মুন্‌শী

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড) — প্রকাশনায়ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড) — প্রকাশনায়ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (চতুর্থ খন্ড) — হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহঃ
প্রকাশনায়ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ — প্রকাশনায়ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আমিরুল মোমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) ও প্রাসঙ্গিক বিষয় — হাফেজ মাওলানা নুরুল আবছার

ইনসাফের নিক্তিতে মীলাদ কিয়াম ও মুনাজাত — আ. ন. ম আবদুল কাইয়ূম খন্দকার

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) — এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম

চার মাযহাবের অন্তরালে — খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই কেরাম — সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)
অনুঃ মাওলানা রহুল আমীন খান উজানবী

হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস — মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী

অলৌকিক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ইতিবৃত্ত — মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী

আক্রান্ত মুসলিম বিশ্ব — সাহাদত হোসেন খান

আপনি সিদ্ধান্ত দিবেন কিভাবে? — মূল ঃ হযরত মাওলানা মুফ্‌তী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র)

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী — ভাষান্তর ঃ মুফ্‌তী মোঃ আবদুল্লাহ

আরব জাতির ইতিহাস — মুহম্মদ রেজা-ই-করীম

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ — সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
অনুবাদক- মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ

আশারাহ্ মুবাশশারাহ — এ জেড এম শামসুল আলম

ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি — সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের ৭ দফা গুণাবলী — অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক — খুর্‌রম জাহ মুরাদ

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট ও নির্বাচনী নীতিমালা — খন্দকার আবুল খায়ের

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন — মতিউর রহমান নিজামী

ইসলাম বনাম গণতন্ত্র ও সমাজ — মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী

ইসলামী রাষ্ট্র কি ও কেন — শাহ্ মনিরুজ্জামান

ঈমানের হাকীকত — সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদ, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ঈমানের তাৎপর্য — মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজত — মাওলানা মুহাম্মদ হারুন

ওয়াহ্হাবী মতবাদের নেপথ্য কাহিনী	এম সিদ্দিক গুমুজ
কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড)	অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভুঁইয়া
কুরআনের পরিভাষা	ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান্
কাফের ও মুসলমানের সম্পর্ক	মুহাম্মদ আবদুল কাদির
কোন পথে ইসলাম	প্রফেসর হাওলাদার
খ্রীষ্ট ধর্মের বিকৃতির ইতিহাস	জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী- ভাষান্তর ঃ আব্দুল মজিদ
গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন (১ম খন্ড)	মূল ঃ গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী(রাহ)
	অনুবাদক ঃ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ
জাতীয় সংসদে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	সৌজন্যে সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ?
জামায়াত পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বৈধতা- চ্যালেঞ্জ	মোঃ আবুল কাশেম
তাফসীরে সাঈদী (সূরা আল-ফাতিহা)	মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
তাফহীমুল কুরআন ১ম ও ১৯শ খন্ড (অনুবাদ অংশ)	সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী (রাহ)
তালবীসুল ইবলীস (শয়তানের ধোঁকা)	ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
	অনুবাদঃ আবদুল জলীল
দাকায়েকুল আখবার	মূল ঃ ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
	অনুবাদক ঃ আবু সাঈদ মোঃ হাবিবুল্লাহ খান এম. এম.
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি	মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী
নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও আজকের মুসলমান	মাওলানা আবু তালহা আনসারী
ফরুউল ঈমান	মুলঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
	অনুবাদক- মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
বাইয়াতের হাকীকত	অধ্যাপক গোলাম আযম
বোখারী শরীফ ৭ম খন্ড (বঙ্গানুবাদ)	শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক
বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত	অনুবাদক- মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মুসলিম মনীষীর জীবনী	সংকলনে- মুহাম্মদ শামসুল হুদা
ভোট দেব কেন ও কাকে	খন্দকার আবুল খায়ের
ভুল সংশোধন	আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর (রহ.)
মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
মহানবী ও চার খলিফার জীবন ও কর্ম	মোহাম্মদ সিরাজুল হক খান ও মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
মাযহাব নিয়ে বিভ্রান্তি (একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠার মুখোশ উন্মোচন)	ইহসান আহমাদ ও মুহাম্মাদ জালাল উদ্দীন
মুখোশের অন্তরালে জামাত	জাতীয় ওলামা পরিষদ
মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক	হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
শাহাদাতে হোসাইন (রাঃ) (শহীদে কারবালা)	মূল ঃ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
	হযরত মাওলানা ক্বারী মোঃ তৈয়েব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আমি কেনো মুসলমান	হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুবাদক ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান
সীরাতুন্নবী (সঃ) সংকলন	অধ্যাপক গোলাম আযম
রাসায়েল ও মাসায়েল	জাস্টিস মালিক গোলাম আলী অনুবাদ আকরাম ফারূক মুনীরুযযামান ফরিদী
বেলায়েতে উলামা	মাওলানা কারামত আলী নিযামী
মাসিক মদীনা'র বিভিন্ন সংখ্যা	মাদীনা পাবলিকেশন
Globalisation of Modern Politics	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স
Political Thinker	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স
প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আক্বীদা ও ফিরাকে বাতিলা	মাওলানা আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী
আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা	সাময়িকী